ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত
শ্যামলাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ের জন্য

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

সন ১৩০৫ সাল।

ইং ১৩ই এপ্রেল ১৮৯৮ হইতে ১২ই এপ্রেল ১৮৯৯ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট; "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য—কলিকাতা ১৲ টাকা।
" " মফঃস্বলে ১৶০ আনা।

প্রত্যেক সংখ্যার
নগদ মূল্য ⁄১০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অদৃশ্য সহায়	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৩৯
অনন্ত (পদ্য)	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র	১৭১
অলৌকিক ঘটনাবলী	ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১২৯, ২৫৫
অসীম সৃষ্টি	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল	১৮
আত্মপ্রতি (পদ্য)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	২২৯
আদর্শ দর্শনে (পদ্য)	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	৩৫৭
আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত (প্রকাশক)	৫৫, ৩৫৫
আনন্দ ভোজন	শ্রীযুক্ত অনন্তরাম	২৬৮
আবির খেলা	" "	৯
আমাদের দ্বিতীয় বৎসর	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল	১
উত্তরা খণ্ডে		৫৮, ৯৫, ১২৩, ১৬১, ২১৬, ২৫৮, ২৮৮, ৩১৮, ৩৮৭
ওঁকার ব্রাহ্মণ ও শূদ্র	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল,	১১৯
কর্ম্ম	শ্রীযুক্ত অনন্তরাম	১৪২, ১৮৯
কোথা পন্থা (পদ্য)	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৯
গান	শ্রীযুক্ত প্রঃ	১২২
ঐ	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩২, ২৬০
ঐ	শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ঘোষ	২১৩
গীত	ঐ	২৫০
গুপ্তবিদ্যালোচনা সভা	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস বি, এ, বি, এল	১৭৭
চতুর্ব্যূহ উপাসনা	ঐ	৩৩২
চণ্ডিদাস (পদ্য)	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়	৩৩০
চিন্তা কণিকা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ	২৮৭
জ্ঞান ও ভক্তি	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	৩৭৫
টেনিসন দৃষ্ট সমাধি অবস্থা	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	২১৪
তারা সঙ্গীত	ঐ	৩০৫
ঐ	শ্রীযুক্ত প্রঃ	২৪
দোল সঙ্গীত	শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত	৩৫৪
নূতন রাগিণী (পদ্য)	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	১০১
পথ (পদ্য)	ঐ	৭
পুনর্জন্মে প্রতিশোধ	শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ দত্ত (প্রকাশক)	৩১
পূর্ব্ব স্মৃতি	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৬৪
পৌরাণিক কথা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল,	৪৬, ১০২, ১৪৯, ২০৩, ২৮২, ৩৫৬

প্রণবের নানারূপ	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম, এ, বি, এল	৭৮
প্রাচীন শিক্ষার আধুনিক চেষ্টা	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩১৩, ৩৪৭
প্রেমের দেবতা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	১৫৩
বিদেশীয় ঘটনাবলী	ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র	৩৫
বিলাতী সন্ন্যাসী	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৩৩, ২৭৪
বিশ্ব জনীন ভ্রাতৃ ভাব	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ	৭২
বিশ্বের হৃদয় যন্ত্র (পদ্য)	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	১৬৫
বৃষ্টি	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল	৪১
ব্রহ্মের লক্ষণ	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল	১৩৪
ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা	৩১৫
ভব রোগে সদৃশ চিকিৎসা	শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার	৩৭
ভূতের উপদ্রব	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল	৪৫
মরিলে কি হয়	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা	১৩
মা	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল	৩২৫
মানবের ভাগ্য লিপি (পদ্য)	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	১৩৩
১মুক্তি ও মুক্ত ২নির্ব্বাণ ৩কৃষ্ণসেবা	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস বি, এ, বি, এল	৩৬২
মৃত্যু (পদ্য)	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	২২৮
মোহ মুদ্গর	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ,	১৬৭
যমালয়ের ফেরত	... ...	২৫০
যতি পঞ্চকম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ,	২৭২
রাধা তারা (পিনিয়াল গ্লাণ্ড) (পদ্য)	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল	১৪৮
লর্ড কার্জ্জনের আগমন উপলক্ষে (পদ্য)	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	২৯৩
লামাদিগের যোগশক্তি	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা	১১৩
শ্রীগৌরাঙ্গ (পদ্য)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	২৯৫
ষট্‌চক্র রহস্য	শ্রীযুক্ত অনন্তরাম	২৪৩
সাধক প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ,	৩৫৯
সঙ্গীত	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩০
ঐ	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	৫২
সাধনা	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল বি, এ,	২৬৩, ৩০২
সাধু সঙ্গ মহিমা	শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৬
স্বর্গীয় মহারাজ দ্বারভাঙ্গা	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	১০৬
স্বামীজির ভোজন	শ্রীযুক্ত অনন্তরাম	১১৫
স্বামীজির পত্র	ঐ	২৯৬
স্বপ্ন (পদ্য)	শ্রীমতী তরঙ্গিনী দাসী	৫১
স্বপ্নে দীক্ষা	২৫, ৫৩, ৮৯, ১১৫, ১৫৭, ২০৭, ২৩০, ৩৩৬, ৩৮০	
সরস্বতী বন্দনা	শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত	৩১৭
হিন্দু ধর্ম্ম তত্ত্ব	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ,	২৭৯

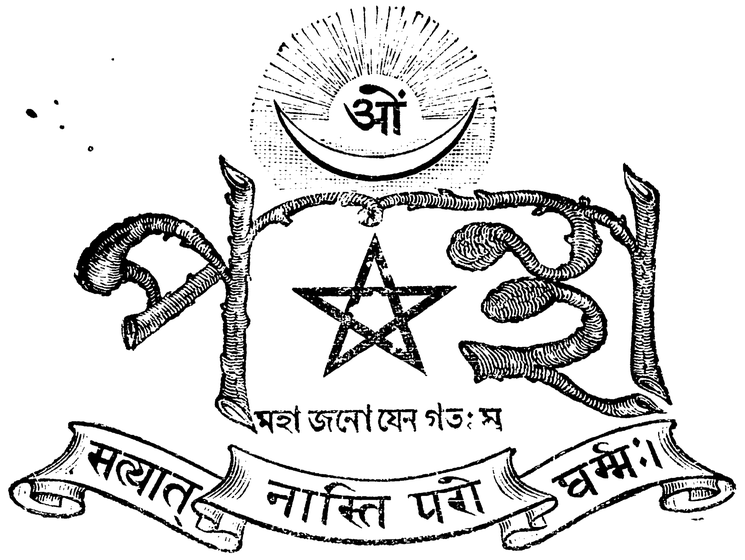

২য় ভাগ। | বৈশাখ, সন ১৩০৫। | ১ম সংখ্যা।

ওঁ

আমাদের দ্বিতীয় বৎসর

প্রথম কথা।

প্রথম বৎসর পূর্ণ হইয়া পন্থা দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল। এই দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে আমাদের প্রথম বৎসরের কর্ম্মফল আমরা ভগবানে সমর্পণ করিলাম। ওঁ তৎ সৎ।

ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিলাম বলিলেই উহা ভগবানে সমর্পিত হয় না; সকল কর্ম্মই বিধিপূর্ব্বক করিতে হয়; ভগবান সকল কর্ম্ম সাধন জন্যই বিধি বিহিত করিয়াছেন, সেই বিধি অবলম্বনে কার্য্য না করিলে কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকে। এই বিধিই বেদ। ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মফল ত্যাগরূপ মহাযজ্ঞের জন্যও বিধি বিহিত আছে; সেই বিধি ভগবান স্বয়ংও অতিক্রম করেন না—সুতরাং সেই বিধি

অবলম্বন না করিয়া ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে ভগবান উহা গ্রহণ করেন না। সেই বিধিটি কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি মহাবাক্য ব্রহ্মের সঙ্কেত, সেই জন্য তদুদ্দেশে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা এই তিনটির একটি উচ্চারণ করিয়া করিতে হয়; এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া যাহা ত্যাগ করা যায় তাহাই ভগবানে অর্পিত হয়। (গীতা ১৭ অধ্যায়, ২৩ হইতে ২৬ শ্লোক)। অনেকে মনে করিবেন যে, তবে ত ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম করা সোজা কথা। একটি ওঁকার বা তৎ সৎ উচ্চারণ করিয়া কার্য্য করিলেই যদি ভগবদুদ্দেশে কার্য্য করা হয়, তবে আর সাধন ভজন এ সকলের দরকার কি? ইহার উত্তর এই যে ঐ মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে শিখিবার জন্যই সাধন ভজন প্রয়োজন। মুখে শুধু ওঁকার উচ্চারণ করিলেই মহাবাক্য উচ্চারণ করা হয় না। জীবের হৃদয়ে যেমন লপ ডপ্ শব্দ অবিশ্রামে হইতেছে এবং হৃদয় হইতে রক্তের স্রোত বাহির হইয়া সর্ব্বশরীরে চালিত হইতেছে সেইরূপ বিশ্বরূপ ঈশ্বরের হৃদয়ে অনাহত প্রণবধ্বনি অবিরাম হইতেছে। সাধক বিশ্বের আত্মার সহিত নিজ আত্মা একতানে মিলাইয়া নিজের হৃদয়ে এই সঙ্গীত শুনিতে পান; সেই চেতন যিনি এই প্রণবধ্বনির বাচ্য তাহাই সৎ আর সব অসৎ ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই তৎ সৎ শব্দের অর্থ বুঝেন। এই মহাবাক্য তিনটির অর্থ যিনি বুঝেন তিনিই উহা উচ্চারণ করিতে জানেন; ভগবদুদ্দেশে ত্যাগরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা তিনি ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন না। আমরা এই যে যিনি এবং তিনি এই এক-বচনান্ত শব্দ ব্যবহার করিলাম, ইহা একটি উদ্দেশ্য রাখিয়া করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন সাধক যাঁহারা ওঁকার তত্ত্বাভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের প্রাণই এক বিশ্ব-প্রাণের সহিত একতানে মিলিত থাকায় তাঁহাদিগকে একজন বলিয়া বুঝাই সঙ্গত। যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে শিখিয়াছেন তিনি ভিন্ন বিশ্বপ্রাণ ওঁকারের অর্থ আর কেহ জানেন না; এই অর্থবোধের নাম মন্ত্রচৈতন্য জ্ঞান।

শাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, মন্ত্রার্থ অবগত না হইয়া যিনি সেই মন্ত্র অবলম্বনে যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া করেন তিনি পাপভাক্ হন; তবেই ত বড় গোলের কথা হইল। প্রণব মন্ত্রের অর্থ আমরা বুঝি না, উহার বাচ্য যিনি তাঁহাকেও চিনি না; সুতরাং আর দুইটি মহাবাক্যর অর্থও বুঝি না—তবে আমাদের গত বৎসরের কর্ম্মফল আমরা কিরূপে ভগবানে সমর্পণ করিব। এই কর্ম্মফল

ত্যাগরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে আমরা অধিকারী নহি, অতএব আমরা কর্ত্তৃত্বা-ভিমান ছাড়িয়া দিলাম।

সেই মহাত্মা যিনি ওঁকার-তত্ত্বজ্ঞ, ওঁকারই যাঁহার গুহ্য নাম, বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত সাম বেদের শাখার* যিনি প্রণেতা—তিনি আমাদের এই ক্রিয়ার কর্ত্তা হউন। গুরুদেব, তোমার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখ আমরা আমাদের কর্ম্মফল আজি তোমার হাতে দিলাম, তুমি উহা লইয়া জগৎপতির উদ্দেশে মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া ত্যাগ কর; এবং আমরা যে তোমার করণমাত্র ইহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। ওঁ ..

দ্বিতীয় কথা।

আমরা প্রথম বৎসরের অবতরণিকাতে বলিয়াছি যে, কলিকালের স্রোতে পড়িয়া মনুষ্য-সমাজ ঐহিক ভোগতৃষ্ণাতে মুগ্ধ হইয়া পারত্রিক আনন্দলাভে আস্থা-শূন্য হইয়া পড়িতেছে; এই কালস্রোতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই পুরুষকার এবং ইহাই মনুষ্যত্ব। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিরূপে করিতে হয়, তাহা আজি আমাদের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে পাঠকগণকে বলিতে চাই। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনিতে-ছিলেন তখন এক মত্ত হস্তী সেই স্রোত রোধ করিবে মনে করিয়া স্রোতের সমক্ষে দাঁড়ায় এবং স্রোতের বেগ স্পর্শ হইবামাত্র সে মুহূর্ত্তমধ্যে ভাসিয়া জীবন হারায়। আমরাও যদি ঐরূপে আত্ম-সামর্থ্যে গর্ব্বিত হইয়া কলির স্রোত রোধ করিতে চাই, তবে স্রোতের প্রবলবেগে আমরাও ধ্বংস হইয়া যাইব। কার সাধ্য, কালের বেগ রোধ করে। তবে কাল-স্রোতের বেগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে কমাইবার উপায় আছে। মহাপুরুষগণ সেই উপায় অবলম্বনে কার্য্য করিয়া থাকেন। মহাকালের প্রশান্ত সমুদ্রের সহিত খাল কাটিয়া কাল-স্রোতের সহিত মিলানই সেই উপায়। ঈশ্বর এই মহাকাল এবং এই উপায়ের নাম যোগ। নদী হইতে খাল কাটিয়া সমুদ্রে যোগ করিয়া দিলে সেই স্রোত যখন খালের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন খালের পরিসর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং মূল

* বর্ত্তমান যুগে সাম বেদের যে শাখা প্রচলিত উহার নাম কৌথুমী শাখা।

নদীর স্রোতের বেগ হ্রাস হইয়া যায়; ঠিক সেই কৌশলে কালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয। কিন্তু এই খালকাটা কার্য্য বড় সোজা কার্য্য নহে এবং ইহা একার কর্ম্মও নহে। নদী হইতে খাল কাটিতে হইলে নদীর কোন স্থল হইতে উহা কাটিতে আরম্ভ করিতে হইবে, ভূমির ঢালু অনুসারে কোন্ কোন্ স্থান দিয়া লইয়া যাইতে হইবে, কোন্ কোন্ দেশের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে মানবসমাজের অধিক উপকার হইবে,এই সব ঠিক করিবার জন্য পাকা ইঞ্জিনিয়র দরকার। তিনি প্ল্যান করিবেন তাহার পর মজুররা মাটি কাটিতে আরম্ভ করিবে; তবেই কার্য্য রীতিমত সমাধা হইবে। কালের স্রোতের সঙ্গে মহাকালের বক্ষের সহিত যোগ করিবার জন্যও ঠিক ঐরূপ ইঞ্জিনিয়র আছেন। যোগরহস্যবিৎ মহাত্মাগণ (যাঁহারা সকলে মিলিয়া একজন) এই কর্ম্মের ইঞ্জিনিয়র। এই খাল কাটার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, যদি কেহ এই কার্য্যে মজুর খাটিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হউন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কালের স্রোতের কোন্ স্থল হইতে খাল কাটিতে আরম্ভ করিতে হইবে তাহা যোগরহস্যবিৎ মহাত্মাই জানেন। সেইরূপ একটি সন্ধিস্থল অতি সন্নিকটস্থ হইয়াছে। কলির প্রারম্ভ হইতে দশ সহস্র বর্ষব্যাপী কালের একটি চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহার নাম জগন্নাথ চক্র; পঞ্জিকা দেখিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, ঐ যুগের মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা উপস্থিত হইতে আর দুই বৎসর মাত্র বাকি আছে। কলির এই প্রথম পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হইলেই কালের আর একটি চক্র পূর্ণ হইবে, উহার নাম সঙ্গা চক্র। সেই সময়, সেই মহাসন্ধ্যার সময় কালরহস্যবিৎ মহাত্মা, কালের সহিত মহাকালের মিলনের যে চিত্র আকাশে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত সাধকগণের চিত্তে সমর্পণ করিবেন। কালের সহিত মহাকালের যোগ সাধনার সাধক হইতে কে চাহ, চিত্ত নির্ম্মল করিয়া রাখ। সকলে মিলিয়া এই কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত হই এস; জীবন ধন্য হইবে। কিরূপে প্রস্তুত হইব? পরস্পর পরস্পরকে ভাগবত কথা শুনাইবার ও বুঝাইবার উপদেশ ভগবান গীতাতে বলিয়া গিয়াছেন,—এস ভাই সব আমরা সকলে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে ভাগবত কথা শুনি এবং পরস্পর পরস্পরকে ভাগবত কথা বুঝাই; তাহা হইলেই আমরা যোগরহস্যবিৎ, কালরহস্যবিৎ ওঁকাররহস্যবিৎ মহাত্মাগণের সংকল্পিত

কার্য্যের করণস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইতে পারিব। রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে একটি কাঠবিড়ালী সহায়তা করিয়াছিল, রামচন্দ্র আদর করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়াছিলেন; মহাত্মাগণের কার্য্যে আমরাও যদি কিছুও সাহায্য করিতে পারি তবে তাঁহারা আমাদিগকে আদর করিবেন, পিঠে হাত বুলাইয়া দিবেন—তাঁহাদের কৃপাকণা পাইলে ভবরোগের শান্তি হইবে।

দাশরথি গাহিয়াছেন—

মম মানস সদা ভজ, দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ,
দ্বিজরাজ করিলে দয়া, বামনে ধরে দ্বিজরাজ।
হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি তার জানে বিধি,
সে রোগের মহৌষধি ব্রাহ্মণেরই পদরজঃ॥

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, ওঁকাররহস্যবিৎ তিনিই ব্রাহ্মণ; এই মহাপুরুষের পদরজঃ অসাধ্য ব্যাধি যে ভবরোগ তাহার মহৌষধি, এই রোগের অন্য ঔষধ নাই। আমরা সেই পদে বার বার নমস্কার করি।

একবার হরিবোল বলিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। ভিতর থেকে কে যেন বলিতেছেন—

ছাড় রাগ, দ্বেষ, হিংসা, পাবে সুখ শান্তি।

ওঁ তৎ সৎ।

তৃতীয় কথা।

আমাদিগের এই পত্র খানির নাম পন্থা। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের পন্থা খুঁজিতেছেন, তাঁহাদিগকে পন্থা প্রদর্শন করা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অন্ধ হইয়া অন্যকে পথ দেখাইবার অভিলাষ বাতুলতা; আমরা ঐরূপ বাতুলের অভিলাষ লইয়া পন্থা-প্রকাশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। পন্থার লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সকলে মিলিয়া ধর্ম্মরাজ্যের সত্য পন্থা কি তাহাই অন্বেষণ করাই এই ক্ষুদ্র পত্রের উদ্দেশ্য। আমরা সকল যদি একসঙ্গে মিলিয়া সত্য পন্থার অন্বেষণে প্রকৃত উৎসুক হই— তবে সত্য পন্থা আপনি আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। অর্থাৎ

গুরু যিনি সৎ পথের প্রদর্শক তিনি নিজে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। নদী পার হইবার জন্য খেয়া ঘাটে একটি লোক আসিয়া বসিল, খেয়া-মাঝির দেখা নাই—তিনি নিজের কাজেই ব্যস্ত; ক্রমে একটী দুইটী করিয়া যখন এক নৌকা বোঝাইয়ের উপযুক্ত লোক আসিয়া সকলে মিলিয়া খেয়া-মাঝিকে ডাকে, তখন খেয়া-মাঝি আর থাকিতে পারে না; নৌকা লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে পার করিয়া দেয়। ভবনদী পারের ব্যবস্থাও সেইরূপ। ভবনদী পারে উৎসুক অনেকে একত্র হইয়া গুরুকে যদি আমরা ডাকিতে পারি, তবে সাধ্য কি তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন: অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিলে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইবে, তাঁহার আসন টলিবে, তিনি হয় নিজে আসিবেন অথবা নৌকা পাঠাইয়া দিবেন আমরা পার হইয়া যাইব। এই ক্ষুদ্র পত্রের লেখক-গণ ও পাঠকগণকে ঐ এক অভিপ্রায় সাধন জন্য মিলিত করাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পন্থার পাঠক, লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, এস আমরা সকলে একত্রে মিলিত হই। আমাদের পন্থা আর কিছু চাহে না, এই মিলন দেখিতে চায়। পন্থা সকলের হৃদয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দেখিতে চায়। গুরুদেব পন্থার এই আশা কি পূরিবে?

আবার হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া কে বলিতেছেন—

আপনাকে বলি দাও

ওঁ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তুরাত্মৈব বর্ত্তেতাত্মৈবরাত্মবৎ॥"

পথ।

'নানা মুনি নানা মত',
জটিল ধর্ম্মের পথ.
সত্য ঢাকা মিথ্যা আবরণে।

একই পরমেশ্বরে
খণ্ড খণ্ড ভাগ ক'রে,
সৃষ্ট জীব, সৃজে লক্ষজনে॥

প্রকৃতি যেমন যার,
সে তেমনি দেবতার
নির্ম্মাণ করিয়া, পূজা করে।

যে টুকু ক্ষমতা যার,
করিবারে সুবিস্তার,
সেই তাহা চায় অন্য পরে॥

যে হয় দুর্ব্বল জন,
অন্তগত সর্ব্বক্ষণ
অপেক্ষায় সবল জনের।

এইরূপে সৃষ্ট হয়
দলাদলি, বিশ্বময়;
ধর্ম্মে এ কি অধর্ম্মের ফের?

সত্য, মানবের পাশে
মানবকে লয়ে আসে,
প্রেমের বাঁধন প্রাণে বাঁধে।

কিন্তু শুধু ধর্ম্ম নানা,
এ মিলনে করে মানা ;
ঈশ্বরের সাধে বাদ সাধে ॥

সৃষ্টি আর সৃষ্টিকার,
কি সম্বন্ধ দু'জনার,
তাহাও বুঝি না মোরা বড়।

দিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম,
রচি শব্দ অভিধান,
জ্ঞান, শক্তি, চৈতন্য ও জড় ॥

ইহা কিছু নহে আর ;
অনন্তের চারি ধার—
মানব-মনের গণ্ডীদান।

ক্ষুদ্র সাধারণ নরে,
পারিবে বল কি ক'রে,
বৃহতের ধারণা ও ধ্যান ?

* * * * * *

ক্ষুদ্র কি বৃহৎ হ'তে,
পারে নাকো কোন মতে ?
নিত্য এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।

ক্ষুদ্র নহে অশ্রদ্ধার ;
বৃহতের মূলাধার ;
"ঐক্য" এই জেনো সত্য কথা ॥

ক্ষুদ্রের সহিত যবে,
ক্ষুদ্রের মিলন হবে,
তখনই জন্মিবে বৃহৎ।

ভাঙা গড়া যোগাযোগ,
যে নামই তাদের হোক্
জগতের আছে দুটী পথ ॥

মিলন বৃহৎ-সেতু,
বিচ্ছেদ ক্ষুদ্রের হেতু,
ভেঙে ফেল বিচ্ছেদের ঘর।

ত্যজি যত কুসংস্কার
কর সত্য সারোদ্ধার,
হ'তে সর্ব্ব ধর্ম্মের ভিতর ॥

যার যাহা আছে ধন,
খুলে ফেল আচ্ছাদন ;
দেও সবে সম অধিকার।

সর্ব্ব সত্য সম্মিলনে,
আপনি হইবে ক্রমে,
নিত্য-তত্ত্ব-সূর্য্য আবিষ্কার ॥

শ্রীমতী মৃণালিনী।

আবীর খেলা।

কোলের দিন একটা পাত্রে আবীর গুলিয়া একটি পিচকারী হাতে লইয়া স্বামীজির পিছন দিকে দাঁড়াইয়া চুপে চুপে যেমন এক পিচকারী আবীর গোলা তাঁহার গায়ে দিয়াছি, অমনি সন্ন্যাসী ঠাকুর নিকটে একটা বংশখণ্ড পড়িয়াছিল সেইটা উঠাইয়া লইয়া আমার দিকে ধাবমান হইলেন—আমিও দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। খানিক দৌড়াইয়াই স্বামীজি একটা হোঁচট

খেয়ে ধপাং ক'রে আছাড়। তখন তিনি উঠিয়া বলিলেন 'যা আর তোরে মারা হ'ল না।' আমি তখন নিকটে গিয়া বলিলাম যে, আজি দোলের দিন একটু ফাগ গোলা গায়ে দিয়াছি, তাতে তুমি আমায় মার্‌তে এলে কেন?

স্বামীজি। তুই অনিবেদিত রজঃ আমার গায়ে দিবি কেন? আবীর খেলার অর্থটা বুঝিস্ কি?

আমি। না ঠাকুর, অর্থ টর্থ বুঝি না, কি অর্থটা বল না।

স্বামীজি। এই আবীর খেলার অর্থ ভগবদ্গীতায় লেখা আছে।

আমার বড় হাসি পেলে, সমগ্র ভগবদ্গীতায় কোথাও ত আবীর খেলার কথা নাই। আমি বলিলাম তোমার মাথা; ভগবদ্গীতায় আবার আবীর খেলার কথা কোথায় দেখ্‌লে? আমি যে ভগবদ্গীতা আদ্যোপান্ত অনেকবার পড়িয়াছি।"

স্বামীজি। তুই ভগবদ্গীতার 'ভগ'ও বুঝিস্ নাই 'বৎ'ও বুঝিস্ নাই—গীতা ত পরের কথা। যে 'ভগ' বুঝেছে, 'বৎ' বুঝেছে সেই গীতা বুঝিবার অধিকারী। আমার জ্ঞানে চারিটি লোক* দেখিয়াছি যাঁহারা ভগবদ্গীতা বুঝিয়াছিলেন, এক ম্যাডাম ব্লাভাটস্‌কি, দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, তৃতীয় 'এবং' পাগলা, আর একজনের কথা এখন বলিব না, এখন তিনি তাঁহার শিষ্যদের কাছে নরনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

আমি। 'এবং' পাগলা কে গো?

স্বামীজি। কলিকাতার নিকটে উত্তরপাড়া ব'লে একটি গ্রাম আছে, সেই খানে একজন মুটে বাস করিত। সে সব কথাতেই একটি করিয়া 'এবং' যোগ করিয়া বলিত, সেই জন্য সকলে তাহাকে 'এবং' বলিয়া ডাকিত। সেও নিজেকে 'এবং' বলিয়া বলিত। 'আমি' শব্দ সে কখনও ব্যবহার করিত না। 'এবং' মোট বহিয়া খাইত, রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিত এবং শ্যামাবিষয়ক গান গাহিয়া সদাই নৃত্য করিত, এই জন্য সকলে তাহাকে পাগল বলিত। ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষেপাইত 'এবং' তুমি রাজা হও; 'এবং'

* স্বামীজি যাঁহাদের বিশেষ ভক্তি করেন কেবলমাত্র তাঁহাদের কথাই এইখানে বলিয়াছেন; আর কেহ গীতা বুঝেন না ইহা বলা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

বলিতেন তুমি রাজা হও, তোমার সাত গোষ্ঠী রাজা হউক; 'এবং' রাজা হবে কেন? 'এবং' ব্রাহ্মণের দাস, 'এবং' ব্রহ্মলোক চায়। 'এবং'এর সকল কথাতেই ঐ কথা ছিল যে, 'এবং' ব্রাহ্মণের দাস 'এবং' ব্রহ্মলোক চায়। 'এবং'কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'এবং' তোমার ছেলে ৬০৲ টাকা করিয়া মাহিনা পায়, আর তুমি মোট বয়ে বেড়াও কেন? 'এবং' উত্তর দিল, 'এবং' এ জনমে আর ঋণ গ্রহণ করিবেন না। 'এবং'এর সেই কথাটি মনে যখন হয় তখনই আমি 'এবং'কে গুরু বলিয়া নমস্কার করি।

আমি। এইতেই সেই 'এবং' তোমার কাছে এত বড় লোক হইল?

স্বামীজি। 'এবং' ছদ্মবেশী মহাত্মা ছিলেন; এখনও কেউ তারে চিনে না, কিন্তু পাগল না হ'লে পাগলকে চিন্‌বে কে? শোন; 'এবং'এর মৃত্যুর কথা শুন। 'এবং' একদিন বলিলেন 'এবং' আজি ব্রহ্মলোকে যাবেন, এই বলিয়া ছেলেদের ডাকিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন, সেইখানে বার কতক দাস্ত হইল। সকলে বুঝিল 'এবং'এর ওলাউঠা হইয়াছে; নদীতীরে অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি একটু ছট্‌ফট্ করিতেছেন দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল 'এবং'এর কি বড় কষ্ট হচ্চে? মহাপুরুষের ন্যায় তিনি উত্তর দিলেন 'এবং'এর আজি বড় আনন্দের দিন; 'এবং'এর চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণমণ্ডলী, 'এবং' আজি ব্রহ্মলোকে চলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই 'এবং'এর চক্ষু ললাটে উঠিল—মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল 'এবং'; 'এবং' প্রাণত্যাগ করিলেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই 'এবং' শব্দ ও ওঁ শব্দ একার্থবোধক। শূদ্রের প্রণব মন্ত্রে অর্থাৎ ওঁকারে অধিকার নাই বলিয়া উহার প্রতিশব্দ 'এবং' শব্দ সাধন করিয়া পাগলা 'এবং', 'এবং' উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। জগতের হিতের জন্য মহাপুরুষের জন্ম। 'এবং' পাগলা ওঁকারে অনধিকারী মানবের জন্য এই 'এবং' মন্ত্রটি পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'এবং' শব্দের বাচ্য ঈশ্বরকে নমস্কার করি এস। জপ তপ কর কি? মর্‌তে জান্‌লে হয়। ঈশ্বর স্মরণ করিয়া মরিতে শিখাই গীতাকথিত তারকব্রহ্ম-বিদ্যা; তাই বলিতেছি যে, গীতার মর্ম্ম 'এবং' পাগল বুঝিয়াছিলেন।

আমি। আর ঐ আর একজনের কথা যে বলিলে তিনি কে?

স্বামীজি। তিনিও মৃত্যুকালে হাসিতে হাসিতে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় দিবার সময় এখনও হয় নাই।

আমি। তা ত হ'ল, ইহাঁরা গীতা বুঝিয়াছিলেন; তুমি যে বলিলে 'ভগ'ও বুঝ নাই, 'বৎ'ও বুঝ নাই, সে কথাটার অর্থ কি?

স্বামীজি। ভগ শব্দের অর্থ যোনি। ভগবান বলিয়াছেন—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।"

এই ব্রহ্মযোনি যিনি দেখিয়াছেন তিনিই 'ভগ' শব্দের অর্থ বুঝিয়াছেন। এই ব্রহ্মযোনির মায়ারূপ ত্রিকোণাকার; এই ত্রিকোণের স্বামী যিনি তিনিই ভগবান্।* স্বস্বামী সম্বন্ধে 'বৎ' প্রত্যয়। এই স্বস্বামী সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই পুরুষজ্ঞান হয়; ইহাই বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের কথা। এ সব কথা না হয়, আর একদিন হবে। এখন আবীর খেলার কথাটা সংক্ষেপে ব'লে ফেলি। ঐ যে ত্রিকোণ ব্রহ্মযোনির কথা বলিলাম উহা হইতে ত্রিবিধ জ্যোতি নির্গত হইয়া এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। ঐ ত্রিবিধ তেজকণা শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ। শুক্লের নাম সত্ত্বগুণ, লোহিতের নাম রজগুণ ও কৃষ্ণতেজকণার নাম তমোগুণ। রক্তবর্ণ রজগুণ যখন দেহে প্রধান হয়, তখন কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে অর্থাৎ কর্ম্মের শক্তিই রাজসিক শক্তি। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, কর্ম্মবন্ধনে পড়িবে না; সেই যোগযুক্ত হওয়ার অর্থ, তোমার সমস্ত রাজসিক শক্তি ভগবানে নিবেদন করিয়া তাহার পর কর্ম্ম কর। লাল রংএর আবীর সেই রজগুণের স্মারক। উহা প্রথমে রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তার পর উহা লইয়া খেলা কর। বসন্তের প্রারম্ভে রাজসিক শক্তির যখন স্বাভাবিক প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখন উহা রাধাকৃষ্ণের সহিত যোগ করিয়া দাও, পরে উহা লইয়া পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে নিক্ষেপ কর। সাবধান, অনিবেদিত রজ কাহারও অঙ্গে নিক্ষেপ করিও না।

শ্রীঅনন্তরাম।

* ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি এই ত্রিকোণের স্বামীকে possessor of triangle বলিয়াছেন। ভগবান শব্দের সুন্দর অনুবাদ।

মরিলে কি হয়।

বাল্যকালে আমি আমার পিতামহকে বড় ভাল বাসিতাম। অনেক তরুণ বয়স্ক বালকেই পিতামহের অত্যন্ত অনুগত হয়; আমিও সেই নিয়মের অন্তর্গত ছিলাম। অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত দ্বাদশ বয়স্ক বালকের কেন এত প্রণয় হয় তাহা মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের একটি আলোচনার বিষয় বটে। ফল কথা, আমার পিতামহের সহিত আমার বড় প্রণয় ছিল। বৃদ্ধের নিকটে সর্ব্বদাই থাকিতে ভাল বাসিতাম। কখন পাঠ বলিয়া লইতাম, কখন গল্প করিতাম। বৃদ্ধের নিকট বসিয়া গল্প শুনিয়া যে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতাম তাহা যৌবন কালে বিষয় প্রপঞ্চে প্রবেশ করিয়া একদিনও অনুভব করি নাই। সেই সরলভাব, সেই স্নেহের মূর্ত্তি, সেই মধুর ভাষা আজিও আমার চিত্তপটে অঙ্কিত আছে। আমার পিতা কার্য্যানুরোধে বাটী হইতে দূরে থাকিতেন, আমিও পাঠানুরোধে তাঁহার নিকটে থাকিতাম। বিদ্যালয়ের অবকাশ হইলে আমার আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। কতক্ষণে বাটী যাইয়া ঠাকুর-দাদা মহাশয়কে দেখিব এই আলোচনাতে কিছু দিন কাটিয়া যাইত। বাটীতে আসিয়া আকাশের চন্দ্র হস্তে পাইতাম। এইরূপে কিছুকাল বালক বৃদ্ধের প্রণয় চলিয়াছিল। কিন্তু সকল সুখেরই সীমা আছে, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়; আমাদের প্রণয়ও চিরস্থায়ী হইল না। আমি পাঠ শেষ করিয়া দূর দেশে বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম; পিতামহ মহাশয় বাটীতে থাকিলেন। একবার পূজার ছুটীর সময় কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। মনে বড়ই আনন্দ; অনেক দিনের পর বাটী যাইব। কিন্তু হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। বাটী হইতে পত্র পাইলাম পিতামহ মহাশয় ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গিয়াছেন। আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। যে সানন্দ মূর্ত্তি এত ভাল বাসিতাম, যাঁহা দেখিবার জন্য এত আশা করিয়াছিলাম সে মূর্ত্তি বাটী যাইয়া আর দেখিতে পাইব না। এত আত্মীয়তা, এত স্নেহ, এত যত্ন, এত হৃদয়ের আকর্ষণ নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল। প্রথম শোকের বেগ

কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে মনে এক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল,—'মরিলে কি হয়'। এই সমস্যা আমার মনে এই প্রথম উদয় হইল। এতদিন এবিষয়ে কিছুই ভাবি নাই। পিয়ারের সাবান, প্যাটেণ্ট লেদার বুট এবং বেশমী রুমালের মধ্যে আমার সময়টা কাটিয়া যাইত। কালে সকলই সহ্য হইয়া যায়। পিতামহের শোক ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু 'মরিলে কি হয়' এই সমস্যাটি ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল।

কিছু দিন পরে আর একটি ঘটনা হইল। আমাদের পরিবারের স্নেহের প্রতিমা, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা যখন ভয়ানক রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া আমার নিকট পদধূলি প্রার্থনা করিল এবং আমিও যখন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম, তখন আমার মনে পুনরায় উদয় হইল,—'মরিলে কি হয়'। কালে ইহাও সহ্য হইয়া গেল। তাহার পর আর এক গুরুতর আঘাত পাইলাম। আমার জীবনের সহচরী, আমার সহধর্ম্মিণী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গেলেন। গঙ্গাতীরে শ্মশান ঘাটে যখন সেই প্রেম-প্রতিমা চিতানলে জ্বলিতে লাগিল এবং সেই চিতাধূমের সঙ্গে আমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয়বস্তু ছিল আকাশে লীন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমার আবার মনে হইল,—'মরিলে কি হয়'।

সচরাচর লোক এক চাপড়ে টীট হয়, কিন্তু আমি ঘোর পাষণ্ড, আমার তিন চাপড়ে কিছু চৈতন্যোদয় হইল। তখন সাবান, বুট ও রুমালে কিঞ্চিৎ বিরাগ জন্মিল। 'মরিলে কি হয়'—এই সমস্যাই বলবতী হইল। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। আত্মার অমরত্ব বিষয়ে যে যে পুস্তক নিকটে পাইলাম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে সমস্ত লোক এত প্রিয় ছিল, যাহাদের অভাবে এত ক্লেশ, তাহারা কি সমস্ত মিথ্যা? সংসারে সমস্ত বস্তুই বিনাশশীল, সকল দ্রব্যেরই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আছে। এই হইল, এই থাকিল, এই গেল। তাই বলিয়া কি সমস্তই মিথ্যা? প্রাকৃতিক বস্তু মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু আত্মা যে অমর। আমার স্থূল দেহ নশ্বর হইলেও আমি নিজে অমর। আমার আত্মা বা আমি চিরকালই আছি। সেইরূপ আমার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ হইল বটে, কিন্তু তিনি যে নিজে অমর।

অতএব স্থূল দেহের নাশ হইলে আত্মার বিনাশ হয় না, এবং আমার আত্মীয়-দিগের মৃত্যু হইলেও তাঁহারা কোন না কোন অবস্থায় আছেন। আত্মার অমরত্ব বিষয়ে অনুকূল প্রতিকূল উভয় মতই কিছু কিছু জানিলাম, কিন্তু অনুকূল মতই কেমন মনের সহিত ঐক্য হয়। মনের সহিত ঐক্য হয় বলিয়াই যে সত্য তাহা নহে, তবে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কিছু সত্য আছে। সমস্যা কিছু গভীর হইয়া উঠিল। বেদান্তের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বিষয় অবগত হইলাম এবং গীতার মতামতও জানিলাম। স্বদেশী ও বিদেশী সকল প্রকার মতই কিছু কিছু জানিবার চেষ্টা করিলাম। আত্মার অমরত্ব বিষয়ে এক প্রকার ধারণা স্থির হইল বটে, কিন্তু মনের শান্তি হইল না। কেবল মাত্র যুক্তি ও শাস্ত্র বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল না; কিছু প্রত্যক্ষ দেখিবার ইচ্ছা হইল।

শুনিয়াছিলাম প্রেততত্ত্ববিদ্যার (spiritualism) অনুশীলনে কতকটা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; সেইজন্য কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একটি চক্র (circle) করিলাম এবং উক্ত বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তকাদি আনাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের চক্রে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছিলাম, তবে ভাল মন্দ মিশ্রিত। সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইল না। আমাদের বাটীতে একটি বালিকা মিডিয়ম ছিল, তাহার যোগে পরলোক-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় জানিয়াছিলাম। ক্রিয়ার অন্তরালে কি শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহা বিলাতি (spiritualism) দ্বারা ভালরূপ জানা যায় না; অন্ততঃ আমি জানিতে পারি নাই।

শুভক্ষণে মাদাম ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কৃপায় জানিলাম যে আমাদের দেশের যোগশাস্ত্র এখনও লুপ্ত হয় নাই এবং যোগীরাই এ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইয়াছেন। যোগশাস্ত্রের বিষয় আমার পূর্ব্বে জানা ছিল, কিন্তু যোগীরা যে এখনও স্থানে স্থানে আছেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও যোগবিদ্যার অনুশীলন করেন তাহা জানিতাম না। নিজের যোগ-শক্তি সম্বন্ধেও কিছু পরিচয় পাইলাম। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক লোক অনেক কথা বলে কিন্তু আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে প্রবঞ্চনার লেশ মাত্র নাই।

বেদান্তের যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যোগবলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধন বলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হয়। জ্ঞান দুই প্রকার :—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। পুস্তকাদি পাঠে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান এবং সাধন বলে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা অপরোক্ষ। এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলে জানিবার আর কিছু বাকী থাকে না। যোগীরা এই অপরোক্ষ জ্ঞান-বলে সমস্তই জানিতে পারেন। পুস্তকাদি পাঠ, তর্ক বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতি বাহিরের ব্যাপারে প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া যায় না, সুতরাং হৃদয়ের শান্তি হয় না। ভিতরের জ্ঞান জন্মিলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি হয়, সুতরাং শান্তি পাওয়া যায়। যোগীরা এই শান্তির আস্বাদন করিয়া জগতের সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করিয়াছেন। 'মরিলে কি হয়' এই সমস্যার একমাত্র উত্তর যোগ-মার্গে পাওয়া যায় বুঝিলাম। সাধনা না করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না এবং তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে উক্ত সমস্যার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। তবে কেন এত বৃথা তর্ক, বৃথা আন্দোলন, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। এতদিনে পথ চিনিলাম, কিন্তু সে পথের পথিক হয় কে? যোগমার্গ অবলম্বন করিতে হইলে যে আত্ম-শাসন করিতে হয় তাহার শক্তি আমাতে কোথায়? একবার আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; আমাতে সে সব কিছুই নাই। তবে বুঝি আমার সমস্যা পূরণ হইল না। কেবল মাত্র ভগবৎ কৃপা এবং সদ্‌গুরু প্রসাদ ভরসা। কিছুদিন যোগীর অনুসন্ধানে বেড়াইলাম। কোথাও কোথাও দেখিয়াছিলাম। সে সকল বৃত্তান্ত এখানে লেখা নিষ্প্রয়োজন। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় বাটীতে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে গ্রামান্তরে কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে বাটীর বাহির হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু যাইবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় অচিরাৎ যাত্রা করিলাম। বৈকালে বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল। নানাপ্রকার আলাপের পর তাঁহাকে 'মরিলে কি হয়' এই প্রশ্ন করিলাম। তিনি শাস্ত্রোক্ত যে সকল কথা আছে তাহার দ্বারা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। আমি কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম না; তিনিও বোধ হয় তাহা বুঝিলেন। ক্ষণকাল পরে আমাকে সে দিন সেখানে থাকিতে বলায় আমি আনন্দের সহিত তাঁহার অনুরোধ

রক্ষা করিলাম। রাত্রে আহারাদির পর তিনি যে ঘরে ছিলেন তাহার পাশের ঘরে শয়ন করিলাম। সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, হঠাৎ গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম, আমি বেশ জাগ্রত হইয়াছি কিন্তু আমার শরীর তখনও নিদ্রিত। হাত পা তুলিবার ক্ষমতা নাই। শরীর একেবারে স্পন্দহীন। একি ভয়ানক অবস্থা! আমার জীবনে কখন এরূপ অনুভব করি নাই। কিছু পরে ঘরে খট্ করিয়া কি শব্দ হইল। মনে অত্যন্ত উদ্বেগ হইল। ভাবিলাম, যেমন করিয়া পারি উঠিব। প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ দেখি আমি গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান, অথচ আমার শরীর বিছানার উপর নিদ্রিত! একি নূতন ব্যাপার! আমি কি দ্বিধা হইয়া গেলাম? তখন আমার বেশ চৈতন্য ছিল। আমার প্রকোষ্ঠের সম্মুখে একটি দরদালান ছিল। অন্ধকারের মধ্যে তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং সেই দরদালানের রুদ্ধ গবাক্ষ দিয়া বাহিরের আকাশে তারকামণ্ডলী দেখিতেছিলাম। দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল; অন্ধকার বা রুদ্ধ দ্বার আমার দৃষ্টি রোধ করিতে পারে নাই। সে রাত্রের ঘটনা আমার বেশ স্মরণ আছে এবং তখন যে চৈতন্য ছিল তাহা যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে এখনকার এ চৈতন্যও মিথ্যা। কিছুক্ষণ এইরূপ অভিনব অবস্থায় থাকিয়া দেখি শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছি। ফিরিয়া আসিবার পর আমার শরীর জাগ্রত হইল। গাত্র ঘর্ম্মে বিছানা ভাসিয়া গিয়াছিল এবং শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল। সমস্ত রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় নাই। এত দিনে আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে শরীর হইতে আত্মা ভিন্ন এবং শরীরের অভাব হইলে আত্মার মৃত্যু হয় না। সে এক অভিনব অনুভব; আমি বর্ণনা করিতে পারি না। সে যে স্বপ্ন নয় তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। প্রাতঃকালে উঠিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া রাত্রের ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"সন্ন্যাসী ফকিরের নিকট থাকিলে এমন দুটো একটা দেখা যায়। যাহা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল তাহা তোমার সূক্ষ্ম শরীর এবং যাহা বিছানায় নিদ্রিত ছিল সে তোমার স্থূল শরীর। এখন বুঝিয়াছ ত 'মরিলে কি হয়'? আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম তাহাতে আর বুঝিবার বাকী কি? আমার মনের সন্দেহ গিয়াছে। এখন আমি বেশ বুঝিয়াছি শরীরের নাশে আত্মার ধ্বংশ হয় না।

উল্লিখিত ঘটনা সম্বন্ধে যিনি যাহা মনে করেন করুন, কিন্তু আমার এইমাত্র

বক্তব্য যে, যিনি 'মরিলে কি হয়' এবিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল, অথবা যাঁহার প্রত্যক্ষ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার ইচ্ছা আছে, তিনি যেন কোন প্রকৃত যোগীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

অসীম সৃষ্টি।

ভক্ত কবি বিদ্যাপতি ভগবানের স্তুতি গান করিয়া বলিয়াছেন—

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোয়ে জনমি পুন, তোয়ে সমায়ত
সাগর লহরী সমানা॥

সমুদ্রবক্ষে যেরূপ লহরী লীলা,—অগণ্য—অন্তহীন, অনুক্ষণ বিলসিত হইতেছে; ব্রহ্ম-সাগরে সেইরূপ সৃষ্টি-তরঙ্গ অসীম, শেষ-রহিত, প্রতিক্ষণ বিস্ফুরিত হইতেছে। সৃষ্টি ব্রহ্মার্ণবে বুদ্‌বুদ বিলাস মাত্র। বুদ্‌বুদের মত অসংখ্য, অস্থির, ভঙ্গপ্রবণ। সেই জন্য সৃষ্টিকে জগৎ বলে। যাহা যায়, থাকে না; যাহার স্বভাব গতিশীল, স্থিতিশীল নহে—তাহাই জগৎ। জগতের আর একটি নাম সংসার। যাহা যায়, আবার আসে; আবার যায়, আবার আসে—যাহা স্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন বহমান,—গতাগতি, পুনরাবৃত্তি যাহার প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহাই সংসার। সৃষ্টিকে যাঁহারা 'জগৎ' বলিতে জানিতেন, সৃষ্টির যাঁহারা 'সংসার' আখ্যা দিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন সৃষ্টি অনাদি—অনন্ত—অসীম।

সমুদ্রের দুই অবস্থা। সমুদ্রবক্ষ কখন উদ্বেলিত বিলোড়িত তরঙ্গায়িত। আবার কখন নিবাত-নিষ্কম্প, প্রশান্ত, বীচিহীন। ব্রহ্ম-সমুদ্রও ঐরূপ;—

তথায় কখন সৃষ্টির উচ্ছ্বাস, কখন প্রলয়ের শান্তি। সৃষ্টিকালে চাঞ্চল্য, অশ্রান্ত গতি, পরিণাম, বিবর্ত্তন। প্রলয়ে স্থিতি, স্থৈর্য্য, সুষুপ্তি সাম্যাবস্থা। সৃষ্টিকালে কত ব্রহ্মা বুদ্‌বুদ ব্রহ্মার্ণবে ফুটিয়া উঠে—আবার প্রলয়ে বিলীন হইয়া যায়—তাই বিদ্যাপতি চতুরাননের কথায় বলিয়াছেন—

'তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত'।

সৃষ্টি অনাদি। মানুষ এরূপ কালের কল্পনা করিতে পারে না, যখন সৃষ্টি ছিল না। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল, তাহার পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল, তাহারও পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব, শূন্য হইতে সৃষ্টির বিকাশ কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব যাহাকে আমরা সৃষ্টি প্রলয় বলি, তাহা জগতের আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। যেমন ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করে ও সংহার করে, সেইরূপ ভগবান্ এই জগতের প্রকাশ ও বিনাশ করিতেছেন মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টি অনাদি। এ বিষয়ে গীতার উপদেশ এইরূপ—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে॥

সেই ভূতগ্রামের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি প্রলয় হইতেছে। রাত্র্যাগমে অনিচ্ছায় জগতের তিরোভাব হয়, এবং দিবাগমে পুনর্ব্বার আবির্ভাব হয়।

সৃষ্টি ও প্রলয় কালকে যথাক্রমে দিবা ও রাত্রি বলে—রূপকের ভাষায় ইহাদিগকে ব্রহ্মের প্রশ্বাস ও নিশ্বাস বলা যায়। ব্রহ্মের প্রশ্বাস কালে সৃষ্টির উদ্গম হয়, ব্রহ্মের নিশ্বাস কালে সৃষ্টির বিলয় হয়। দিবারাত্রির গতি অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত; প্রশ্বাসের পর নিশ্বাস অবিরল গতিতে উচ্ছ্বসিত। সেই জন্যই সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত। যে কারণে অনাদি, সেই কারণেই অনন্ত। সৃষ্টির যেমন আদি কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ অন্ত ও কল্পনা করা যায় না। ব্রহ্মের নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিরাম নাই। সেই জন্য সৃষ্টির সংকোচন ও প্রসারণেরও বিরাম নাই। সেই জন্যই সৃষ্টি অনাদি, অনন্ত।

সৃষ্টি যেরূপ অনাদি ও অনন্ত, সেইরূপ অসীম। সৃষ্টিতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইতে হয়, ইহার বৈচিত্র্যে—দ্বিতীয়তঃ ইহার বিশালতায়। এক অদ্বিতীয় বস্তু সিসৃক্ষু হইয়া—'একোঽং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়'

এই কামনা করিয়া কি সুমহান্ বহুত্বে পরিণত হইয়াছেন! ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি-সাগরে শিশির বিন্দু মাত্র—অতি ক্ষুদ্র নগণ্য। ইহারই কত গিরি নদী ভূধর সাগর; কত বৃক্ষ লতা গুল্ম পাদপ; কত পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সরীসৃপ; কত নর নারী, সম্প্রদায়, সমাজ।

ইহার প্রত্যেক জাতির মধ্যে কত উপজাতি, প্রত্যেক সমাজের কত উপ-সমাজ, প্রত্যেক বিভাগের কত উপবিভাগ। এক বৃক্ষই কত প্রকারের কে গণনা করিবে? কীট জাতির মধ্যে কত উপজাতি আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? মনুষ্যের মধ্যে কত উপবিভাগ আছে, কেহ কি তাহার নিঃশেষ সংখ্যা করিতে পারে? এইরূপ অন্যান্য জাতি ও উপজাতি সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যাইতে পারে। অতএব এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর স্থূল ভুবনেই সৃষ্টির ভেদ-বৈচিত্র্য সংখ্যাতীত। ইহার উপর যদি সূক্ষ্ম ও কারণ ভুবনের প্রাণী, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ, ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষঃ, পরী, জিনি, অপ্সরা প্রভৃতির যোগ করা যায় তবে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য কি প্রায় অনন্ত হইয়া উঠে না? একটি পৃথিবীতেই এই। সৃষ্টিতে যে কত পৃথিবী, কত লোক, কত ভুবন রহিয়াছে আর ঐ সকল ভুবনে যে সৃষ্ট পদার্থের কত ভেদ তাহা মানববুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈচিত্র্যাংশে সৃষ্টি অসীম। সৃষ্টির বিশালতারও সীমা নাই। এই পৃথিবী যাহা সৃষ্টি বিস্তারে বল্মীক স্তূপ মাত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ইহারই পরিধি ২৪৮৫৩ মাইল। সৃষ্টিতে এরূপ কত পৃথিবী রহিয়াছে! তাহাদের পরিমাণ সমষ্টির—সমগ্র বিশালতার কি ইয়ত্তা করা যায়? পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যকে লইয়া ইহাদিগকে একটি সৌরমণ্ডল বলা যায়। সৃষ্টিতে এরূপ কত সৌরমণ্ডল রহিয়াছে। শুনা যায় এক একটি তারা এক একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র। এরূপ দুই কোটি তারা বিজ্ঞানের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সেই সেই কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া কত গ্রহ আবর্ত্তন করিতেছে! এইরূপ একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে সিরিয়াস্ তারা বিরাজমান। আমাদের সূর্য্যই একটি অতি বিশাল পদার্থ। ইহার পরিমাণ পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ। সিরিয়াসের পরিমাণ আমাদের সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। অতএব সিরিয়াস্ কি প্রকাণ্ড বিশাল। এইরূপ

কত সিরিয়াস্ আকাশে দোদুল্যমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা অনুমান করিয়াছেন যে ওরায়ণতারা-সমষ্টির অন্তর্গত নীহারিকা স্তূপের পরিমান আমাদের সূর্য্য সমেত সৌরমণ্ডলের বহু কোটি গুণ অধিক। এইরূপ কত নীহারিকা স্তূপ আকাশে প্রসৃত রহিয়াছে! এক একটি তারা কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কতই না গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতুমণ্ডল বিমানপথে বিচরণ করিতেছে। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন গ্রহ সকল পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ গ্রহকে বেষ্টন করিয়া উপগ্রহ বিচরণ করে। আমাদের পৃথিবী-গ্রহের উপগ্রহ চন্দ্র। এইরূপ শনির আটটি উপগ্রহ আছে। আবার কয়েকটি সৌরমণ্ডল একটি বৃহত্তর সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আকাশমার্গে ভ্রাম্যমান রহিয়াছে। এই-রূপ বৃহত্তর সূর্য্য কয়েকটি অন্য এক বৃহত্তম সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই বৃহত্তম সূর্য্য কত বিরাট বিশাল! তাহার পরিমাণ মনুষ্য-সংখ্যার অতীত।

আবার কতটা দেশ যুড়িয়া সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? সূর্য্য হইতে আমাদের পৃথিবীর ব্যবধান ৯৫০০০০০০ মাইল; নেপচুন গ্রহের ব্যবধান ২৭৯০০০০০০০০ মাইল। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ সেণ্টরি তারাই পৃথিবী হইতে ২৪৭৫০০০০০০০০০ মাইল দূরে। অন্যান্য তারার দূরতার তুলনায় ঐ তারা আমাদের যেন অতি সন্নিকটে। অনেক তারা আছে, যেখান হইতে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে ১৮০০০ বৎসর লাগে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইল। যে তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে ১৮০০০ বৎসর লাগে, সে তারায় ও পৃথিবীতে কত ব্যবধান। তাই বলিতেছিলাম যে কতটা স্থান ব্যাপিয়া সৃষ্টি যবনিকা প্রসৃত রহিয়াছে তাহার পরিমাণ করা মানুষের সাধ্য নহে। মনুষ্য সংখ্যার শেষ সীমা পরার্দ্ধকে পরার্দ্ধ দিয়া গুণন করিলেও সে পরিমাণ লাভ করা যায় না। অতএব সৃষ্টি বাস্তবিকই অসীম—কেবল বৈচিত্র্যে অসীম নহে, বিশালতায় ও অসীম।

স্থূল জগতই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের অনুসন্ধানের জন্য যে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, য়ুরোপে এখনও তাহার উদ্গম হয় নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবিষয়ে মূক। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা

যোগের সাহায্যে সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের তথ্যনিরূপণোপযোগী ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করিতে শিখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সৃষ্টির অসীমতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আমরা তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অতঃপর এবিষয়ে আর্য্য ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের পরিচয় প্রদান করিব।

আর্য্য ঋষিদিগের মতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপ ও সত্য এই সপ্তলোক। ভূলোক আমাদের এই পৃথিবী। প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা ভেদে এই সপ্ত-লোক গঠিত। এই সপ্তলোকের সমষ্টি আমাদের ব্রহ্মাণ্ড।

অণ্ডস্যান্তরিমে লোকাঃ সপ্ত দ্বীপাচ মেদিনী।

সপ্ত দ্বীপা মেদিনী সমেত এই (সপ্ত) লোক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। এই সপ্ত লোকের সমযোগী মনুষ্যের সাত অবস্থা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় নির্ব্বাণ পরিনির্ব্বাণ ও মহাপরিনির্ব্বাণ। এক এক অবস্থায় সম্বিৎ এক এক লোক ভোগ করে।

পার্থিব প্রকৃতির ভেদে যেমন ভূরাদি সপ্তলোক, এইরূপ শনি বৃহস্পতি প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রহের স্ব স্ব প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে স্তরে স্তরে সপ্তলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্যস্ত গ্রহের যেরূপ পর পর সপ্তলোক, গ্রহ সমস্ত সৌর মণ্ডলের ও সেইরূপ সপ্ত ভেদ। আর সমস্ত সৌর মণ্ডলীর মহা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও ঐরূপ। এক এক সৌরমণ্ডলের স্রষ্টা পালয়িতা ও সংহর্ত্তা এক এক স্বতন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পালয়িতা ও সংহর্ত্তা যথাক্রমে মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব। যেমন বৃক্ষের সমস্ত বন, জলের সমস্ত জলাশয়; এইরূপ স্বতন্ত্র ব্রহ্মা সমূহের সমস্ত মহা-ব্রহ্মা স্বতন্ত্র বিষ্ণু সমূহের সমস্ত মহা-বিষ্ণু ও স্বতন্ত্র শিব সমূহের সমস্ত মহা-শিব। যেমন স্ব স্ব প্রধান রাজন্য মণ্ডলী চক্রবর্ত্তী সম্রাটের অধীনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যখণ্ড শাসন দণ্ড পরিচালন করেন; এইরূপ স্ব স্ব প্রধান ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবমণ্ডলী মহাব্রহ্মা মহাবিষ্ণু মহাশিবের অধীনে স্বতন্ত্র ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য সাধন করেন। মহাব্রহ্মা মহাবিষ্ণু মহাশিব এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি—তিনি বিশ্ব বিকাশের পূর্ব্বে কেবলাত্মা, কিন্তু বিকাশ কালে গুণত্রয় ভেদে ত্রিধা বিভিন্ন।

স্থূল জগৎ মাত্রেরই আলোচনায় সৃষ্টি অসীম মনে হইয়াছিল; এখন সপ্ত

ভুবনের ভেদ স্তর পর্য্যালোচনা করিলে জগতের যে বিরাট অসীমতার অবভাস হয়, তাহা এক আর্য্য ঋষি ভিন্ন কে কল্পনার সমক্ষে আনিতে পারে?

এবিষয়ে একটি সুন্দর পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এক দিন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কোন কার্য্যোপলক্ষে মহাবিষ্ণুর সদনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে তিনি ভিন্ন আর সৃষ্টি কর্ত্তা নাই আর এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর ব্রহ্মাণ্ড নাই। তাঁহার এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মহাবিষ্ণু এক মায়াজাল বিস্তার করিলেন। ব্রহ্মা যখন বৈকুণ্ঠের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন দ্বারী এক পঞ্চমুখ গণেশ। ইহাতে ব্রহ্মা কিছু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন 'এ আবার কি? আমার সৃষ্ট গণেশের ত এক মুখ। এ গণেশ কোথা হইতে আসিল?' পরে বিস্ময়ের ভাব সংবরণ করিয়া দ্বারী গণেশকে বলিলেন 'আমি ব্রহ্মা; ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী'। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা? ভগবানের কাছে কাঁহার নাম বলিব?'। ব্রহ্মার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন—'কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা? ব্রহ্মাণ্ড ত এক এবং আমিই ত তাহার স্রষ্টা। ভূরাদি সপ্তলোক ও আমারই সৃষ্ট।' গণেশ বলিলেন 'বুঝিয়াছি। আপনি পৃথিবী-ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা। আচ্ছা সংবাদ দিতেছি।' পরে সংবাদ দিয়া ব্রহ্মাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া ব্রহ্মা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। দেখিলেন কারণার্ণবে একটি অনন্ত-দল কমল ফুটিয়া আছে, আর সেই কমলের প্রতিদলে এক একটি পরম রূপসী কন্যা অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি ক্রীড়া গোলক লইয়া খেলা করিতেছে। ব্রহ্মা সেই কমলের দলের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। কারণ সে কমল অনন্তদল। ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া মগ্ন নেত্রে সেই কন্যাগণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কত যুগ বহিয়া গেল; ব্রহ্মার সে জ্ঞান নাই। সহসা একটি কন্যার ক্রীড় গোলকটী চূর্ণ হইয়া গেল। সে কন্যা করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহার আর্ত্তনাদে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা তুমি কাঁদ কেন? একটি গোলা ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার জন্য ভাবনা কি? আমি ব্রহ্মা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। এখনই তোমাকে এরূপ কত গোলা সৃষ্টি করিয়া

দিতেছি'। কন্যা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহাকে ভুলাইবার জন্য নানামতে একটি ক্রীড়া গোলক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কিছুতেই সে গোলক নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না। তখন স্তম্ভিত হইয়া বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। পঞ্চমুখ গণেশ এতক্ষণ ব্রহ্মার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মার মোহ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—'এই কারণার্ণবশায়ী অনন্ত দল কমল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপক স্বরূপ। ইহার এক একটি দলে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এক একটি কন্যা এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি সৃষ্টির বিকাশ কালে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্রীড়া-গোলক লইয়া খেলা করেন। প্রলয়ের সময় ঐ গোলক চূর্ণ হইয়া যায়। অদ্য আপনি একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐরূপ প্রলয় প্রত্যক্ষ করিলেন। আপনার সাধ্য কি আপনি ঐ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। প্রলয় রাত্রির অবসানে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উহা আবার সৃষ্ট হইবে। সৃষ্টির সীমা নাই। জগৎ অসীম-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-কমলের অনন্ত দল।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

তারা।

রাগিণী সুরট-মল্লার—তাল একতালা।

জ্যোতির্ম্ময়ী তারা, তোমার সতত অন্তরাসন।
আমার মন কাল, তাই বলি কাল, পাই না স্বরূপ দরশন॥
কাল-স্রোতের বিষম জোর,
কু-আশা কুয়াসা ঘোর,
তাহে ধ্রুব-তারা, তুমি তারা, সুপথের নিদর্শন॥
পাপভারে কালে ডরি,
ডুবুডুবু জীবন-তরী,
ক্ষমি' দোষ ক্ষেমঙ্করী, কর জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিতরণ॥

শ্রীপ্রঃ—

স্বপ্নে দীক্ষা।

আমরা নিদ্রাকালে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখি, তাহার অধিকাংশই অসম্বন্ধ কল্পনা মাত্র। এইরূপ অসম্বন্ধ স্বপ্ন দেখার পর যখনই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন যাহা যাহা দেখিলাম, তাহা যে সমস্ত মিথ্যা ইহা আপনা আপনি বুঝিতে পারি। চিত্তের যে অবস্থায় ঐরূপ স্বপ্ন দেখা যায় উহার নাম বিপর্য্যয় ও বিকল্প অবস্থা। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ভগবান পতঞ্জলি যাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলিয়াছেন, উহাই বেদান্তদর্শন কথিত সুষুপ্তি অবস্থা, চিত্তের যে অবস্থায় বিপর্য্যয় ও বিকল্প বৃত্তি প্রধান হয় উহাই স্বপ্নাবস্থা এবং যে অবস্থায় প্রমাণ বৃত্তির প্রাধান্য উহাই জাগ্রত অবস্থা। বেদান্ত মতে যাহা তুরীয় অবস্থা উহাই শুদ্ধ স্মৃতিবৃত্তিমূলক অবস্থা। এই স্মৃতিবৃত্তিই আবার অবিশুদ্ধ ভাবে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাইে বর্ত্তমান থাকে। আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি তখন প্রমাণ বৃত্তি ক্রমে ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিপর্য্যয় ও বিকল্প আসিয়া দেখা দেয়। সেই সময় অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান হইতে থাকে এবং কল্পনানুযায়ী চিত্র সকল প্রকৃত সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কিন্তু ইহার পর যখন চিত্ত আরও অন্তর্মুখী হয় তখন কোন জ্ঞানই থাকে না—ইহাই সুষুপ্তি অবস্থা। ইহা চিত্তের বিরাম অবস্থা। এই সুষুপ্তি অবস্থায় যদি কেহ জাগিয়া থাকিতে পারেন অর্থাৎ আপনাকে এই সুষুপ্তি অবস্থার দ্রষ্টা স্বরূপ এবং সুষুপ্ত চিত্তকে দৃশ্য স্বরূপ দেখিতে পারেন তবে তখন তাঁহার বিশুদ্ধ স্মৃতি সাক্ষাৎ হয়, এই সময় তিনি তাঁহার জন্ম জন্মান্তরীন সমস্ত অবস্থা শান্তচিত্তে চিত্রিত দেখিতে পান। এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য যত্ন ও অভ্যাসের নাম যোগ।

কোন কোন মানব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে নিদ্রাকালে কখন কখন এই অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন এবং ভগবৎ কৃপায় এই অবস্থায় যাহা দেখেন তাহার স্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গে লইয়া জাগ্রতাবস্থায় ফিরিয়া আসেন। এইরূপ স্বপ্ন অমূলক

চিন্তা মাত্র নহে। এইরূপ স্বপ্ন সাধকের ইহজন্ম ও পূর্ব্বজন্মের সাধনার ফল। এইরূপ স্বপ্ন অন্তর্জগতের প্রকৃত সত্য প্রকাশক। আমরা এইরূপ একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত আজি পাঠকগণকে উপহার দিব।

ওঁ নম শিবায়।

এই স্বপ্ন বৃত্তান্তটি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যিনি শ্রীমতী———————কে এই অন্তর্জগতীয় গূঢ় রহস্য প্রকাশক স্বপ্ন দেখাইয়াছেন আমরা সেই জগৎগুরু ভূতভাবন ভগবান মহাদেবকে নমস্কার করি।

জয় বিশ্বেশ্বর হর, উমেশ শঙ্কর,
গিরিজাধীশ্বর মহেশ্বর।
জয় ত্রিলোককারক, ত্রিশূলধারক,
ত্রিপুরনাশক সতীশ্বর॥
জয় সুরগণ-বন্দিত, শৈলজা-সেবিত,
ভকত পূজিত পদাম্বুজ।
জয় শিব বাঘাম্বর, রজত-কলেবর,
পদ্মাসনোপর বৃষধ্বজ॥
জয় অভয় মৃগবর, কুঠার চারি কর,
মহাদেব হর কৃপা কর।
জয় পঞ্চমুখ পর, ত্রিনেত্র শশধর,
গঙ্গাধর বর ত্রাণ কর॥
ওঁ মহেশ ভূধরবরদুহিতা প্রণয়ালয়
অজ্ঞান দুঃখক্লিষ্টস্য অবিদ্যাং মে বিনাশয়। *

নিম্নলিখিত স্বপ্নটি প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা শ্রীমতী————————র মঙ্গল কামনা করি।

পাতু মহেশ বালান্তাং বিদৈষা পরমা যয়া।
ন্যূনমপূর্ব্ব বিজ্ঞাতা স্বপ্নেলব্ধা সুশীলয়া॥

* এই স্তোত্রটি কোন সাধকের স্বপ্নলব্ধ।

এই পরমা বিদ্যা, পূর্ব্বে কাহারও বিদিত ছিল না। যিনি ইহা স্বপ্নে লাভ করিয়াছেন, মহেশ্বর সুশীলা সেই বালাকে রক্ষা করুন।

পং সং।

সেবিকা শ্রীমতী.....দাসী প্রণাম নিবেদন—

আমি কয়েক দিন ধরিয়া যে সকল স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনি আমার মুখে কতক কতক শুনিয়া, আমাকে লিখিতে বলিয়াছিলেন; তাহার কতক অংশ লিখিলাম। পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে পাছে ভুলিয়া যাই বলিয়া কিছু কিছু লেখা ছিল। এখন এক রকম জোড়াতাড়া দিয়া লিখিলাম। জানি না, এই স্বপ্নের অর্থ কি ও ইহাতে কোন সত্য আছে কি না। আমার লেখাপড়া বোধ বড় কম, যা'হক তা'হক করিয়া লিখিলাম।

বিষয়।

বৈশাখ মাস অতিশয় গরম পড়িয়াছে, সমস্ত প্রাণিগণ কাতরস্বরে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, সকল দ্রব্য রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া রৌদ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; সকলেই রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে কখন বেলা অবসান হইবে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব লাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পশ্চিম গগনে মেঘের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অস্তমিত হইলেন। এমন সময়ে মৃদুমন্দ ধীর মলয় সমীরণ ফুরফুর করিয়া বহিতে লাগিল। দিবসের শ্রান্তি দূর করিবার কারণ কেহ ময়দানে, কেহ নদীতটে, কেহবা নদীগর্ভে নৌকায় পরিভ্রমণ করিবার বাসনায় বহির্গত হইলেন।

হিন্দু-স্ত্রীলোকদিগের সে অধিকার নাই, তাঁহারা সন্ধ্যা আগমন দেখিয়া নিজ নিজ গৃহের ও জগতের মঙ্গল জন্য শঙ্খধ্বনি ও দীপ জ্বালিয়া দিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন। ওদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া পূজারী ব্রাহ্মণগণ নদীতটে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া দেবালয় দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। আমরা স্ত্রীলোক, বৈকালীক পূজার উদ্যোগ করিয়া দিবার জন্য ঠাকুরবাড়ীতে যাইলাম।

অদ্য কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী দেখিতে দেখিতে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। আমরা পূজার উদ্যোগ করিয়া দিয়া এবং শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি সংমিলিত ব্রাহ্মণগণের তারস্বরে উচ্চারিত স্তবাদি শ্রবণ ও আরতি দর্শন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম এক অপরিচিত পুরুষ পূজার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহা! কি সৌম্য মূর্ত্তি, যেন কোন দেবতা স্বর্গচ্যুত হইয়া এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন; দীর্ঘ পক্ককেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, বয়স সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু নয়নের জ্যোতি যুবা পুরুষের ন্যায়। আমরা সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি সকলকেই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে আমরা সকলে মৃদু পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম, পুনর্ব্বার সেই সৌম্য প্রশান্ত দেবমূর্ত্তি দেখিবার জন্য পশ্চাৎদৃষ্টি করিবামাত্র তিনি পুনরায় আমাকে হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হঠাৎ আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল যেন তড়িৎ শক্তি দ্বারা আমার শরীর আলোড়িত হইল। এমন সময়ে তিনিও সহসা অন্তর্ধান হইলেন।

আমি সমস্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহের সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিলাম, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক কিছু বুঝিতে পারিতেছি না কেন এরূপ হইল, প্রাণে কি যেন একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল, মন স্বতঃই অনন্তের দিকে ছুটিতে লাগিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আরও যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, তাহার উপর হঠাৎ বাতাস বন্ধ হওয়ায় অতিশয় গ্রীষ্মানুভব করিতে লাগিলাম; গ্রীষ্ম নিবারণার্থে গৃহের ছাদে যাইয়া শয়ন করিলাম। গভীর নিশিথ চারিদিক নিস্তব্ধ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্র অন্ধকার নীলনভোমণ্ডলে উজ্জ্বল তারকারাজি বিরাজ করিতেছে, তাহাতে অন্ধকার কিছু উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। আহা, কি সুন্দর রাত্র! নীল গগণে কোথাও একটুকু মেঘ নাই, যেন প্রকৃতিদেবী তারকা-খচিত নীলাম্বর পরিধান করিয়া শোভা দিতেছেন। সুবিমল আকাশপটে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই তারকাটি কেমন জ্বলিতেছে; আবার ঐ তারকাপুঞ্জ কেমন মিট্‌মিট্ করিয়া একবার জ্বলিতেছে পুনর্ব্বার নিবিতেছে আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। ও আবার

কি! কত শত তারকারাজি একত্রে থাকিয়া দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ত্ম এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

যত চাহিয়া থাকি মন ততই অনন্তের দিকে ধাবিত হইতে চাহে। কি করি! মনে হইতে লাগিল কে এ বিশ্ব সৃজন করিল,—এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ঐ তারকারাজি ও ঐ ছায়াপথই বা কি? এই প্রকার নানা চিন্তায় আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল, পূর্ব্বে কতবার ভাবিয়াছি, ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। কত শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কম বশতঃ শাস্ত্রের কূট, জটিল, প্রচ্ছন্ন ও রূপক অর্থ অনুধাবন করিতে অক্ষম। কয়েকজন শাস্ত্রবেত্তা মহাত্মাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হই নাই।

একদিন স্বপ্নে এক মহাপুরুষ দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন "বৎসে! অত উতলা হইও না, এক ফোঁটা মন প্রাণ লইয়া গুরুতর বিষয় চিন্তা করিও না, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বুদ্ধি লইয়া মহাসমুদ্রবৎ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য পরিমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, ইষ্টদেবে ভক্তি রাখিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন কর ও মন সংযম কর, ক্রমে বুঝিতে সক্ষম হইবে। অঙ্গুষ্ঠ ডুবাইয়া মহাসমুদ্রের মান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বিবেচনায় চিন্তাকে অবসর দিয়া ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করতঃ কাতর ভাবে ডাকিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিদেবী আরও গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিলেন—কোথাও সাড়া নাই, শব্দ নাই, প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। এমন ভাব আমি জীবনে কখন অনুভব করি নাই। ক্রমে ক্রমে নিদ্রাদেবী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইষ্টদেবতা ও অনন্ত চিন্তা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত।

—o—

প্রতিমা রূপেতে তাঁরে পূজে যদি নর।
তাতে অসন্তুষ্ট কেন হবেন অনাদি ঈশ্বর॥
ঈশ্বর ত নন ঈশ্বর দত্ত, মানুষের মত উন্মত্ত,
যে ভাবে যে তাঁর তত্ত্ব করেন নিরন্তর;
তিনি তাতেই তুষ্ট, না হন্ রুষ্ট, রসিকের সাগর।
সত্য ক'রে বল দেখি, যখন আমরা মুদি আঁখি,
সৃষ্টি ছাড়া কিবা দেখি দৃষ্টির গোচর;
শুন্‌তে ভাল সহজ কথা, নিরাকার নির্ণয় কোথা,
বেদেতে যে ব'লেছে তা, বর্ণিতে বিস্তর;
যিনি ক্ষিত্যপ্তেজঃ আদিরূপে ব্যাপ্ত চরাচর।
প্রতিমা প্রীতির জন্য, গুণময়ের গুণ চিহ্ন,
উদ্দেশ্য সেই এক ভিন্ন কি আছে অপর;
সেই এক নদীর জল অনেকে খায়,
ও তার ঘাট বিভিন্নে জল কি শুকায়,
প্রেম ভক্তি থাক্‌লে সহায় মুক্তি হয় দোসর;
ও তাঁর ব্যক্তি বুঝে ব্যবস্থা নাই,
ও তাঁর ধার্ম্মিকের উপর।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পুনর্জ্জন্মে প্রতিশোধ।*

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধীয় এই নিম্নলিখিত ঘটনাটী দাক্ষিণাত্যে সংঘটিত হয়। মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে একটা গড় নির্দ্দিষ্ট কাল (সাধারণতঃ ১০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত) থাকিলেও সময়ে সময়ে ঐ নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ কেহ কেহ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এবং কেহ কেহ কিছুদিন পরেও জন্মিয়া থাকে। এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবার যথেষ্ট কারণও আছে। বর্ত্তমান বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া তৎসম্বন্ধে এ স্থলে অধিক কিছু আলোচিত হইবে না।

নিম্ন বিষয়টী পন্থার পাঠকদিগের মধ্যে অনেকের পক্ষে জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও চিন্তার বিষয় হইবে এবং অন্ততঃ অনেকের চিত্তরঞ্জন করিতেও সমর্থ হইবে বলিয়াই এ স্থলে সন্নিবেসিত হইল।

যে ঘটনার কথা বর্ণিত হইতেছে, ইহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; যাহাদের সঙ্গে এই ঘটনার সংস্রব আছে, পাছে তাহাদের প্রতি স্থানীয় সাধারণের আন্তরিক ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে, সেই কারণে ব্যক্তি ও স্থানের নাম অপ্রকাশিত থাকিবে। গল্পের বিষয়টী প্রধানতঃ এই—যিনি এই ঘটনার অধিনায়ক তিনি একজন হিন্দুসন্তান,—বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ও সমাজ-মধ্যেও বিলক্ষণ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তৎপ্রদেশস্থ কোন বিভাগের মধ্যে একটী উচ্চ পদস্থ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তথাকার বদ্‌মায়েস এবং জেল-খালাসাদিগের একরূপ বাপ মা ছিলেন,—এমন কি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার গর্হিত ও কদর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ফল কথা এই যে, এই ব্যক্তির অনুগ্রহে তৎপ্রদেশ-নিবাসীদিগের পক্ষে বিষয়াদি রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করা সম্পূর্ণরূপ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল।

উক্ত জেলার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান থাকায় ধনাঢ্য যাত্রিদিগের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল, সুতরাং সুবিধা পাইলেই এই ব্যক্তি দলবল লইয়া

থিওসফিষ্ট—অক্টোবর, ১৮৯৫।

পথিমধ্যে তাহাদের ধনাদি লুণ্ঠন এমন কি সময়ে সময়ে তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

একদা জনৈক জহুরী উক্ত তীর্থস্থান গমন উপলক্ষে তৎপ্রদেশস্থ রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য নানা প্রকার বহুমূল্য রত্নাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই সংবাদ ঐ দস্যু-নায়েকের কর্ণগোচর হওয়াতে সে তাহার অধীনস্থ বিশ্বাসী সহকারিদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিল যে, ঐ জহুরীর তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে যেন তাহার পথরোধ করা হয়।

সহকারিগণ তদ্দণ্ডেই ঐ তীর্থস্থান অভিমুখে ধাবিত হইল, তথায় যাইয়া জহুরীর প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল। তদনন্তর তাঁহার প্রত্যাগমন কালে উহারা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার পশ্চাৎ আসিতে আসিতে যখন বেস সুবিধা বুঝিল সেই সময়ে সকলে চারিদিক হইতে আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল; এবং ঐ জহুরীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক অবশেষে তাহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইল। তখন ঐ দুর্ভাগ্য জহুরী আসন্ন বিপদে কোনরূপ উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত কাতরোক্তি সহকারে তাহাদের নিকট অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, এবং বলিল যে, এ বিষয় সে প্রাণান্তে কখনও কাহাকে বলিবে না এই বলিয়া সে ঐ দস্যুদিগের নিকট জীবন ভিক্ষা করিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হৃদয় এখনও সেরূপ কঠিন হয় নাই বলিয়া এইরূপ কাতরোক্তিতে ঐ জহুরীর প্রাণদানে সম্মত হইল। তাহাকে ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময়ে তাহাদের ঐ নায়ক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জহুরীকে হত্যা না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ দেখিয়া সে তাহার সহচরদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। তদনন্তর ঐ জহুরী ঐ দস্যু-নায়কের নিকট যৎপরোনাস্তি অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কাতরোক্তিতে জীবন ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু ঐ দুরাচার পাষণ্ড ঐ নিঃসহায় জহুরীর কাতরোক্তিতে অণুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া শীঘ্র তাহার জীবন হনন করিবার জন্য সহচরদিগকে ঈঙ্গিত করিল। আজ্ঞা পাইবামাত্র অনন্যোপায় দেখিয়া সঙ্গীগণ ঐ দুর্ভাগ্য জহুরীর জীবননাশ করিল এবং তাহার মৃতদেহ কোন এরূপ গোপনীয় স্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিল যে কেহ উহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

এইরূপ যথেষ্ট ধনের অধিকারী হইয়া ঐ নায়ক উক্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া মনের আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, তজ্জন্য তাঁহার স্ত্রী বিশেষ মনক্ষুণ্ন ছিলেন। কারণ এই বিষয় সম্পত্তি ভবিষ্যতে কে ভোগ করিবে? এবং পুংনাম নরক হইতেই বা কিরূপে মুক্ত হইবেন?

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরেই দৈবক্রমে স্ত্রীকে অন্তঃসত্বা হইতে দেখিয়া তাহার মনে আনন্দের উদয় হইল। অনন্তর তাহার স্ত্রী নিরূপিত সময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, তখন ধনাধিকারীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, কারণ একে অতুল ঐশর্য্য তাহার উপর আবার পুত্র সন্তান—বাটীতে এই উপলক্ষে বিশেষ সমারোহের সহিত আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ঐ নবজাত শিশু ক্রমে বালক, বালক হইতে যুবাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাহার পিতা অতি সমারোহের সহিত পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি আপনাকে যার পর নাই কৃতকৃতার্থ জ্ঞানে সমাজের মধ্যে একজন প্রধান ধনী ও পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই বৎসর কাল সুখে সচ্ছন্দে কাটিয়া গেল, একদা সহসা ঐ পুত্রের পীড়া হইল, এবং ঐ পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। পিতা মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন কারণ অনেক অর্থ ব্যয়ে এবং দেশবিদেশ হইতে সমাগত প্রধান প্রধান সুচিকিৎসকের ঔষধাদি সেবনে পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে পুত্রের আরোগ্যের আশা আর রহিল না—মৃত্যুর সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয় স্বজন ও পরিজনবর্গ গৃহের চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইয়া বৃদ্ধ পিতামাতার এরূপ বিপদে সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঐ পুত্র তাহার মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার অসাধারণ রূপে দৃষ্টি করিতে লাগিল—সে যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে। যাহারা তাহার মৃত্যুশয্যার চতুঃপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তাহারা ঐ যুবার পিতাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন (এ সময়ে পুত্রের শেষ

অবস্থার দৃশ্য দেখিতে অসমর্থ হইয়া পিতা বাহির বাটীতে বসিয়াছিলেন) কারণ তাঁহারা মনে করিলেন যে, হয়ত এই মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রীর সম্বন্ধে পিতাকে কিছু বলিবে বলিয়াই যুবা ঐরূপ ভাবে দৃষ্টি করিতেছে। অনন্তর তাহার পিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষু পুত্রের শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিল। পিতার নিকট খুলিয়া বলিতে পাছে পুত্র কুণ্ঠিত হয় সেই জন্য ঐখানে যে সকল লোক ছিল তাহারা গৃহ হইতে অবসৃত হইল। যখন পুত্র দেখিল যে গৃহের মধ্যে তাহার পিতা ব্যতীত আর জনপ্রাণী নাই, তখন সে পিতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল :—"আপনি বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না, অতএব একটী অতি আবশ্যকীয় কথা আপনাকে না বলিয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে মরিতে পারিতেছি না—কথাগুলি আপনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন নাই যে, আমার জন্মাইবার কিছু পূর্ব্বে তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত জনৈক ধনাঢ্য জহুরীকে পথিমধ্যে হত করিয়া তাহার সমস্ত অর্থ ও বহুমূল্য জহরতাদি হরণ করেন। অনুনয় বিনয় ও অতিশয় কাতরোক্তিতে সে আপনার নিকট কেবল জীবনমাত্র ভিক্ষা করে, কিন্তু আপনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পাষণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত নির্দ্দয়রূপে তাহার জীবন সংহারের আজ্ঞা দেন। অতএব এক্ষণে আপনি নিঃসংশয়ে জানুন যে আমি সেই হতভাগ্য জহুরী। কর্ম্মের অজ্ঞেয় জটিল নিয়মানুসারে আপনার দুষ্কৃতির প্রতিশোধ লইবার জন্যই হত হইবার অব্যবহিত পরেই আপনার সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনার নিকট হইতে আমার প্রায় যাবতীয় ঋণ পরিশোধ পাইলাম আর যৎসামান্য যাহা কিছু বাকী রহিল, তাহা মৃত্যুর পর আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদিতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত আমার যে বিধবা স্ত্রী রহিল, তাহার আজীবন ভরণপোষণ নির্ব্বাহের জন্য আপনার যাহা ব্যয় হইবে তাহাতে বুঝিবেন যে আমার মূলধন যাহা নষ্ট করিয়াছেন এই ব্যয়টা তাহার সুদ স্বরূপে আদায় দিতে হইবে। ফলে আমার ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ঠিক হওয়াতেই আমি চলিলাম—এই আমার বক্তব্য।"

এই বলিয়া যুবা নিস্তব্ধ হইল—ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল—সকলি ফুরাইয়া গেল। মাতার বহু যত্নে রোপিত হৃদয়ের আশালতা শুকাইল—পিতার কেবল আশালতা শুকাইল না,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ে নিজ দুষ্কৃতির শেল বিদ্ধ হইয়া রহিল। আত্মীয়গণ যাঁহারা এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া গোপন ভাবে পিতা পুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ক্রন্দনের রোলে যোগ দিলেন ক্রমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইল। তাঁহারা সময়ান্তরে পিতা পুত্রে কথাবার্ত্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে পিতা উত্তর দেন যে বিকারের প্রকোপে তাঁহার পুত্র ঐ সকল অসংলগ্ন কথা বলিয়াছিল—ঐ সকল অর্থহীন কথা ব্যতীত আর কিছু নহে। যাহারা কিছু জানিত না তাহারা এই কথা বিশ্বাস করিল, কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বের ঘটনা অবগত ছিলেন, তাঁহারা এ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন না। পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বুঝিবেন যে এরূপ ঘটনা জগতে নিতান্ত বিরল নহে।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

বিদেশীয় ঘটনাবলী।

(১)

১৮৪৫ সালে ৬ এপ্রিলে ফিলিপ-ওয়েল নামক একটী যুবক জলমগ্ন হন। যে বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করিতেন তথাকার অধ্যক্ষ তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, তাঁহার পিতাকে সংবাদ ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট যাইলেন। মৃত্যুর পরদিবস অধ্যক্ষ পিতার নিকট উপস্থিত হন, বাটীর সন্নিকটে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং অধ্যক্ষ কিছু বলিতে না

বলিতেই, তিনি বলিলেন, "যাক্ আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, আমি জানি আমার পুত্র মৃত। গত কল্য অপরাহ্ণে, আমার কন্যার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা উভয়েই তাহাকে হঠাৎ দেখিয়াছি। পথের বিপরীত পার্শ্বে, দুইজন ব্যক্তির মধ্যস্থিত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন; ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কৃষ্ণপরিচ্ছদযুক্ত যুবক এবং আমার পুত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। আমার কন্যা প্রথমতঃ তাহাদিগকে দেখেন এবং আমাকে বলেন যে "বাবা ঐ ব্যক্তি আমার ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেছি"; আমি বলিলাম তোমার ভ্রাতার ন্যায় কেন, তোমার ভ্রাতাই।

আমরা উভয়েই তাহাদের নিকট অগ্রসর হইলাম, ঐ কালে আমার পুত্র কৃষ্ণপরিচ্ছদযুক্ত যুবকের প্রতি হাস্যমুখে তাকাইতেছিলেন। হঠাৎ এই তিন ব্যক্তি এক কালে অদৃশ্য হইলেন। আমি এ সম্বন্ধে আমার স্ত্রীকে কিছু বলিলাম না এবং পরদিন অপরাহ্ণে ডাকে কোন সংবাদ না পাওয়ায় আমি স্থির হইলাম। আপনাকে দেখিবামাত্র আমি বুঝিলাম আমার পুত্র গতাসু হইয়াছেন।"

অধ্যক্ষ আনুপূর্ব্বিক মৃত্যু ঘটনা বলিলেন; এবং পিতা স্বীকার করিলেন যে কৃষ্ণপরিচ্ছদযুক্ত যুবককে কখনও দেখেন নাই কিন্তু এখন দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। পুত্রের সৎকারের সময় পিতা সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও ঐ প্রকারের দেখিলেন না। এই ঘটনার প্রায় ৪ মাস পরে স্থানান্তরে যাইয়া পিতা একটী পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; পুরোহিত না থাকায় যাবৎ পিতা তাঁহার গৃহমধ্যে সংগৃহীত চিত্রগুলি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ ঐ কৃষ্ণ পরিচ্ছদযুক্ত যুবকের একটী চিত্র দেখিতে পাইলেন। পুরোহিত উপস্থিত হইলে পিতা জানিতে পারিলেন যে ঐ চিত্র সাধু টেনিস্‌লন্ ক্যাস্কার।

শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র।

২য় ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫। | ২য় সংখ্যা।

ভবরোগে সদ্গুরু চিকিৎসা।

সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন; মনুষ্যের ভাগ্যে অমরত্ব নাই—মানুষের ষাটকৌষিক দেহ ক্ষণভঙ্গুর; স্বভাব ইহাকে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেছেন, জরা ও ব্যাধি ইহার মূল, প্রতিনিয়ত একটু একটু করিয়া অলক্ষিতভাবে ছেদন করিতেছে। আগমাপায়ী দেহ অমর না হইতে পারিলেও তাহাকে নিরাময় ও ওজঃ সম্পন্ন রাখিবার জন্য সমুদ্র মন্থনকালে মহর্ষি ধন্বন্তরি আবির্ভূত হন। তিনিই আয়ুর্ব্বেদের প্রভু। আয়ুর্ব্বেদ যে কেবল রোগ চিকিৎসার শাস্ত্র এমত নহে; রোগ যাহাতে দেহে না হয়, দেহ যাহাতে সবল ও সুস্থ থাকে, মানুষের যাহাতে অকাল মৃত্যু না ঘটে, এই সমস্তও আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ ঘনিষ্টতা আছে; "অন্নময়ংহি সৌম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্" এই

বৈদিকবাক্যের রহস্যার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় ঋষিরা সম্যক্ অবগত ছিলেন। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, কৌশলপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে, তাহা হইতেই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে, স্বভাবের এই রহস্য তাঁহারা ভালরূপ জানিতেন। তাই, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, "শ্রুয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধং"।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে মার্কিন খণ্ডে হানিম্যান্ নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন চিকিৎসক প্রাদুর্ভূত হন। Similia Similibus Curantur অর্থাৎ "সদৃশ সদৃশের শান্তিকর" এই চিকিৎসাসূত্র তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের পর হইতে অল্পকাল মধ্যে তাঁহার চিকিৎসা-মত জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছে। নিরপেক্ষ, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সূত্রের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

স্থূলশরীরের ব্যাধির পক্ষে সদৃশবাদ যেমন, সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ মনের ব্যাধির জন্যেও সদৃশবাদ সেইরূপ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। মনের রোগ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এই পাঁচ রোগের মূল কারণ কর্ম্ম। মানুষের যত কিছু দুঃখ তাহার মূলে কর্ম্ম বৈ আর কিছুই নহে। কর্ম্মসঙ্গীই দুঃখ ভোগ করে। কর্ম্মসঙ্গী কে? যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করে অর্থাৎ কোনও ফল প্রত্যাশা করিয়া কর্ম্ম করে। ফল প্রত্যাশা করিয়া কর্ম্ম করা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা করিলে সুখী হইব, ইহা করিলে ধনী হইব, ইহা করিলে যশস্বী হইব, ইহা করিলে ক্ষমতাশালী হইব, ইহা করিলে শত্রু দমন হইবে, ইত্যাদি নানারূপ অভিসন্ধি করিয়া লোকে কর্ম্ম করে। "কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা"—মনু বলিতেছেন, কামনাপূর্ব্বক কর্ম্মকরা প্রশস্ত নহে, কিন্তু নিষ্কাম লোকও দুর্লভ। লোকে কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মজালে জড়ীভূত হয়; জড়ীভূত হইয়া জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। রেশমের পোকা যেমন আপন শরীর হইতে সূতা বাহির করিয়া গুটি নির্ম্মাণ করিতে করিতে অবশেষে সেই গুটির মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়, প্রাকৃত মানুষ সেইরূপ আপন মনের বাসনা দ্বারা কর্ম্মরচনা করে এবং সেই আত্মকৃত কর্ম্মে জড়ীভূত হয়। ইহাকেই বলি মানুষের ভবরোগ।

এ রোগের চিকিৎসা কি? সকল রোগীর চিকিৎসা সমান নহে। রোগী-দিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, যথা (১) যাহাদিগের বায়ু-

প্রধান বাসনা, (২) যাহাদিগের পিত্তপ্রধান বাসনা এবং (৩) যাহাদিগের শ্লেষ্মা-প্রধান বাসনা। মানস-চিকিৎসকগণ এই তিন শ্রেণীর রোগীদিগকে সদৃশবিধানে চিকিৎসা করেন। তাঁহারা জানেন, মানুষ কর্ম্ম না করিয়া তিলার্দ্ধ থাকিতে পারে না; হয় শরীর দ্বারা, নয় বাক্যদ্বারা, নয় মনদ্বারা কর্ম্ম করিবেই করিবে। তাই তাঁহারা কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মবন্ধন মোচনের ব্যবস্থা দেন।

যাহারা বাসনাবায়ু কর্ত্তৃক অষ্টপ্রহর তাড়িত, তাহাদিগের জন্য বৈদিক ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা। যে সকল কর্ম্ম তাহাদিগের কুপথ্য তাহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্মরূপ ঔষধ বিশেষ কৌশলের সহিত প্রস্তুত। এই ঔষধ সুখসেব্য না হইলেও, নিয়মের সহিত সেবন করিতে হইলেও, ইহার ফলশ্রুতির প্রভাবে, রোগীর মন এই ঔষধ সেবনে আকৃষ্ট হয়। এই ফলশ্রুতির বৈদিক নাম অর্থবাদ এবং ঔষধের নাম কাম্যকর্ম্ম। 'রোচনার্থাঃ ফলশ্রুতি":—কর্ম্মে রুচি জন্মাইবার জন্যই ফলশ্রুতি। এই কর্ম্ম কর, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে, এই কর্ম্ম কর তুমি স্বর্গে রাজার মত সুখে থাকিবে, এই কর্ম্ম কর তোমার কামনা পূর্ণ হইবে ইত্যাদি প্রশংসাবাদ দ্বারা চিকিৎসক রোগীকে কর্ম্মৌষধি সেবনে কৃতসংকল্প করেন।

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকং।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥"

বালকের জ্বর হইয়াছে, নিম খাওয়াইতে হইবে। বালক নিম খাইতে চাহে না। পিতা বলিতেছেন "বাবা! নিম খাও, তোমায় ক্ষিরের লাড়ু দিব।" বালক লাড়ুর লোভে নিম খাইল। লাড়ু পাইল না বটে, কিন্তু আরোগ্য হইল। ফলশ্রুতি কোনও কোনও স্থলে সত্য না হইলেও তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

রোগী ক্ষণিক সুখের পথ ছাড়িয়া চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিল। শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে করিতে তাহার দুষ্প্রবৃত্তিগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং সৎপ্রবৃত্তিগুলি উদ্রিক্ত হইল। তাহার সত্ত্বগুণ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বায়ুরোগ ততই উপশম হইতে লাগিল।

যাহাদিগের বাসনা পিত্তপ্রধান, তাহাদিগের কর্ম্মতৃষ্ণা তত বলবতী নহে। তাহারা কর্ম্মবায়ুগ্রস্তদিগের ন্যায় বাসনা-সাগরে নিমজ্জিত নহে। তাহাদিগের চিত্তে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব আছে। এই সমস্ত লোকের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের

ব্যবস্থা। যাহারা একবারে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিতে অক্ষম, তাহারা সমস্ত কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্যবস্থা। এই শ্রেণীর লোকেরই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মে অধিকার হয়—ইহারাই আধ্যাত্মিক উন্নতি-সোপানের প্রথম কক্ষে আরোহণ করেন। মনু বলিয়াছেন, "অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে"।

যাহাদিগের বাসনা শ্লেষ্মাময় তাহাদিগের রোগ বড় কঠিন। তাহাদিগের বায়ু ও পিত্তনাড়ী তর্জ্জনী ও মধ্যমায় প্রায় আঘাত করে না; শ্লেষ্মানাড়ী অনামিকায় "ঢপ্ ঢপ্" করে। তাহাদিগের চিত্ত তমোগুণে অভিভূত। তাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সেবা করিয়া, প্রতিনিয়ত সদাচরণ দেখিয়া, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবে, ইহাই তাহাদিগের চিকিৎসা।

কর্ম্ম হইতে ভবব্যাধির উৎপত্তি এবং কর্ম্মদ্বারা তাহার নিবৃত্তি—আর্য্য ঋষি-দিগের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। কর্ম্মদ্বারা যাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাহারা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে পারে না; সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে নিবৃত্তি-মার্গে অধিকার হয় না; নিবৃত্তিমার্গ ভিন্ন ভবরোগের মূলোৎপাটনের উপায়ান্তর নাই। তাই, পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্মেণ তপসা হরি তোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ং॥

ঋষিদিগের ভবরোগ চিকিৎসা প্রণালী ধরাতলে নিরুপম। কোনও দেশে, কোনও জাতি মধ্যে এরূপ প্রণালী নাই। ঋষিরা গুণকর্ম্মানুসারে মনুষ্যজাতিকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম্ম ও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং মনুষ্যজীবন চারি আশ্রমে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি এই চিকিৎসা প্রণালীর অধীন থাকিবেন ভবব্যাধি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম, ভব-রোগের মহৌষধ। এই ঔষধ সেবন করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, আমিত্বের সংকীর্ণতা দূর হয়, স্বার্থত্যাগ ও পরার্থসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

বৃষ্টি।

এই নিদাঘের অপরাহ্ণে কোথা হইতে কালমেঘ আসিয়া আকাশে দেখা দিল; খানিক গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডাকাডাকি করিল; কে জানে কাহাকে ডাকিয়া আলিঙ্গন করিল, তাহার পর বর্ষণ আরম্ভ হইল। এই বৃষ্টি কেন হয়, কোথা থেকে আসে, কি উদ্দেশ্যে আসে, ঐ উদ্দেশ্য কাহার, এই সব চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইয়াছে।

বৃষ্টি তত্ত্বসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যতদূর সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এই—

চিনিরপানাতে চিনি যেমন জল হইয়া জলের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বায়ুরাশির সহিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া মিলিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা যে বায়ুসমুদ্রে ডুবিয়া আছি উহা বাস্তবিক কেবল বায়ু নহে, উহা বায়ুতে মিলিত জলেরপানা। গরম চিনির রস যখন শীতল হয় তখন চিনির দানা তলায় জমিতে থাকে ইহার কারণ এই যে, গরম অবস্থাতে জল যত খানি চিনি আপনদেহে মিশাইয়া রাখিতে পারে শীতল অবস্থায় তত পরিমাণ চিনি ধরিয়া রাখিতে পারে না, সেই জন্য গরম অবস্থায় যে টুকু বেশী ধরিয়া রাখিয়াছিল শীতল অবস্থায় সেইটুকু জল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সেইরূপ বায়ু যত গরম থাকে তত বেশী জল উহার সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে পারে। সেইজন্য গরম বায়ু যখন শীতল হয় তখন উহা যতটুকু জল ধরিয়া রাখিতে পারে তাহার বেশী যতটুকু উহাতে পূর্ব্বে ছিল তাহা আবার জলকণারূপে বায়ুতে ভাসিতে থাকে। বায়ুর নিম্নস্তরে ঐ ভাসমান জলকণা যখন দেখা যায় তখন উহার নাম কুজ্ঝটিকা এবং উপরের স্তরে যখন দেখা যায় তখন উহার নাম মেঘ। মেঘের জলকণা কতকগুলি একত্র হইয়া বড় বড় হইলে উহাই বৃষ্টিবিন্দুরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়।

সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া সন্নিকটস্থ বায়ুকে উত্তপ্ত করে; তখন বায়ু অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা পায়। জলের অনু সকলেরও একটি আভ্যন্তরিক শক্তি আছে (Tension of aquaus vapour)

যে নিবন্ধন উহা বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিলিত হইতে চাহে এই দুই শক্তির সংযোগে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুতে মিলিত হইয়া থাকে। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে জল, তাপ ও বায়ু এই তিনটি বৃষ্টির কারণ।

কিন্তু বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে হিন্দু ঋষিগণ বলেন যে যজ্ঞই বৃষ্টির কারণ।

যজ্ঞাৎভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ এই কথা ভগবদ্গীতাতেও পাওয়া যায়। এখন কাহার কথা মানিব? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা না হিন্দু ঋষিদের কথা?

একটি উনানে আগুন জ্বলিতেছে, উহার উপরে একটি হাঁড়িতে জল ও চাল আছে; চাল সিদ্ধ হইয়া অন্ন প্রস্তুত হইতেছে ইহা দেখিয়া অন্ন প্রস্তুত করিবার কারণ সম্বন্ধে তুমি বুঝিলে যে, অগ্নি জল হাঁড়ি ও চাল ইহারাই অন্নের কারণ, আর একজন কিন্তু ঐ অন্ন প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া বুঝিল যে কোন না কোন ব্যক্তির ক্ষুধা শান্তির উদ্দেশ্যে, যিনি অন্ন প্রস্তুত করিতে জানেন এমন কোন লোক অগ্নি জল হাঁড়ি ও চাল সংগ্রহ করিয়া এই অন্ন প্রস্তুত করিতেছে। বল দেখি প্রকৃত সত্য কে বুঝিয়াছে? তুমি যে অগ্নি জল হাঁড়ি ও চালকে অন্নের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছিলে সে কথা সত্য বটে কিন্তু অপর একজন যাহা বুঝিলেন উহাই অধিকতর সত্য কথা। বৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধেও সেইরূপ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ যতদূর বুঝিয়াছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু হিন্দু ঋষিগণ যাহা বুঝিয়াছিলেন—তাহাই পূর্ণ সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ বৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে যতদূর বুঝিয়াছেন তাহার অসম্পূর্ণতা কোথায় তাহাই প্রথমে ভাবিয়া দেখা যাউক। পৃথিবী, জল, বায়ু ও তাপপ্রদ সূর্য্য ১৮৯৬ সালেও যাহা ছিল ১৮৯৭ সালেও তাহাই ছিল তবে বল দেখি ভারতবাসিগণ কেন এই ১৮৯৭ সালে বৃষ্টি হইল না বৃষ্টি হইল না বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, ১৮৯৭ সালের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে কত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল ইহা কি কেবল একটি আকস্মিক ঘটনা; ইহার ভিতর কি কোন কারণ নাই? হিন্দু-ঋষিগণ এই অনাবৃষ্টি ও সুবৃষ্টি যাহার উপর জীবের জীবন নির্ভর করিতেছে তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়া বৃষ্টির কারণ অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং জীবের হিত-কামনাই তাঁহাদের চিন্তার উদ্দেশ্য থাকাতে প্রকৃত সত্য যজ্ঞবিদ্যারূপে তাঁহাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু উহা দেখিবার লোক যদি কেহ না থাকে তবে হয়ত জল মরিয়া গিয়া ভাত পুড়িয়া যাইবে, না হয় টিক্‌চেলে পড়িয়া যাইবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত করিতে গেলে পাকক্রিয়াভিজ্ঞ কোন লোকের পরিদর্শন প্রয়োজন অর্থাৎ পাকক্রিয়ার একজন চেতনকর্ত্তা না থাকিলে উক্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। সেইরূপ বৃষ্টি বর্ষণরূপ ক্রিয়ার ও চেতনকর্ত্তা আছেন, হিন্দু ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন। চিন্ময়ী প্রকৃতির যে সন্তানগণ তাঁহার বৃষ্টিবর্ষণ ক্রিয়ার পরিদর্শক, ঋষিগণ তাঁহাদিগকে বর্ষণকারী দেবতা বলিয়া থাকেন। সূর্য্যের তাপ, জল ও বায়ু বৃষ্টির কারণ বটে, কিন্তু এই অচেতন কারণ ভিন্ন বৃষ্টিপাতের চেতন কারণ আছে—ইহা যদি স্বীকার না করা যায় তবে এই যে কোন বৎসর সুবৃষ্টি কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হইতেছে ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সূর্য্যের তাপ পাইয়া এবৎসর যত পরিমাণ জল পৃথিবী হইতে উঠিয়া বাতাসে মিশিবে ও শেষে বৃষ্টি হইয়া পড়িবে আগামী বৎসরও তত পরিমাণ জল উঠিবে ও পড়িবে কারণ যে জল তাপ ও বায়ু ঐ উত্থান ও পতনের কারণ তাহা এ বৎসরও যাহা আছে আগামী বৎসরও তাহাই থাকিবে। কিন্তু ঐ জল কোন দেশে কি পরিমাণে কোন সময়ে বর্ষণ হইবে তাহা তুমি আমি কিছুই জানি না। এই যে দেশ কাল অনুসারে বর্ষণের তারতম্য, যাহার উপর সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে ইহা কি কোন নিয়মের অধীন নহে? ইহা কি প্রকৃতির খামখেয়ালী উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার? বিজ্ঞানবিৎ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। জড়বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন যে উহাও জড়ের কোন নিয়মের অধীন তবে আমরা সেই নিয়ম কি তাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। হিন্দুর কথা এই যে ঋষিগণ সেই নিয়ম কি তাহা বুঝিয়াছিলেন; দেবতাগণ সেই নিয়মাভিজ্ঞ জীব। এই দেবতাগণকে যদি মান তবে ঐ নিয়মকে জড়ের নিয়মই বল আর চেতনের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ স্থাপক নিয়মই বল তাহাতে ঘড় আসিয়া যাইবে না। যে জন যে কার্য্যের নিয়ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই কার্য্যের ভার সেই লইয়া থাকে, সেইরূপ যে দেবগণ বৃষ্টিবর্ষণ সংক্রান্ত নিয়মাভিজ্ঞ তাঁহারা সেই নিয়ম জানিয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন তাহার যোটি নাই, প্রকৃতির আদেশে বর্ষণক্রিয়া পরিদর্শনের ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত আছে। ইহাঁরা বর্ষণক্রিয়ার কর্ত্তা। মনুষ্য যেমন দেহধারী জীব এই

দেবতারাও সেইরূপ দেহধারী জীব; তবে মনুষ্যের দেহ স্থূল উপাদানে গঠিত ইহাদের দেহ সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। মনুষ্যগণের সহিত এই দেবতাদিগের এক প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে ইহারাই নাম যজ্ঞচক্র। মনুষ্য মন্ত্রপূত করিয়া তাহাদের অঙ্গ নিঃসৃত তেজ দেবোদ্দেশে ত্যাগ করিবে এবং দেবগণ উহা গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলে তাঁহারা আবার তাঁহাদের তেজ মনুষ্য উদ্দেশে ত্যাগ করিবেন ইহাই সেই যজ্ঞচক্র। মনুষ্য তাঁহার তেজ দেবোদ্দেশে ত্যাগকালে ঘৃত বা অন্য কোন পদার্থে মিলিত করিয়া ত্যাগ করেন, দেবগণ তাঁহাদের তেজ বৃষ্টিসহ মিলিত করিয়া বর্ষণ করেন। দেবগণ নিঃসৃত এই তেজ পৃথিবীস্থ অন্নের বীজ সকল অঙ্কুরিত করে; উহা হইতে মনুষ্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণ যখন আবার মন্ত্রপূত হবি দেবোদ্দেশে আহুতি দেন তখন সেই মন্ত্রময় তেজ অগ্নিগর্ভে পতিত হইয়া সূক্ষ্ম আগ্নেয় পদার্থে সম্মিলিত হইয়া দেবভোগ্য পদার্থে পরিণত হয় ও ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেবলোকে গিয়া দেবতাদের পোষণ করিয়া থাকে। এই দেবপূজার অপর নাম কর্ম্ম বা যজ্ঞ। এই যজ্ঞ যে বৃষ্টির কারণ কেন তাহা পাঠকগণ এইবারে বুঝিতে পারিবেন। 'যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যঃ,' ইহার অর্থ এখন এই বুঝা গেল যে যজ্ঞদ্বারা দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারা প্রতিদান স্বরূপ—যাজকের ঈপ্সিত ফল প্রদান জন্য সুবৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকেন।

"যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যঃ" এই কথায় অর্থে কোন কোন টীকাকার যজ্ঞধূম হইতে মেঘ উৎপন্ন হয় এইরূপ অর্থ করেন কিন্তু যজ্ঞের ধোঁয়া জমিয়া মেঘ হয় এরূপ অর্থ উহার নহে। ওখানে যজ্ঞধূম অর্থে আমাদের পূর্ব্ব কথিত সূক্ষ্ম আগ্নেয় পদার্থ যাহা দেবভোগ্য পদার্থ হইয়া দেবলোকে গমন করে তাহাই বুঝিতে হইবে।

মেঘ যেমন করিয়া হয় সেই সম্বন্ধে একটি কল্পনা মনে আসিয়াছে উহা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মনে ভাব যেন আকাশে দেবতা আছেন তিনি মনে করিলেন যে আজি পৃথিবীর অমুক স্থলে বৃষ্টিবর্ষণ হউক; তাঁহার এই কামনা নিবন্ধন একটি তড়িন্ময় সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীর সেই স্থানে পতিত হইল। চিনির রস থেকে মিছরি প্রস্তুত করিবার সময় চিনির রসের মধ্যে সূতা ফেলিয়া দিতে হয়; রস যত শীতল হইতে থাকে

চিনির দানাগুলি তত ঐ সূতার গায়ে জমিতে থাকে। এই বারে মনে কর যে দেবতার হৃদয় নিঃসৃত ঐ রশ্মিটি আমার পূর্ব্ব কথিত বায়ুসাগরে জলের পানার মধ্যে ঐরূপ একগাছি সূতা। চিনির দানার ন্যায় জলের কণাগুলি এই তড়িন্ময় সূত্র অবলম্বনে জমিয়া মেঘ হইল ও বৃষ্টি হইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ বৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর বুঝিয়াছেন তাহার উপর আর একটু বুঝিলেই অর্থাৎ দেবতা ও দেবতার ইচ্ছা প্রসূত তড়িন্ময় ঐ সূত্রটির কথা বুঝিলেই ঋষিগণ কথিত বৃষ্টি বিজ্ঞান বিশদরূপে বুঝা যায়।

আমরা যে দেবতাহৃদয়ে নিঃসৃত তড়িন্ময় সূত্রটির কল্পনা করিয়াছি তাহা অমূলক নহে। যোগীর হৃদয়ক্ষেত্রে সহস্রার আকাশ হইতে যে সুধাবর্ষণ হয় উহা একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তড়িৎরেখা অবলম্বনে হইয়া থাকে; ঐ তড়িৎরেখার নাম কুণ্ডলীসূত্র। পাঠকগণ তন্ত্রশাস্ত্র অবলম্বনে সাধনা দ্বারা তড়িন্ময়ী কুণ্ডলিনীর রহস্য বুঝিতে পারিবেন। অন্তরাকাশের সুধাবর্ষণ যে প্রণালীতে হইয়া থাকে বহিরাকাশেও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বনে বৃষ্টিবর্ষণ হয় এবং ইহাই আমাদের কল্পনার মূল। ওঁ বজ্রপাণি হুঁ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ভূতের উপদ্রব।

আমরা 'অলৌকিক ঘটনাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধ গুলিতে মধ্যে মধ্যে ভূতের কথা লিখিয়াছি; সেই সকল ভূত কিন্তু মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে, অদ্য যে গল্প বলিতেছি ইহা মানুষ জন্মিয়া ভূত হওয়ার কথা। এই জীবন্ত ভূতেরা ছাপাখানায় থাকে, ইহাদের নাম ছাপাখানার ভূত; ইংরাজীতে বলে printer's devil আমাদের পন্থার উপর ইহাঁদের যথেষ্ট উপদ্রব আছে। ছোট খাট উপদ্রব গুলির বিষয় লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায়, সেই জন্য বড় বড় উপদ্রব দুই একটির কথা বলিয়া আজি পাঠকগণের চিত্তরঞ্জন করিব।

ভূতে এক জায়গার দ্রব্য অপর জায়গায় উঠাইয়া লইয়া যায়, পাঠকগণ

একবার গত বৈশাখ মাসের পন্থার ২৬ পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষে যে দুইটি ছত্র আছে সেই দিকে দেখুন; দেখিবেন যে ভূতেরা একটি 'য' ফলা কেমন সুন্দর এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় উঠাইয়া দিয়াছে। 'বিদৈ্যষা' কথার 'য' ফলা উঠাইয়া 'নূনম্' কথার প্রথম 'ন' কারে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে।

তোমরা কেহ 'সঙ্গা' কথার অর্থ জান? ভূতেরা 'গঙ্গা' নামে ভয় পায় তাই গত বৈশাখের পন্থার ৪ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে গঙ্গা স্থলে 'সঙ্গা' লিখিয়া রাখিয়াছে।

ঐ সংখ্যা পন্থার ৩ পৃষ্ঠার নিম্নে যে টীকা আছে উহাতে 'কৌথুমী' স্থলে 'কৌমুদী' লিখিয়া সম্পাদকের 'প্রথম কথার' অর্থটি একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছে।

জীবন্ত ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে আমরা অদ্য নিশ্চয়ই সফল হইয়াছি, সুতরাং ভূতেরা পন্থার আর কোথায় কি উপদ্রব করিয়াছে তাহা আর দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

ব্রহ্মা ও লোকপদ্ম।

সোঽন্তঃ শরীরেঽর্পিত ভূত সূক্ষ্মঃ কালাত্মিকাং শক্তিমুদীয়মাণঃ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদেস্বে যথানলো দারুনিরুদ্ধ বীর্য্যঃ॥ ভা, পু, ৩।৮।১২।

যখন এই বিশ্ব একার্ণব জলে নিমগ্ন ছিল, তখন নারায়ণ আত্ম অধিষ্ঠান সেই জলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃশরীরে ভূতসূক্ষ্ম নিহিত ছিল। অর্থাৎ ভূত সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতে নিহিত ছিল। তিনি ভূতসৃষ্টির সহকারী কালশক্তিকে জাগরিত করিয়াছিলেন। অগ্নি যেরূপ নিরুদ্ধবীর্য্য হইয়া কাষ্ঠে অবস্থিতি করে, তিনিও সেইরূপ ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রমপ্সু স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা।
কালাখ্যয়া সাদিত কর্ম্মতন্ত্রো লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে॥ ৩।৮।১২।

চতুঃসহস্রযুগ নারায়ণ জলমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। তাহার পর তিনি কালাখ্য আত্মশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছিলেন। তখন তিনি আপনার দেহমধ্যে লীন লোক সকলকে দেখিয়াছিলেন।

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে রন্তর্গতোর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ সূষ্যংস্তদা ভিদ্যত নাভিদেশাৎ॥ ৩।৮।১৪।

নারায়ণ অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অর্থসমূহে দৃষ্টি নিবেশ করিলে, অন্তর্গত সেই অর্থ কালানুযায়ী রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটি সূক্ষ্ম-পদার্থরূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎসলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ॥ ৩।৮।১৫।

জীবের অদৃষ্ট কালকর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইলে, সেই সূক্ষ্ম পদার্থ পদ্মকোষরূপে সহসা উত্থিত হইয়াছিল। তখন সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া সেই পদ্মকোষ বিশাল জলরাশিকে আলোকিত করিয়াছিল।

তল্লোক পদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ং ভবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥ ৩।৮।১৬।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ জন, তপঃ, সত্য, এই সাত লোক। সপ্তলোকাত্মক সেই পদ্মে জীবভোগ্য সকল পদার্থই প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু সেই পদ্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদ্বারা অধিষ্ঠিত সেই পদ্মমধ্যে, স্বয়ং বেদময় বিধাতা, যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (পাদ্মকল্পের এই বিবরণ। পূর্ব্ব কল্পের অন্তে ব্রহ্মা, নারায়ণের সহিত নিদ্রাবস্থায় একীভূত হইয়াছিলেন। পাদ্মকল্পে নারায়ণ জাগরিত হইলে পদ্মমধ্যে তিনি ব্রহ্মাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শ্রীধর।)

শত বৎসর কাল ব্রহ্মা সেই সমগ্র লোক পদ্ম এবং সেই পদ্মের মূল জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বহির্মুখ বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জানিতে সমর্থ হন নাই। পরে শত বৎসর কাল সমাধিযোগে আরূঢ় হইয়া, তিনি অন্তর্হৃদয় মধ্যে যাহা যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সকলই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ভগবান কমলযোনি তখন আপনার অধিষ্ঠান পদ্মকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং হৃতবীর্য্য প্রলয় বায়ুদ্বারা কম্পিত একার্ণব জলের তত্ত্বও

জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তখন সমৃদ্ধবিজ্ঞান বলদ্বারা সেই জল ও বায়ুকে পান করিয়াছিলেন। (৩।১০।৫ এবং ৬)

তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩।১০।৭।

আকাশব্যাপী আত্ম অধিষ্ঠিত সেই পদ্ম অবলোকন করিয়া, ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন, যে সেই পদ্ম হইতে প্রলয়বশতঃ লীন তিন লোককে সৃষ্টি করিবেন। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ, এই তিন লোক প্রতিকল্পে নাশপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের সংস্কার ঊর্দ্ধতন লোকে লীন হয়। সেই সংস্কার অবলম্বন করিয়া, প্রতিকল্পে ব্রহ্মা ত্রিলোকী সৃষ্টি করেন। মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই চারিলোক, কল্পান্তে এবং কল্পমধ্যে একভাবে অবস্থিতি করে। সপ্তপাতাল ভূর্লোকের অন্তর্গত। কিম্বা তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ধরিতে গেলে চতুর্দ্দশ লোক।

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎ কর্ম্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীৎ উরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥ ৩।১০।৮।

ভগবান্ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রেরিত ব্রহ্মা পদ্মকোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ এবং চতুর্দ্দশাধিক লোকরূপে চিন্তনীয় সেই এক লোক পদ্মকে ত্রিলোকীরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৩।১০।৯।

ত্রিলোকী বিভাগের কারণ এই যে এই ত্রিলোকী জীবের ভোগ স্থানের রচনা বিশেষ। সত্যলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক বা ফলস্বরূপ। (শ্রীধরস্বামী বলেন যে এখানে সত্যলোক শব্দে মহঃ, জন এবং তপঃ লোককেও বুঝিতে হইবে।) ত্রৈলোক্য কাম্যকর্ম্ম ফলভোগের স্থান। এই জন্য প্রতিকল্পে ইহার উৎপত্তি ও নাশ হয়। মহঃ প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকবাসীদিগের উপাসনা সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মফলে দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের নাশ হয় না। এবং সেই কাল পরে ঐ সকল লোকবাসী জীবের মুক্তি হয়।

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের শেষচরণ অবলম্বন করিয়া ভাগবত পুরাণে লিখিত হইয়াছে।

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥ ২।৬।১৮।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকার্দ্ধের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

কালত্রয়বর্ত্তী সকল প্রাণী ঈশ্বরের এক পাদে। "ঈশ্বরের অপর ত্রিপাদ অমৃত অর্থাৎ নিত্য সুখদ। সেই ত্রিপাদ ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত। ত্রিলোকীর মধ্যে নহে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই তিনের মস্তকে মহর্লোক অবস্থিত। মহর্লোকের মস্তকোপরি জন, তপঃ ও সত্যলোক অবস্থিত। এই উপরিতন তিন লোকে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় নিহিত আছে। ত্রিলোকীবাসীদিগের সুখ নশ্বর। মহর্লোকবাসীদিগের ক্রমমুক্তি লাভ হইলেও, কল্পের অন্তে তাঁহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য তাঁহাদিগের সুখ অবিনাশী সুখ নহে। কারণ ভাগবতে লিখিত আছে যে যখন প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ হয়, তখন তাহার তাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোকবাসী ভৃগু আদি ঋষি জনলোকে গমন করেন। জনলোকবাসীদিগের 'অমৃত' অর্থাৎ অবিনাশী সুখ। কারণ যাবজ্জীবন তাঁহাদিগকে স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু কল্পান্তে ত্রিলোকদাহ পীড়িত মহর্লোকবাসীগণ জনলোকে আগমন করিলে, জনলোকবাসীদিগকে অক্ষেম অর্থাৎ অমঙ্গল দর্শন করিতে হয়। তপোলোকে সেই অমঙ্গলের অভাব। এইজন্য তপোলোকে 'ক্ষেম' নিহিত আছে। সত্যলোকে "অভয়" অর্থাৎ মোক্ষ নিত্য সন্নিহিত।"

ব্রহ্মা ত্রিলোকী ও ত্রৈলোক্যবাসীদিগকেই সৃষ্টি করেন। তিনি ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিলে ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর তিনি ত্রিলোকীবাসী জীব সমূহকে যথাক্রমে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ত্রৈলোক্যবাসী জীবসমূহের দুঃখে কাতর হইয়া সদ্যোমুক্তিকেও অবহেলা করেন, তাঁহারা আপন আপন অধিকার অনুসারে ঊর্দ্ধতন লোক সমূহে বাস করেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা মুক্তির প্রার্থী নহেন।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ পুরুষোঽহ্যবয়াত্মা।

বিগত রজ হইয়া তাঁহারা সূর্য্যের মধ্য দিয়া সেই দেশে গমন করেন, যেখানে

অমৃত, অব্যয়াত্মা পুরুষ বিরাজিত আছেন। কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মার সহিত সেই সকল যোগেশ্বর, যোগপ্রবর্ত্তক কুমারাদি সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ প্রথম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আপন আপন অধিকারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ মহর্ষিভিঃ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগ প্রবর্ত্তকৈঃ॥ ৩।৩২।১২।
ভেদদৃষ্ট্যভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্ম্মণা।
কর্ত্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্মা পুরুষং পুরুষর্ষভম্॥ ৩।৩২।১৩।
স সংস্থত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বর মূর্ত্তিনা।
জাতেগুণব্যতিকরে যথাপূর্ব্বং প্রজায়তে॥ ৩।৩২।১৪।

সেই সকল মহাত্মারা যে লোকে বাস করেন, সেখানে কোনরূপ শোক নাই, আনন্দের উৎস সেখানে স্বতঃ অকুণ্ঠভাবে প্রবাহিত। কিন্তু সেই আনন্দের অপার সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়াও, তাঁহারা জীবের দুঃখে কাতর।

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু,
র্নার্ত্তি র্নচোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোদঃ কৃপয়াঽনিদং বিদাং,
দুরন্তদুঃখ প্রভবানুদর্শনাৎ॥ ২।২।২৭।

যেখানে শোক নাই, যেখানে জরা নাই, যেখানে মৃত্যু নাই, যেখানে কাতরতা নাই, যেখানে ভয় নাই। কিন্তু যেখানে একমাত্র মনঃপীড়া আছে। যাহারা ভগবানের উপাসনা জানে না, তাহাদিগের দুরন্ত দুঃখ অনুদর্শন করিয়া করুণা বশতঃ সেই এক মনঃপীড়া।

সেই পরম কারুণিক ঋষিগণের চরণে শত শত নমস্কার। তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়াই ত্রৈলোক্যবাসীগণ এ পর্য্যন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আবার তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যে সকল মহাত্মা তাঁহাদিগের ন্যায় অধিকার গ্রহণে উৎসুক, তাঁহাদিগেরও চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

এইবার দশবিধ সৃষ্টির বিষয় আমরা বর্ণনা করিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

স্বপ্ন।

(১)

কোন্ মহা স্বর্গ'পরে থাক গো স্বপন-রাণি ?
বুঝি বা অমিয়া দিয়া, গঠেছে তোমার হিয়া,
বিরলে বিধাতা বসি বিমোহিতে জীব-প্রাণী !
বিশ্ব-হৃদে তব হাসি, বিদ্যুৎ-বিভায় পশি,
ভুলায়—মাতায় জীবে মরুভূমে সুধা আনি !
কোন্ মহা স্বর্গ'পরে থাক গো স্বপন-রাণি ?

(২)

অচিন্ত্য-শকতি তুমি করুণার পারাবার !
তব মহা মায়া-মোহ, করে মুগ্ধ ভব-গৃহ,
তব স্নেহে দগ্ধ হৃদে ঝরে কিবা সুধা-ধার !
বিশ্ব যবে মগ্ন প্রায়, সুষুপ্তির ঘোরে হায়,
প্রবেশি মনোমন্দিরে কি মোহিনী-মায়া-হার
সুকোমল করে দেবি পরাও গলায় তার।

(৩)

হৃদি-রঙ্গভূমে মা'গো রঙ্গে কর অভিনয় ;—
কি মনোমোহিনী-বেশে, কর লীলা হেসে হেসে,
দেখায়ে কতই চিত্র কত বিচিত্রতাময় !
দেখাও জন্ম রহস্য, কভুবা নরক-দৃশ্য,
খেলে রঙ্গে রঙ্গময়ি, কভু স্বর্গ মধুময় ;—
বিমোহিয়া জাগাইতে কর কিবা অভিনয় !

(৪)

বিজলী-বালিকা প্রায় এই আছ এই নাই !—
এই আসি মধুবুলি, শ্রবণে দিতেছ ঢালি,
মর্ত্তের যাতনা ভুলি কোন্ স্বর্গে ভেসে যাই

স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, কাঁদিলে কোলেতে ল'য়ে,
দেখাও অপূর্ব্ব দৃশ্য—কি শান্তি হৃদে জাগাই!—
যেথা বিভু নারায়ণ, প্রকৃতি-প্রেমে মগন,
দেখাও সে প্রেম-ধাম—কি আনন্দ হৃদে পাই!
ভেঙ্গনা এ স্বপ্ন-মায়া, মায়াময়ি, ভিক্ষা চাই।

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী।

সঙ্গীত।

(গৌরাঙ্গ-বিষয়ক)

খুলেছে প্রেমিক এক প্রেমের বাজার নদীয়ায়।
কে আছে,— প্রেম-ভিখারী নরনারী
নিবিরে প্রেম যদি আয়।
এ প্রেমের এম্‌নি ধারা,
পরশে লোক পাগল পারা,
বয়,— নীরস প্রাণে রসের তুফান
এ,— প্রেমের হাওয়া লাগ্‌লে গায়।
পাপী তাপী আয় রে চলে,
আছিস্, যেথায় যতজনা ;—
চলেযা' স্বর্গপুরে হরি বলে,
নিয়ে এর একটী কণা।
অসীম এ ধনের আগার,—
কিছুতে নহে ফুরাবার
বিন্দুতে সিন্ধু হ'য়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য ডুবে যায়।
এর,— নাইক' তুল্য, নাইক মূল্য—
যেজন নিতে পারে,—অম্নি পায়।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(প্রথম সংখ্যার ২৯ পৃষ্ঠার পর।)

এই নিদ্রাবস্থায় যাহা স্বপ্নে দেখিলাম তাহা লিখিতেছি। দেখিলাম যেন পূজার স্থানে যাইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছি, এমন সময়ে দেখি সেই দেবোপম সৌম্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছেন, দর্শন মাত্রই তিনি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবার জন্য অনুমতি করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমার এমন সাধ্য হইল না যে তাঁহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারি, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে লাগিলাম, চলিতে চলিতে কতদূর যাইয়া পড়িলাম তবু চলিবার বিরাম নাই ; কিন্তু এমন সাধ্য হইল না যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে কোথায় যাইতেছি। এরূপভাবে আরও কিয়দ্দূর যাইয়া একটি নদীর তীরে উপনীত হইলাম এইবার ভাবিলাম বুঝি আর চলিতে হইবে না ; নদীতে নৌকা নাই কেমন করিয়া তিনি ও আমি পার হইব, ও হরি! দেখি যে তিনি অবলীলাক্রমে সেই নদী পদব্রজে পার হইলেন আমাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন তাঁহার আদেশ অন্যথা করা আমার সাধ্য নাই, এই বার বুঝি নদীতে ডুবিয়া মরিতে হইল কি করি কাযে কাযেই নামিতে হইল কিন্তু এমনি তাঁহার শক্তির প্রভাব যে আমিও অনায়াসে পদব্রজে পার হইলাম। এইরূপ ভাবে কত নদ নদী পার হইলাম ও কত পর্ব্বত উলঙ্ঘন করিলাম কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত চলিতেছি তাহাতে কোন ক্লান্তিবোধ হইতেছে না।

এইরূপ ভাবে কতক দূর যাইয়া তিনি একটী পর্ব্বতের উপত্যকায় জঙ্গলের ধারে যাইয়া থামিলেন আমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে থামিলাম। তিনি আমাকে একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিতে বলিলেন আমি বসিলাম, তিনি আমার নিকট হইতে কিয়দ্দূরে একটি ঝরণার ধারে গিয়া কি করিলেন বলিতে পারি না, দেখিতে দেখিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। দেখিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম। সেই অগ্নির আলোকে চারিদিক দেখিতে লাগিলাম অতি মনোরম স্থান এস্থানের মনোরম ভাব ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। এমন সময়ে তিনি আমাকে ঝরণার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন আমি ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে ঝরণার জলে স্নান করিতে বলিলেন আমি

স্নান করিতে করিতে এমনি আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম যে জীবনে এক দিনও এরূপ আনন্দ পাই নাই। স্নান করিয়া দেখি যে প্রজ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে দুইখানি আসন রহিয়াছে, একখানি আসনোপরি একখানি লালপেড়ে গৈরীক সাটী ও কয়েক ছড়া ছোট বড় রুদ্রাক্ষমালা রহিয়াছে। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন যে "ঐ গৈরীক বস্ত্র পরিধান কর আর গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেল" এইবার আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম কিছু বলিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমি অলঙ্কারের মায়ায় কাঁদি নাই। আমি সধবা কেমন করিয়া সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া বিধবার বেশ ধরিব এই ভাবনায় কাঁদিয়া ফেলিলাম, তিনি সহাস্য মুখে বলিলেন তুমি হস্তের লৌহবলয় ভিন্ন সমস্ত উন্মোচন কর, আর আসনস্থিত রুদ্রাক্ষমালা হস্তে ও গলে ধারণ করিয়া ঐ আসনে কেশবন্ধন করিয়া যাহাতে কষ্টানুভব না হয় এরূপ ভাবে উত্তর মুখ হইয়া অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন কর। আমি আশ্বস্ত হইয়া প্রথমেই স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করতঃ, তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুযায়ী আসনে উপবেশন করিলাম। তাহার পর তিনি অপর আসনে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই পথ অতীব কঠিন এই পথে সহজে কেহ আসিতে চাহে না ও পারে না, তোমার স্বামীভক্তি দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছি কিন্তু এপথে আসিতে হইলে সব পার্থিব ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ঐকান্তিক স্বামীভক্তি ও পুরুষের পক্ষে ঐকান্তিক পিতৃ ও মাতৃভক্তি পার্থিব ভাবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভাব; যাহার যাহার ঐ উচ্চভাব প্রবল সেই সকল লোক চেষ্টা করিলে ক্রমে এই পথের পথিক হইতে পারে; যে পুরুষের পিতা ও মাতা প্রতি অনাস্থা বা অভক্তি ও যে স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি অনাদর ও অভক্তি তাহাদের এপথে আসিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র"। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন আমি স্থিরভাবে কথাগুলি অনুধাবন করিতে লাগিলাম।

তাহার পর তিনি কতকগুলি উচ্চ বিষয়ের গুহ্য উপদেশ দিলেন যাহা আমি লিখিতে বা প্রকাশ করিতে অক্ষম। "বেণী খুলিয়া শিখাবন্ধন পূর্ব্বক সমস্ত পার্থিব বিষয় মন হইতে দূর করিয়া স্থিরভাবে বস আমি তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিব" তিনি এই বলিয়া অল্পক্ষণ পরে আমার প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন। যেমনি আমি সেই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়াছি অমনি

এমন একটি হুঙ্কারধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল যে তাহাতে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল ও ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। এই মূর্চ্ছা অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তাহা বলিতে পারি না; মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর দেখি যে, একটি পর্ব্বত গুহায় নীত হইয়াছি। এইবার তিনি বলিলেন, "তোমার প্রকৃত গুরু আমি নহি তাঁহার আদেশে আমি তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিলাম। তোমাকে এই আসন দিতেছি, তুমি এই আসনে বসিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ কর, সাবধান যে পর্য্যন্ত আমি কিম্বা তোমার প্রকৃত গুরু আসিয়া তোমাকে আহ্বান না করেন সে পর্য্যন্ত আসন ত্যাগ করিও না; অনেক প্রকার বিভীষিকা দেখিবে এমন কি আমার বা তোমার প্রকৃত গুরুরূপ ধরিয়া আহ্বান করিবে দেখ যেন কিছুতেই আসন ত্যাগ করিও না ইহা নিশ্চয় জানিও যে তাহারা তোমার আসন, কিম্বা আসনে বসিয়া থাকিলে তোমাকে, স্পর্শ করিতে পারিবে না" এই বলিয়া তিনি আমায় আসন প্রদান করিলেন ও আমি আসনে উপবেশন করিলে পর ঐ আসনস্থিত আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিষ্ক্রামনের উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে আমি গাঢ়ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলাম তিনি আমাকে "কোন প্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার কি কোন প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া বিচলিত হইও না একাগ্রমনে ধ্যান কর" বলিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা।

(২)

দুই দিক হইতে দুইটি পথ আসিয়া এক স্থানে পরস্পর মিলিত হইয়াছে। ঐ পথদ্বয়ের সন্ধিস্থলে বহুকাল হইতে একখানি চর্ম্ম বিলম্বিত ছিল। চর্ম্মখানির একদিক রৌপ্য অপর দিক সুবর্ণ মণ্ডিত। একদা দুইজন অশ্বারোহী পুরুষ এক সময়ে দুই দিক হইতে সেই সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চর্ম্মখানির

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন—"আহা! রৌপ্য ঢালখানি বেশ সুন্দর"। ইহা শুনিয়া অপর দিক হইতে সমাগত অশ্বারোহী হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনার ভ্রম হইয়াছে, ও খানি রৌপ্যের নহে—স্বর্ণনির্ম্মিত"। ইহাতে প্রথম ব্যক্তি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আপনি অজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি ব্যতীত উহাকে সুবর্ণের বলিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারে না—ভ্রম আপনারই—আমার নহে"। ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আপনি যে প্রকৃতই অন্ধ তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই, তাহা না হইলে বাতুলের ন্যায় কথা কহিবেন কেন"!

এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিবাদটা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিল—এতই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, বাক্যমাত্রে ইহার সুমীমাংসার সম্ভাবনা রহিল না। উভয়েই সমুচিত অনুসন্ধান না করিয়াই ভাবিলেন, শারীরিক বল ও অস্ত্র কৌশল প্রয়োগে ইহার শেষ মীমাংসা করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই ঘোটকপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে আর একজন তুরগারোহী সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়কে এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথম ব্যক্তি আমূল সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন—"দেখুন তো মহাশয় ইহাকেই চক্ষু থাকিতে অন্ধ বলে না?" আগন্তুক বলিলেন—"বড়ই আশ্চর্য্য কথা যে, এক বস্তুকে দুইজনে দুই প্রকার দেখিতেছেন, ইহা যখন নিতান্ত হাস্যজনক ব্যাপার, তখন স্বচক্ষে সুন্দররূপে না দেখিয়া মীমাংসা করা কর্ত্তব্য নহে।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, একখানি চর্ম্মই দুই দিকে দুই ধাতু মণ্ডিত।

উপরোক্ত গল্পটি একটি রূপক মাত্র। স্থূলদর্শী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এইরূপই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্যের ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিয়া থাকে এবং তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করে না। তাঁহার মনে বিশ্বাস যে, তাহার অবলম্বিত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মে সত্য নাই। এই কারণই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আবহমানকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বুঝেন যে, সকল ধর্ম্মেই অল্পাধিক সত্য নিহিত আছে; কারণ তিনি জানেন যে, যে কোন ধর্ম্মই হউক না কেন, সকলেরই মূল ও উদ্দেশ্য একই—তবে একটি, ঢালের রৌপ্য দিক ও অপরটি হয়ত সুবর্ণ দিক, এই মাত্র প্রভেদ। সকলেরই গন্তব্য স্থান এক, কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে, যিনি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন বা গন্তব্য পথে যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে এই পৃথিবীতে তদনুরূপ দেশ জাতি ও ধর্ম্মমধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাহা বলিয়া একটি ধর্ম্ম সত্য ও অপরটি মিথ্যা ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। দেশ-কাল-পাত্র ও জাতিবিশেষে ধর্ম্ম বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবের সৃষ্টি সেই অদ্বিতীয় পুরুষ সেই ভগবান্ হইতে, সকল ধর্ম্মই সেই ভগবল্লাভের উপায় মাত্র—সকল ধর্ম্মই সত্য-মূলক।

এইরূপকে যে "চর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা মূল-সত্য বুঝাইতেছে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ আমরা সকলে বিভিন্নরূপ দেখিয়া থাকি। একই সামগ্রী যেমন বিভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সমুদয় ধর্ম্ম বাহ্যিক আলোকে পরীক্ষা করিলে, স্বীয় ধর্ম্মের বিপরীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃত জ্ঞানী ও সত্যানুসন্ধিৎসু যাঁহার চক্ষু অনাবৃত তিনি দুই দিক দুই বর্ণের একই ঢাল দেখিতে পাইবেন—বুঝিয়া লইবেন একই বস্তুর বর্ণভেদ মাত্র। তিনি বিবাদ বিসম্বাদে প্রবেশ করিবেন না বা দাম্ভিকতা সহকারে গর্ব্বিতভাবে কখনই বলিবেন না যে, আমার অবলম্বিত ধর্ম্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক। পরন্তু তিনি ঐ তৃতীয় অশ্বারোহীর ন্যায় সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন ও তন্নিহিত সত্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইবেন।

উপরি উক্ত রূপকটির কেহ কেহ একটি আধ্যাত্মিক অর্থও করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ চর্ম্মের দুই দিকের অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। প্রকৃতিও পুরুষ বিভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই এক তূষপরিবৃত দ্বিদলের দলদ্বয় মাত্র।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

উত্তরাখণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আগামী কল্য যে ব্যাপার সংঘটিত হইবার কথা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলেই, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে কত কি আছে, হিন্দু সাধক পবিত্র জীবন যাপন করিয়া যে কি করিতে পারেন তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সাহেবী পরিচ্ছদে সেখানে প্রবেশ লাভ করিতে পাইবেন না।" ক্যাম্বেল চিন্তামণি রায় নামক কোন দেশীয় খৃষ্টানকে ভবদেব নামক তদীয় জনৈক ব্রাহ্মণ বন্ধু এই কথা কহিতেছিলেন। চিন্তামণির পিতা সত্যপ্রসাদ রায় প্রথম জীবনে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত কখন বীজ অঙ্কুরিত হয় না। সত্যপ্রসাদের বাহ্যিকনিষ্ঠা সত্বেও, তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হওয়ায় শাস্ত্রোক্ত ফললাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ক্রমে বুদ্ধিদোষে স্বধর্ম্মে অনাস্থাবান্ হইয়া, পৌত্তলিকতা বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যপ্রসাদ অন্যান্য ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে হেনরীলঙ্গা নামক কোন রোমান কাথলিক সন্ন্যাসীর নিকট বাইবেল পাঠ করিতে করিতে তাহাতে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদ্ধর্ম্ম আলিঙ্গন করেন ও নিরন্তর সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন। সেই উদ্দেশে য়ুরোপ ও আমেরিকার কোন কোন স্থান ভ্রমণ করিয়া আইসেন।

চিন্তামণি ভবদেবের পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তর করিলেন, "আমি না হয় খৃষ্টানই হইয়াছি—এতো আমার জাতীয় পরিচ্ছদ নহে—না হয় ধুতিচাদর পরিয়াই আসিব। তোমার সহিত কখন দেখা করিতে হইবে বল।"

ভব। "প্রত্যুষে।"

এই কথার পর চিন্তামণি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা মহানগরী বিবিধ রত্নের আকর। সদানন্দ ব্রহ্মচারী নামক কোন সাধক তথায় গোপনে বাস করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের কথোপকথনের পরদিবস প্রাতঃকালে তাঁহার প্রাঙ্গণে কয়েকটি ভদ্রলোক উপস্থিত—সকলেই নীরবে একটি বালকের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। বালক নবউপনীত ব্রাহ্মণ তনয়, দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ পূর্ব্বক দুই অঙ্গুষ্ঠের নখদ্বয় সংলগ্ন করিয়া একখানি

কুশাসনে উপবিষ্ট। তাহার নখদ্বয়ের উপর একটু তৈল লেপন করিয়া "স্থিরনেত্রে নখদ্বয় অবলোকন কর, ও যাহা যাহা দেখিতে পাও, আমাকে বল" দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া তাহার মস্তকোপরি জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্রাহ্মণই আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত ব্রহ্মচারী মহাশয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক বলিতে আরম্ভ করিল—"একখণ্ড শ্বেতবর্ণ মেঘের মত কি দেখিতেছি—মেঘ ঘনীভূত হইয়া একটি বাড়ী হইল। তাহাতে লেখা * * * * A-s-s-u-r-a-n-c-e-C-o-m-p-a-n-y-L-i-m-i-t-e-d একজন উড়ে—সে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। এই উপরে একটা ঘরে গেল—একটা দেরাজ খুলিল—আবার জানালার নিকট আসিয়া বাহিরে চারিদিক দেখিতে লাগিল—ফিরিয়া গিয়া দেরাজের মধ্য হইতে কয়েকখান কাগজ লইল। এইবার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। * * * মাঝের রাস্তা দিয়া চলিল—লাল গিরিজা—লালবাজারে পোদ্দারের দোকানে দাঁড়াইল—কাগজের মধ্য হইতে একখানি নোট ফেলিয়া দিল—টাকা পয়সা লইল। একটা গাড়ীতে চড়িল—শিয়ালদার ষ্টেশন। সেখানে একটি লোকের সহিত কথা কহিল—উত্তর দিকে চলিল—আবার ফিরিয়া আসিয়া ষ্টেশন হলের এক কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া নিদ্রা গেল। উঠিল—টিকিট কিনিয়া গাড়ী চড়িল—গাড়ী ছাড়িল—এই একটা ষ্টেশন—এই আর একটা—এই আর একটা—* * * * উড়িয়া রেলগাড়ী হইতে নামিল। বামদিকে একটা লাইন—দক্ষিণদিকে গাড়ী চলিল—একটা বড় নদী—দুইখান ষ্টীমার—উড়ে একটা দোকানে বাসা লইল, ঐ যে এখন রন্ধন করিতেছে।" এই বলিয়া বালক নিরস্ত হইল। ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার পর?"

বালক। "একখান ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল—আর একখান ঘাটেই রহিল—সেখানা ষ্টীমার নহে—ফ্লাট।"

ব্রহ্ম। "তাহার পর?"

বালক।"—তাহার পর—সেই সাদা মেঘ।"

ব্রহ্ম। "উড়েটাকে দেখিলে চিনিতে পার?"

বালক। "পারি।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় একজন ভদ্রলোককে বলিলেন "মহাশয়! অনুমান হইতেছে, স্থানটা গোয়ালন্দ। লোকটা আহারের চেষ্টায় ষ্টীমার ফেল হইয়াছে, সুতরাং অদ্য সেইখানেই থাকিবে। কল্য ষ্টীমার স্থানান্তরে যাইবে। এক্ষণে আপনাদের যাহা অভিরুচি। কিন্তু দেখিবেন যেন পুলিশের হাঙ্গামে আমাকে না যাইতে হয়।"

ভদ্র। "মহাশয় আমি পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আপনি যাহাতে বিপন্ন হন, তাহা কখনই করিব না—আপনি নিরুদ্বেগে থাকুন।"

চিন্তামণি এবং ভবদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোকটি ভবদেবকে কহিলেন—"ভবদেব! তুমি গাড়িতেই গোয়ালন্দ চলিয়া যাও। তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিবে, কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।"

অদ্য ক্যাম্বেল চিন্তামণি রায়ের সাহেবী পরিচ্ছদ নাই—বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া আসিয়াছেন। তিনি ভবদেবকে অন্তরে লইয়া গিয়া কাণে কাণে কি কথা বলিলেন।

চিন্তামণি সর্ব্বশেষে এই কথা বলিলেন—"আমি কি পাগল? আর আমাকে কি আপনি এতদিনেও চিনিতে পারেন নাই।"

যেরূপ শুনা গিয়াছে তাহাতে উড়েটা ৭৫০৲ টাকার নোট চুরী করিয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি টাকা ব্যতীত সমুদয়ই আদায় হইয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে একদা চিন্তামণি রায় ও ভবদেব, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। চিন্তামণি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি প্রকারে ঐরূপ অমানুষিক ক্ষমতা জন্মে, এবং তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ক শিক্ষা দিতে সম্মত আছেন কি না? তাঁহারও একটা মনের কথা জানিবার ইচ্ছা ছিল, ঐ প্রকার কোন কার্য্যের দ্বারা তাহা জানিবার উপায় আছে কি না?

ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে একখানি শ্লেট ও একটি পেন্‌সিল দিয়া বলিলেন, "শ্লেটের উপর পেন্‌সিলটি এরূপ সহজে ধরিয়া রাখুন যে, কোনরূপে চালিত হইলে, তাহার ব্যাঘাত উৎপন্ন না হয়।"

চিন্তামণি। "আর কাহারও ধরিলে ভাল হয়, কারণ আমার নিজের প্রশ্ন, নিজের মনের মত উত্তর বাহির হওয়া অসম্ভব নহে।"

তখন অপর এক ব্যক্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথানুযায়ী পেন্‌সিল ধরিলে, তিনি তাঁহার হস্তের উপর জপ আরম্ভ করিলেন; ক্রমে হস্ত স্বতঃ পরিচালিত হইয়া চিন্তামণির মানসিক প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমি বহুদিন বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছি, আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের বিদ্যা আপনার নিকট পরাজিত।"

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার নিকট ঐ সকল গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা লাভের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় চিন্তামণির পরিচয় লইয়া যখন তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জানিলেন, তখন বলিলেন—"মহাশয়! আমরা সমাজের মধ্যে থাকিয়া স্বীয় সমাজবহির্ভূত ব্যক্তিকে এই সকল গূঢ় বিষয়ের উপদেশ দিতে অক্ষম। আপনার যেরূপ আগ্রহ দেখিতেছি, উহা যদি আন্তরিক ও স্থায়ী হয় তবে আপনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও সংযম শিক্ষা দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করতঃ উত্তরাখণ্ডে গমন করিলে, তথায় মহাত্মাগণের নিকট ইহা অপেক্ষাও উত্তম উত্তম উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

চিন্তা। "তাঁহারাও আপনার ন্যায় খৃষ্টানকে শিক্ষা দিতে অসম্মত হইবেন না তো?"

ব্রহ্মা। "তাঁহারা সমাজের মুখাপেক্ষা রাখেন না—করাও তাঁহাদের আবশ্যক নাই।"

এইরূপ বিবিধ আলাপের পর ভবদেব ও চিন্তামণি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে চিন্তামণির আত্মাবসাদ উপস্থিত হওয়ায় বলিলেন—"দেখুন মহাশয়! আমার ন্যায় হতভাগা জীব এ জগতে আছে কি না, বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আচারভ্রষ্ট হওয়ায়, সনাতন ধর্ম্মে অধিকার না থাকায়, সংস্কারহীন ব্রাত্য হইয়াই থাকিতে হইল—ব্রতস্নাতক আর হইতে পারিলাম না। বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইব সে আশাও নির্ম্মূল। মনকে সুস্থির করিব এরূপ কোন অবলম্বন নাই। বিধাতঃ! এইরূপেই কি জীবন কাটাইতে হইবে?"

ভব। "কেন? আপনি বিবাহ করিলেই তো পারেন।"

চিন্তামণি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"দেখুন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমি খৃষ্টান, কিন্তু আপনার সহিত আমার যেরূপ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে,

সেরূপ সচরাচর জন্মে না। আমি বাস্তবিকই আপনাকে ভাই বলিয়া মনে করি;-আমার প্রতি আপনার ব্যবহারও তদ্রূপ। আপনার নিকট কিছু গোপন করি নাই, এ বিষয়েও গোপন করিব না। নদীয়া জেলার উত্তরাংশে——গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমাদিগের প্রতিবাসিনী একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা অনেক সময়ে আমার সহোদরার সহিত খেলা করিতে আসিত। কখন কখনও বা আমাদের বাড়ীতে আমাদের সহিত আহার করিত। একদিন সেই পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা আমার নিকট বসিয়া আহার করিতেছে; আমি তাহাকে মৎস্য খাইতে বলিলাম —সে উত্তর করিল "আমি মাছ খাইব না—মাছের মা কাঁদিবে। বস্তুতঃ বালিকার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব না থাকিলেও তাহার আন্তরিক সরলতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা গুণে ও তাহার মধুর বাক্যে বশীভূত না হইত এমন লোকই ছিল না। এই কথা শুনিয়া অবধি তাহার উপর আমার বড়ই ভালবাসা জন্মিয়া গেল। বালিকাও যেন আমার নিকট ভিন্ন অন্যত্র থাকিতে চাহিত না। সে আমার ভগ্নির সহিত আমার পিতৃব্যের নিকট পড়িত; কিন্তু আমাকে একবার পড়া না শুনাইলে তাহার মনঃপুত হইত না। ইহার কিছুদিন পরে পিতা যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও বালিকা প্রায় সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকিত। ক্রমে বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে একজন জমিদার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "মনোরমা, তোমার নাকি বিবাহ?" এই কথা শুনিয়া বালিকা মুখ ফিরাইল—ভাবিলাম লজ্জায়—পরে দেখি তাহা নহে,—মনোরমা কাঁদিতেছে—বোধ হইল আমার কথায় তাহার হৃদয়-নিহিত কোন দুঃখ উচ্ছলিত হইয়া অশ্রুবেশে নয়ন দিয়া বিগলিত হইতেছে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, সেও প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না, অধিকন্তু বৃদ্ধিই হইতে লাগিল; আমিও আর থাকিতে পারিলাম না, আমার চক্ষেও জল আসিল; আমি সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম। অধ্যয়নের ছলনা করিয়া কলিকাতা আসিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম অন্ততঃ দশ বৎসর মধ্যে আর গ্রামে যাইব না। এক্ষণে শুনিতেছি, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে একজন চরিত্রহীন যুবক। অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সে রাজোপাধি লাভ করিয়াছে। প্রণয়ব্রত উদ্‌যাপন হইয়াছে। বিবাহ আর করিব না। কিন্তু মনোরমা রাজরাণী হইয়া সুখী কি না জানিতে ইচ্ছা হয়। পিতার

মৃত্যুর পর পুনরায় হিন্দুসমাজে প্রবেশের চেষ্টা করিলাম। বিফল মনোরথ হইয়া রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি।

ভব। "আপনি বিবাহ করিবেন না স্থির?"

চিন্তা। "সেটা স্থিরই।"

ভব। "তবে ব্রহ্মচারী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা করাই আপনার কর্ত্তব্য?"

চিন্তা। "সে বিষয় এখনও স্থির হয় নাই—শীঘ্রই একটা মীমাংসা করিব। সম্ভবতঃ ঐ পন্থাই অবলম্বন করিব। নমস্কার, এক্ষণে চলিলাম। যাহা স্থির হয় পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'অনন্তরত্নপ্রসূ দেবতাত্মা' হিমাচলের নিম্নতর প্রদেশে দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিবের নামানুসারে দার্জ্জিলিং নগরের নামকরণ হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে নিকটে দূরে সুন্দর সুন্দর উপত্যকা ঘনবনাবৃত ভূখণ্ডদেশে পরিবেষ্টিত। পশ্চিম দিকে কর্পূর-কুন্দধবলেন্দুজটাধারীনিভ চিরতুষারাবৃত ধবলগিরি, যেন এককালে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ ও পরিমাণার্থ গম্ভীরভাবে মস্তকোত্তোলন ও পূর্ব্ব পশ্চিমে হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে দৃশ্যের চমৎকারিত্ব, মনোহারিত্ব, গাম্ভীর্য্য বর্ণনে কবিকল্পনাও পরাজিত হয়। এ দৃশ্য দেখিলে কাহার না হৃদয় মহিয়ান অনন্তের দিকে ছুটে!

এই সকল শৈলশ্রেণীর একদেশে অপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদপ্রদ দার্জ্জিলিং সংস্থাপিত। দূর হইতে ঠিক যেন একটি কুসুম স্তবকের ন্যায় দেখায়। সরল সবলকায় তিব্বৎ, নেপাল, ভুটান, শিকিম গিরিবাসীগণ, চর্ম্ম, কস্তুরিকাদিবিশিষ্ট বড় বড় বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া এই ক্ষুদ্র নগরীর পন্থাবলিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে বা য়ুরোপীয়গণ ও য়ুরোপীয়-বেশধারী বাঙ্গালী বাবু দলে দলে অশ্বপৃষ্ঠে বা পাদচারে ভ্রমণ করিতেছে। পথের ধারে পরিচ্ছন্ন বিপন বীথিকা এক প্রকার কাষ্ঠমণ্ডপে স্থাপিত হইয়াছে। অপর দিকে য়ুরোপীয়দিগের বাংলা এবং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ-ভীত বিলাসী রাজা ও ভূম্যধিকারীগণের ও স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু পীড়িতদিগের স্বাস্থ্যনিবাস। ইহার একদেশে ভিক্টোরিয়া প্রপাতের রজতছটা মাধুর্য্যের অবশিষ্ট অভাব দূর করিয়াছে।

ঐ সকল গৃহের অন্যতমের মধ্যে এণ্ড্রিয় নামক জনৈক রোমান কাথলিক যাজক বাস করেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সদ্ব্যবহার, সদাশয়তা, ঔদার্য্য ও দয়াগুণে পাহাড়বাসী জন সাধারণ একান্ত বশীভূত। তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত চিন্তামণি রায়। কলিকাতা পরিত্যাগের পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে,—তিনি এক্ষণে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা ও গুপ্তবিদ্যা লাভেচ্ছা তাঁহাকে চিন্তাশীল দার্শনিকগণের সহিত সংমিলিত করিয়া তাঁহার প্রকৃতিগত সাধুভাব সমধিক উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। এখানকার জলবায়ু শারীরিক পরিশ্রমের সম্যক উপযোগী নহে। শরীর শ্রমবিরত হইলেও মস্তিষ্ক নিরস্ত থাকে না; প্রকৃত হিন্দু চিরকালই চিন্তাশীল, এক ভগবদ্ চিন্তা ধ্যান ধারণানুরক্ত। আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন ও জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করাই তাঁহার অবলম্বনীয় বিষয়। সুতরাং "মনুষ্য কোথা হইতে কিজন্য আসিল এবং কোথায় গমন করিবে" এতদ্বিষয়ক মীমাংসাই তাঁহার অনুশীলনের সামগ্রী হইয়া পড়ে।

হিন্দুশাস্ত্র সমূহ খৃষ্টাব্দের বহু বহুকাল পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র অতীব গূঢ় এবং গভীর রহস্য পরিপূর্ণ। হিন্দু, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করাই, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির প্রধান ও একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইন্দ্রিয়গণ একবার সংযত হইলে, জীব বিশিষ্ট শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে। শাস্ত্রমতে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্থূলদেহ অনিত্য, উহা মানুষের বাসাবাড়ী, পথ পার্শ্ববর্ত্তী পান্থনিবাস, তন্মধ্যে দেহী নামাভিহিত নিত্য সত্য পদার্থ অল্প দিনের জন্য অবস্থান করিয়া, নিত্য জীবনে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত মানব-জীবনের অবশ্যম্ভাবী অভিজ্ঞতা লাভ করে। দেহী বা আত্মাই যথার্থ মনুষ্য—নিত্য পদার্থ। সূক্ষ্মদেহ আত্মার বাহ্যেন্দ্রিয়াতীত অনতি দার্ঘকাল স্থায়ী আর একটি আবরণ মাত্র; অন্যান্য জাতির পক্ষে এ সকল অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা নহে। তাঁহার সমক্ষে ভূ, ভুব ও র্লোকও বর্ত্তমান। কারণ তিনি স্থূল জগতে অবস্থানকালেও সূক্ষ্মজগতে কার্য্যক্ষম এবং তিনি সময়কে অখণ্ড পদার্থ জ্ঞান করেন, তাহাতে ব্যক্তাব্যক্ত সমুদয় পদার্থ সম্বলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, আমাদিগের আবাসভূমি এই দৃশ্যমান্ জগৎ তাহার একদেশ মাত্র। হিন্দুর মতে জীবনান্তকালের ন্যায় জীবিতাবস্থাতেও

অব্যক্তের উপভোগ করা যাইতে পারে। যাহাকে মৃত্যু বলা যায় তাহা আত্মা ও দেহের—নিত্যানিত্যের বিচ্ছেদ মাত্র। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন, জগতের মমতা, ইন্দ্রিয় সুখ, যশ ও পদমর্য্যাদা লাভের বাসনা হইতে আত্মাকে মুক্ত কর—এক কথায় জড় জগৎ হইতে আত্মাকে এইরূপ উন্নত অবস্থায় লইয়া যাও যে, দেহ ধারণ কালেও জগতের কোন বস্তুতে মন আকৃষ্ট না হয়, দেখিবে আত্মা বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেছে। তখন দেখিবে সেই সংযতাত্মা যদৃচ্ছা-ক্রমে নিমেষমধ্যে যেখানে সেখানে স্থূলদেহেও দেখা দিতে সক্ষম। তখন তিনি মনুষ্যের চিন্তা ভেদ ও লোকের মনে সুচিন্তার উদ্রেক এবং উচ্চ কল্পনার বিকাশ সাধন করিতে পারেন। কোন স্থূলবস্তু ব্যবধান না থাকিলে যেমন অন্য স্থূলপদার্থ গমনাগমন করিতে পারে, সেইরূপ স্থূলবস্তুর মধ্য দিয়া সূক্ষ্মদেহও অনায়াসে গতায়াত করিতে পারে। স্থূলপদার্থ তাহার গতিরোধে সমর্থ হয় না, অধিকন্তু তাহাদিগকে আয়ত্ব করিয়া তদ্দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত কার্য্য করিতে থাকেন। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, এ সকল অপ্রাকৃত কার্য্য নহে; শাস্ত্রশাসন পরিপুষ্ট সংযতাত্মা, প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পর্য্যালোচনায় তদ্বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, তাহাকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে সক্ষম।

যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ অথবা বৌদ্ধ তিনি জীবনের প্রতিদিন নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন—অন্যে নহে। তাঁহারা বলেন এবং সম্যক্ বিচার করিয়া দেখিলে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, বাসনার অপরিতৃপ্তি, ইচ্ছার বৈপরীত্য ঘটনা ও উদ্দেশ্যের বিফলতাই যাবতীয় ক্লেশের মূল। সুতরাং দুঃখের অবসান সাধন করিয়া শান্তিলাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বকথিতরূপ সন্ন্যাসের প্রয়োজন। বাসনা পরিহারকর হৃদয়ে সাংসারিক উচ্চাভিলাষ পরিপোষণ ত্যাগ কর, চিত্ত নির্ম্মল কর, দেখিবে তোমার দুঃখের অবসান হইয়াছে। ও সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, এবং ইন্দ্রিয়ের সহিতই পর্য্যবসিত হয়। "আপনাকে সুখী করিতে চাহ তো যাহাতে আত্মার উপকার —আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, সেই কার্য্য কর; একমাত্র সেই কার্য্যই প্রবঞ্চনা-বিরহিত এবং কেবল তাহাতেই নিত্যসুখ সম্ভব। যাহা অনন্ত—নিত্য তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর; সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে জীবন মন সমর্পণ কর।

চিন্তামণি যাজক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নামান্তর প্রাপ্ত হইলেও, আমরা তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব নামেই অভিহিত করিব। তিনি দশ বৎসরাধিক কাল পার্ব্বতীয়

প্রদেশে বাস করিয়া হিন্দু-দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নিবিষ্টমনা হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মেই যথার্থ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দেয়, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীগণ সর্ব্বদাই পরস্পরের উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যাজকগণ নগ্নপদে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পরিহিত চীরবসন ব্যতীত আর কিছুই নাই, তিনি এ সমুদয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, ইঁহাদিগের কার্য্য উপদেশানুবর্ত্তী, বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত। অত্যুদার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া আপন প্রকৃতির ঔৎকর্ষ সাধন ও বিনীত শিষ্যত্ব লাভ করাই তাঁহাদিগের জীবনব্যাপী যত্ন ও প্রয়াস।

হিন্দু জন্মান্তর স্বীকার করেন এবং প্রত্যেক পরমাণুতে পর্য্যন্ত চৈতন্যের স্বরূপ ও তাহার ক্রমবিকাশ নিয়ম বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে কতকগুলি ভৌতিক পরমাণু ইতর জাগতিক অবস্থা অর্থাৎ আকরিক, উদ্ভিজ্য এবং জৈবিক অবস্থাক্রমে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে মানবরূপে পরিণত হয় এবং তদবস্থায় পুনঃ পুনঃ জগতের নিকট যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। যাবৎ আত্মবিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত না হয়েন, এই পৃথিবীতে থাকিয়া যতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, যতদিন ততদূর অগ্রসর হইতে না পারেন, যাবৎ পার্থিব সম্বন্ধ পরিহারের উপযোগী না হয়েন তাবৎ তাঁহাকে বারম্বার জন্মগ্রহণ দ্বারা গর্ভযন্ত্রণারূপ ভীষণ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে হয়। হিন্দু পদতলস্থ ধূলিকণায় জীবসঞ্চার স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি আমাদিগের এই পার্থিব দেহকেই জীবানুসমষ্টি বলিয়া থাকেন—ক্রম-বিকাশ-শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া সেই সকল পরমাণু সদৃশ জীবমণ্ডলী—সেই সকল পরমাণুই পরব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করে। ইহাকেই তিনি মুক্তি বলেন। এই মুক্তি ব্যক্তিগত হইতে হইতে জগৎব্যাপী হইয়া যায়। যথার্থ মুক্তিই সেই। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, যে অখণ্ড মণ্ডলাকার হইতে প্রসূত, সেই অখণ্ড মণ্ডলাকারে লীন—তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত—হইয়া যায়; অধিক কি যে মায়াবলম্বনে এই জগৎ সৃষ্ট, যে মায়াবশে জগতে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান, যে মায়া আবদ্ধ জীবের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে দেয় না, সেই মায়াও যখন তদ্বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভাবে বিদ্যমান থাকে না—এক কথায় যখন সকল সত্বাই ব্রহ্ম সত্বায় মিশিয়া যায় তখনই যথার্থ মুক্তি হয়।

উক্ত জন্মান্তরবাদ ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি কোন কোন সম্প্রদায়ের রুচিবিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ উহার যাথার্থ এরূপ পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তদপেক্ষা সুমীমাংসা কুত্রাপি সম্ভবে না।

হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রত্যেক লোককেই মুক্তি পথের অল্পাধিক অগ্রসর পথিক বলিয়া মনে করেন। কাহাকেও অন্যায় কার্য্য করিতে শুনিলে, তিনি সেই দুষ্কর্ম্মান্বিত ভ্রাতাকে ক্রমবিকাশের নিম্নতলস্থ বলিয়া মনে করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন কৃপাপরবশ হয়। সুতরাং দুর্নাম, গ্লানি বা অপযশের কথা অথবা বিতৃষ্ণা বা ক্রোধ তাঁহার মনে উদয় না হইয়া, সেই অজ্ঞান নিঃসহায় ব্যক্তিকে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করার মহতী ইচ্ছা মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠে। চিন্তামণি এই সকল নীতি কথা পাঠে বা তাহার মাহাত্ম্য অনুভবে কখনই ক্লান্ত হইতেন না। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে সকল সম্প্রদায় মধ্যে বিচরণ করিতেন, তাহাদের শিক্ষা অন্যরূপ—তাহাতে কুৎসা, গ্লানি, অসূয়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার অনুদারতার প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।

নিত্যবস্তুকে অবিচলিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের নিদান, দয়ার সাগর, ন্যায়ের পরিণাম সেই বিশ্ব-বিধাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হইতে উৎপন্ন আত্মার শান্তি—গভীর নিরবচ্ছিন্ন শান্তিই ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য। আরাধনা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা ও ধর্ম্মজীবন দ্বারা তাঁহারাই কেবল শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। অপরের সে শান্তি কোথায়?

কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ক্রোধাদি একটি মাত্র রিপুও পোষিত হইলে, তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মে, ভগবানের সহিত সম্বন্ধ দূর হইয়া পড়ে, উন্নতির পথ দীর্ঘ করিয়া দেয়। হিন্দুর মতে ইহজগতে মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ আর নাই।

চিন্তামণি বাল্যকালে যে সকল ভেল্কি দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে শৈলবাসে প্রায় প্রত্যহই তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। বাজিকরেরা বলে যে, প্রকৃতির গূঢ় নিয়ম অবগত হইতে পারিলে, তৎসমুদয় আয়ত্ত করা যায়। তিনি ভাবিলেন "এই কি সত্য কথা?—না, কুহকিগণ চাতুরী প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য এই কথা বলিয়া থাকে?" ফলতঃ

কোনরূপ সুমামাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া তিনি মনে করিলেন যে, বিজ্ঞান-পরিমার্জ্জিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ সম্ভব; সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা কুহকের অন্তস্তল দর্শনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদা একজন সামান্য বাজিকরকে ডাকিয়া চিন্তামণি, তাহাকে তাঁহার বাংলার বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত হাতায় বাজি করিতে কহিলেন। বাজিকর মন্ত্র পড়িতে পড়িতে রজ্জু দ্বারা তাহার সমভিব্যাহারী একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর হস্তপদ বাঁধিতে লাগিল। মাংসাস্থি বিশিষ্ট জীবিত বালক কিনা দেখিবার জন্য চিন্তামণি পাদ্রী তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে তাহাদের নিকটস্থ হইলে, বালক বিসদৃশ উচ্চহাস্য করিয়া তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিয়া দিল। বাজিকর পূর্ব্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রজ্জুবদ্ধ বালককে এক বেত্র-পেটিকায় রুদ্ধ করিয়া পেটিকাটিও রজ্জুদ্বারা উত্তমরূপ বন্ধন করিল। পেটিকার উপর লক্ষ্য রাখিয়া সে কয়েকপদ পশ্চাদ্ববর্ত্তী হইয়া যেস্থলে একখানি তীক্ষ্ণধার করবাল পতিত ছিল, সেই স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল। প্রায় দশ মিনিট কাল তদবস্থায় সম্পূর্ণ আবিষ্ট মনে পেটিকাটি দেখিতে লাগিল। পরে সহসা দৃঢ়মুষ্টিতে করবাল গ্রহণান্তর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পেটিকা সন্নিহিত হইয়া করবাল দ্বারা উহা এরূপে বিদ্ধ করিল যে তাহার অগ্রভাগ অপর পার্শ্ব ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই সে পাদ্রি সাহেবের দিকে চাহিয়া, তাঁহার মুখমণ্ডল ভীতিপূর্ণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। বাজীকর তখন বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পেটিকার আবরণ উন্মুক্ত করিল—তখনও করবাল বিদ্ধ রহিয়াছে—কিন্তু বালক কোথায়!—

পাদ্রি চিন্তামণি এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, সেই বালক সন্নিহিত রাজপথে আনন্দধ্বনি করিতেছিল, তাহা তিনি শুনিতেই পাইলেন না। ক্ষণমধ্যেই সে লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তিনি তাহাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিলেন। বাজীকর পাদরী সাহেবের নিকট একটি টাকা পুরস্কার লইয়া ঈষৎহাস্য সহকারে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

২য় ভাগ। } আষাঢ়, ১৩০৫। { ৩য় সংখ্যা।

কোথা পন্থা?

(১)

"কোথা পন্থা—কোথা পন্থা" সুউচ্চে চীৎকারি,
ছুটিতেছি জন্মকাল, টানে পিছে মোহজাল,
আঁধারে আঁধার হেরি উঠি হাহাকারি!
যেন মরু-মরীচিকা— ধূ - ধূ - ধূ সুধু বালুকা,
সম্মুখে সংসার - ক্ষেত্র অনল উগারি,
না দেয় দেখিতে 'পন্থা' ধূমেতে আঁধারি —

(২)

ধূমেতে আঁধারি নেত্রে ধরে ইন্দ্রজাল,—
কামিনী - কাঞ্চন - বিভা, ধাঁধায় ভুলায় কিবা!
সম্পদ - মরীচি - মায়া উচ্চাশা উত্তাল,
সংসার - মরুতে কেলি, হাসি অট্ট করে কেলি!

রমণী - রূপাগ্নি - শিখা জ্বলন্ত করাল,
পুড়ায় পতঙ্গ - প্রাণে—নাহি কালাকাল!

(৩)

নাহি কালাকাল ছয় দৈত্য সুভীষণ,
ধরি মায়া নানা ছলে, পশিয়ে হৃদয় - তলে,
তামসী নরক - পুরী করয়ে সৃজন;
মায়ায় মহত্ত্ব হরি, প্রেতে পরিণত করি,
দেয় ছাড়ি ঘোরাধারে হইতে মগন,—
দিয়া গলে মালা - ছলে কাল - ভুজঙ্গম।

(৪)

কাল - ভুজঙ্গমে ভ্রমে করি আলিঙ্গন—
চুম্বনে গরল ছুটে, দশনে মরম টুটে,
কালকূটে জরি করি চিৎকার ভীষণ;
জ্বালায় আঘাতি বুকে, কোথা 'পন্থা' বলি মুখে,
বিকৃত সকলি দেখি আপনি যেমন;
অমৃতে গরল ভাবি শিহরি তখন!

(৫)

শিহরি তখন হেরি অতৃপ্ত কামনা,
কামানলে করি রঙ্গ, করেছে বিকৃত অঙ্গ,
ক্ষত দেহে সুধু জ্বালা বিষম যাতনা!
আপনি আপনা হেরি, ভয়ে কাঁপি থর-থরি;
কোন পথে হবে তৃপ্ত অতৃপ্ত বাসনা—
ছুটি ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মনা।

(৬)

উদ্‌ভ্রান্ত উন্মনা ঘোর অন্ধ দিশাহারা,—
সংসারের নানা ছলে, নানা-বেশে ভ্রম-জালে,
ভ্রমি পথ তমোময়—হই পথহারা;
এ পথে মিটে না আশা, বাড়ায় বাসনা - তৃষা,

করি কর্ম্মভোগ সুধু কাঁদি জন্ম সারা,—
চীৎকারি 'কোথায় পন্থা জীব-তৃষা-হরা'?

(৭)

'জীব-তৃষা-হরা-পন্থা মিলিবে কোথায়?
কিসে যাবে মোহ-ছলা, ঘুচিবে এ জন্ম-জ্বালা?'—
ভাবিয়ে আকুল প্রাণে হারানু সজ্ঞায়;
জন্ম - জন্মান্তর - গত, সংস্কার - প্রভাব মত,
স্বতঃ স্বপ্নে পথ-স্মৃতি হইল উদয়—
হৃদাকাশ করি দীপ্ত অপূর্ব্ব - বিভায়!

(৮)

অপূর্ব্ব বিভায় হেরি বিশ্ব করে ধ্যান;
স্তম্ভিত অনন্ত ব্যোম, স্তব্ধ কোটি রবি-সোম,
স্তম্ভিত অসংখ্য সৌর - জগৎ মহান্!
সহসা মহা নির্ঘোষে, চকিত করিয়া বিশ্বে,
অনন্ত অম্বর ভেদি উঠে মহাতান,—
'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' মহান্!!

(৯)

'স পন্থা' মহান্ গীত ধ্বনিল যেমন,—
দিগাকাশ দীপ্ত করি, কিরণ - কিরীট পরি,'
সৌম - মূর্ত্তি ধর্ম্মবীর যত মহাজন,
প্রকাশি অনন্তাকাশে, অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বেশে,
জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্ম-দণ্ড উজলি ভুবন,
নিজ নিজ দীপ্ত 'পন্থা' দেখান তখন।

(১০)

দেখান তখন কেহ প্রসন্ন বদনে,
সকাম - সাধন - মার্গ— যাহে জীব ভুঞ্জে স্বর্গ;
কেহ মহা জ্ঞান - মার্গ দেখান যতনে;
হাসিয়া কেহ দেখান, ভক্তি-মার্গে শান্তি-ধাম;

দেখান কেহ বা মহা ঐশ্বর্য্যের সনে,
মহান্ নিবৃত্তি - মার্গ প্রবৃত্তি - দমনে।

(১১)

প্রবৃত্তি - দমনে পন্থা নিষ্কাম - সাধনা ;—
এই পথে ভগবান্, শুনালেন 'গীতা' গান,
করিতে মানবে এক বিসর্জ্জি বাসনা।
যত সব মহাজন, আসিয়া পথে আপনা,
পশি যোগে এই পথে হারায়ে আপনা,
দেখাইয়া দেন 'পন্থা'—ব্রহ্ম - আরাধনা।

(১২)

ব্রহ্ম - আরাধনা ভাবি ভাঙ্গিল স্বপন!
ভাবিলাম অহঙ্কারে মরি ঘুরে তম - ঘোরে,
আঁধারে আঁধার হেরি অন্ধ এ নয়ন!
মহাজন - প্রবর্ত্তিত, মহা - পন্থা আলোকিত,
কে ধরে সম্মুখে—যাক্ অবিদ্যা - ছলন ;
"কোথা পন্থা" চিৎকারিয়া গেল এ জীবন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" গীতা।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের চরম শিক্ষা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য ইহসংসারে কল্যাণকর এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়স্কর এই পরম পবিত্র জ্ঞান যাহাতে লাভ করিতে পারে আর্য্য মহর্ষিগণ তজ্জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন, সদাচার এবং সাধনা দ্বারা হিন্দুর হৃদয়

যখন এই বিরাটভাবে পরিপূর্ণ হয়; যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহা সত্য হিন্দু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ উপলব্ধি করিতে থাকে তখন আর তাঁহার নিকট ভেদবুদ্ধি তিষ্ঠিতে পারে না। হিন্দুর অন্তঃকরণ যখন এই মধুর ভাবে পূর্ণ হয় তখন ভেদজ্ঞান সূর্য্যকিরণদর্শনোন্মুখ উলূকের ন্যায় উদ্ধশ্বাসে পলাইবার পথ পায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই এই কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে না বিশ্বাস করিলে মানবের পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। খৃষ্টানের বিশ্বাস যে যিশুখৃষ্টে বিশ্বাস না করিলে নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। মুসলমানের এই বিশ্বাস যে মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইলে নিশ্চয়ই মনুষ্যকে জাহান্নমে পচিয়া মরিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরও এই মত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মত এই সকল মতাপেক্ষা প্রশস্ততর ভিত্তির উপর স্থাপিত। এ সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বাপেক্ষা উদার। হিন্দুর শিক্ষা এবং বিশ্বাস এই যে যাঁহার যে ধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সেই ধর্ম্মই শ্রেয়স্কর। যিনি যে ভাবে যে কোন উপায়ে এবং যে কোনও নামেই ঈশ্বরের উপাসনা করুন না কেন, পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট সকলই সমান। তাই গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ।"

অর্থাৎ মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের পথেরই অনুসরণ করে।

এই মহান্ আদর্শ হিন্দুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান থাকায় তাঁহার মনে ধর্ম্মদ্বেষের উদয় হয় না। তাই হিন্দু, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেও ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে কিছু-কুণ্ঠিত হয়েন না। তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বী হও, যে জাতি হও এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানই তোমার জন্মভূমি হউক না কেন, হিন্দু তোমাকে ভাই বলিয়া ক্রোড়ে স্থান দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। কারণ হিন্দুর শিক্ষা, দীক্ষা এবং ধর্ম্মচর্য্যার চরমফল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য কথা বাদ দিয়া কেবলমাত্র এই ভ্রাতৃভাবের কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা এই যে, একত্র ভোজন পানাদি না করিলে মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাঁহাদের এই ধারণা কতদূর সমীচীন তাহা একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব ভোজন পানাদি শারীরিক কার্য্যাবলীতে নিবদ্ধ নহে।

যাঁহারা ইহকালসর্ব্বস্ব ভোজনপানাদিকেই জীবনের সার সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ঐরূপ কথা বলিতে সাহস করেন।

মানুষ যে দেহ নহে, আত্মা; মানুষ দেহনিবদ্ধ চৈতন্য এ কথা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহার নিকট পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। তিনি বুঝিবেন যে আহার আচার প্রভৃতি বিষয়ে অযুত ভেদ থাকিলে মনুষ্যজাতি-নিচয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যকে একান্নভুক্ত হিন্দু-পরিবারের ন্যায় এক পরিবারভুক্ত মনে করিবেন। হিন্দু যেরূপ আহার করিবে এবং যে প্রণালীতে ঈশ্বরোপাসনা করিবে, মুসলমান এবং খৃষ্টান ঠিক সেইরূপ আহার এবং ঠিক সেই প্রণালীতে ঈশ্বরোপাসনা না করিতে পারেন; কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে একের বিপদে অন্যের বিপদজ্ঞান এবং একের সুখে অন্যের আনন্দ কেন হইবে না বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের এই কথাটি কাহারও কাহারও নিকট সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা নূতন কথা নয়; এই পুরাতন তথ্য হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্ম্মের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় অণুপ্রবিষ্ট। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে কি যাহার যা ইচ্ছা তিনি তাহাই ভক্ষণ করিবেন—খাদ্যাখাদ্যের কিছুই বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা নাই? খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, এবং যেরূপ খাদ্য সকল দিকে সকল প্রকারে মনুষ্যের উপযুক্ত সেইরূপ খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধে তাহার তত্ত্বের কোনই আলোচনা করিব না।

আমাদের পরমারাধ্য পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ চরিত্র-বলে বলীয়ান হইয়া এবং যেরূপ সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়া পৃথিবীর জাতিসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণের সেরূপ চরিত্র-বল এবং সেরূপ সদ্‌গুণাবলী নাই। যে সকল গুণ থাকিলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, আমাদের সেই সকল গুণ একরূপ নাই বলিলেই হয়। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত আমাদের সেই সকল গুণাবলী প্রত্যাবৃত্ত হইবে। হিন্দুধর্ম্ম নবজীবন লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উৎপত্তি করিবে এবং উহা আমাদের জাতীয় জীবন সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণে সমর্থ হইবে। ইহারই বলে হিন্দু চরিত্র-বল, উৎসাহ, পরস্পর সাহায্য-

দানপটুতা, আত্মনির্ভর, সত্যবাদিতা, স্বাধীনতা, সৎসাহস এবং নির্ম্মল চরিত্র লাভ করিবে। ইহারই বলে হিন্দু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-বুদ্ধির অতীত, জড়জগতের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞাত অধ্যাত্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া নিজ জীবনকে মনুষ্যের অধিকতর হিতকারী করিয়া তুলিবে; এবং এই দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ পৃথিবীতে যতটুকু সুখভোগ সম্ভব, তাহা সকলের সমীপস্থ করিতে সমর্থ হইবে। ইদানিন্তন ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে এই মহদুদ্দেশ্য সাধন অপেক্ষা আর কি উচ্চতর কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? আমাদের দেশ-হিতৈষী এবং সংস্কারকর্ম্মণ্য মহাত্মারা ভ্রমান্ধ হইয়া কত অসার বিষয়েরই আলোচনায় কালাতিপাত করিতেছেন। রোগের মূল কোথায় তাহা তাঁহারা দেখেন না। যে রোগে আমাদের জাতীয় জীবন অন্তঃ-সারশূন্য করিয়া আমাদিগকে অধঃপতিত করিতেছে তাহা সমূলে উৎপাটিত না করিলে আর আমাদের রক্ষা নাই। ভারতবর্ষ বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন মতিগতি সহানুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন গঠন জন্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না। ভারতবর্ষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব বিলক্ষণ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র য়ুরোপিয়ান এবং ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেই যে বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হয় তাহা নহে। হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে সম্প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্বদেশ-হিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মর্ম্মাহত হইতে হয়। ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রকৃত অন্তরের টান নাই। কেন এমন হইল? এই মহাশঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার কি কোনও উপায় নাই। প্রত্যেক ভারতবাসী বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-ভাব প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে কি এই মহদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, যদি তাঁহাদের পদাঙ্কঅনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে একটি ব্রত অতি যত্নসহকারে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই ব্রতের নাম "পরহিত ব্রত"। মনুষ্যের এই মহাব্রত পালনে ইচ্ছা না থাকিলে তাহাকে সামান্য ইতর পশু অপেক্ষা কোনওক্রমেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে আমাদের মনোমধ্যে কত শত বিভিন্ন প্রকার সুখভোগ করিবারই ইচ্ছা বলবতী হয়, কিন্তু মনুষ্যের হিতকল্পে কার্য্য

করিলে যে তীব্র সুখোৎপত্তি হয়, সে সুখের অন্বেষণে কাহাকেও যত্নপর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরহিতব্রতই প্রাচীন আর্য্যদিগের জীবনের সার অবলম্বন ছিল এবং এক্ষণেও উহা পরমভাগবত মহাত্মাদিগের জীবনের সার সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ মহাত্মাদিগের প্রদর্শিত পন্থাবলম্বন করা সকলকার পক্ষেই গৌরবের বিষয়। এই পরহিতরূপ মহান্‌ব্রতে মনোনিবেশ করিলে, মনুষ্য সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা উচ্চতর পথের পথিক হয় এবং এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে পারিলেই মনুষ্যজীবন লাভের সার্থকতা সম্পাদন করা যায় এবং ইহার দ্বারাই মনুষ্য ঈশ্বর সাযুজ্য সামীপ্যরূপ মহামুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই মহান্ ব্রতে ব্রতী হইলেই আমাদের জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুত্থান হইবে এবং আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষোচিত সদ্‌গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হইয়া জগতের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইব।

জগতের যে দিকে নেত্রপাত কর দেখিতে পাইবে মায়ামোহান্ধ জীব কেবল মাত্র নিজের সুখের জন্যই লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। মনে করিতেছে নিজের পার্থিব উন্নতি ও সুখসম্ভোগই বুঝি পরম পুরুষার্থ! হায়! ভ্রান্ত মনুষ্য! জন্মান্তরীন সুকৃতি-বলে কিছুকালের জন্য এ বিষয়ে উন্নতি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। আজ আমরা পরার্থ ছাড়িয়া স্বার্থের দাস হইয়াছি বলিয়াই আমাদের মাতৃভূমির এই দুর্দ্দশা। আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের চিন্তাই আমাদের সারসামগ্রী আর কাহারও চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। কিন্তু আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের মতিগতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁহারা পরার্থকে জীবনের সার সামগ্রী মনে করিয়া স্বার্থপরতাকে তাহার নিকট বলীদিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং এই জন্যই তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত মনুষ্য সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। আমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়াই প্রকৃত পথ খুজিয়া পাইতেছি না। আমরা দুই চারিখানি ইংরাজি পুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটী পরীক্ষায় কোনও ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াই মনে করি আমরা জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। কিন্তু এই জ্ঞান যে প্রকৃত জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের এ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে চক্ষু ফুটিতেছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের

এই দেশেই আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত গ্রন্থাবলিতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা সেই সকলের চর্চ্চা করিলেই প্রকৃত পথ দেখিতে পাইব।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব বা একতা হইতেই পারে না। কিন্তু তাঁহাদের মত যে নিতান্ত ভিত্তিশূন্য তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরমহংস সাধু সন্ন্যাসীর ধর্ম্মবিশ্বাস একরূপ আর সাধারণ গৃহস্থের ধর্ম্মবিশ্বাস অন্যরূপ, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের মধ্যে দ্বেষভাবের উৎপত্তি হইবে? কি যুক্তি অনুসারে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা তাঁহারাই বলিতে পারেন। সকল ধর্ম্মই মনুষ্যকে পাপের পথ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় এবং সকল ধর্ম্মই মনুষ্যকে পরার্থপর এবং পবিত্র-স্বভাব হইতে শিক্ষা দেয়। পুণ্যপথাবলম্বী, পবিত্র-স্বভাব পরার্থপর ব্যক্তিগণের মধ্যে কেন যে ভ্রাতৃভাব ও একতা জন্মাইবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যের মধ্যে এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও তজ্জনিত একতার উৎপত্তি হয়, সে জন্য প্রত্যেক হিন্দুরই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের পরিপুষ্টি সাধন করা প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি ধর্ম্মে মনুষ্যকে এই সর্ব্বলোকহিতকর উচ্চ ভ্রাতৃভাব শিক্ষাই না দিল, তবে সে ধর্ম্মকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।

প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য যে, তিনি নিজ জীবনের কর্ম্মের দ্বারা সাধারণকে এই ভ্রাতৃভাব বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। কেবল মাত্র মুখের কথায় কিছুই হইবে না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হইবে যে তুমি জগতের সকল মনুষ্যকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছ। কথা আমরা অনেক দিন হইতে অনেক প্রকারেই শুনিয়া আসিতেছি। এক্ষণে চাই কার্য্য। আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। হিন্দু! আজ তোমার সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিরাজমান আজ তুমি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। প্রাণপণে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ কর। ইহাই তোমার চিরন্তন চরম শিক্ষা। জগতের সমস্ত প্রাণীকে আপনার মত ভাবিতে অভ্যাস কর। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। তোমার মনুষ্য জীবন সার্থক হইবে, ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে

নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানের যোগ্য হইবে। ইহাই তোমার শাস্ত্রের শিক্ষা। ঐ দেখ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ-এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুখঃ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যোমে ভক্ত সমে প্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ কাহারও প্রতি যাঁহার দ্বেষভাব নাই, সকলের প্রতিই যাঁহার মৈত্রভাব, সকলের প্রতিই করুণা, যিনি মমতা ও অহঙ্কার রহিত, যিনি ক্ষমাশীল, যাঁহার সুখদুঃখে সমভাব, যিনি সতত প্রসন্নচিত্ত, আত্মস্থ, সংযত স্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতে (অর্থাৎ ভগবানে) যাঁহার মন ও বুদ্ধি অর্পিত, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

প্রণবের নানারূপ।*

আমাকে কেহ প্রণব-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন কি? পড়িলাম বটে—"বিশ্বরূপ ঈশ্বরের হৃদয়ে অনাহত প্রণব-ধ্বনি অবিরাম হইতেছে।" কিন্তু সে ধ্বনি শ্রবণ করিবার যে অধিকার হয় নাই। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন।" সেই অনাহত প্রণব-ভেরী সদা বাজিতেছে বটে। কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাই কই?

শ্রীভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে তারকব্রহ্ম-যোগের কথা পড়িয়াছি। হৃদয়ে ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে মরিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ গতি হয়, তাহাও জানিয়াছি। সারা জীবন এই ঈশ্বর ধ্যানপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিতে পারিলে, তবে অন্তিমে যখন মন প্রাণ সকল ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে—তখন

* প্রণবের সম্বন্ধে অন্য কথা গীতার অষ্টমাধ্যায়ে ১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

চিরদিনের অভ্যাস-বশে ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণ বহির্গত হইতে পারিবে, তাহা পড়িয়াছি। কেবল প্রণব-জপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বর প্রণিধানরূপ যোগসিদ্ধি হয়, তাহাও পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে জানিয়াছি। কিন্তু আমি যোগবল কোথায় পাইব? প্রণব-তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব? যাহা হউক আমার যত টুকু সাধ্য তত টুকু চেষ্টা করিয়া প্রণবের অর্থ ভাবনা করিয়াছি। তাহাতে যেরূপ অর্থ যত টুকু বুঝিয়াছি—তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলিব। আশা—যাঁহারা প্রণব-তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমায় তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। আমি কৃতার্থ হইব।

প্রণব—প্রধানতঃ ওঁকার। ওঁ—এই শব্দ আলোচনা করিয়া, তাহাতে তিন শব্দ বা তিন সুর পাই—অ—উ—ম্। এই তিন সুর বা তিন মাত্রা স্পষ্ট। আর যখন এই ওঁ উচ্চারণ শেষ হইবার উপক্রম হয়—একরূপ চাপা অর্দ্ধ সুর পাই; তাহার ভাল উচ্চারণ হয় না। ইহা প্রণবের শেষ মাত্রা।

এখন আমাদের স্বাভাবিক বাক্-উচ্চারণ-বিষয় চিন্তা করিব। মুখ ব্যাদান করিয়া সহজভাবে যদি সুর বাহির করি—তবে প্রথম স্বর পাই—অ। উহা একটু জোরে উচ্চারণ করিলে পাই—আ। অতএব অ এবং আ—এক। মুখ ঠিক এই এক ভাবে ব্যাদান করিয়া, জিহ্বা একটু ঊর্দ্ধে তালুর দিকে লইয়া সুর সহজভাবে বাহির করিলে পাই—ই; ইহার দীর্ঘ উচ্চারণ—ঈ। তাহার পর মুখ সেই একভাবে রাখিয়া, জিহ্বা আর একটু নীচে নামাইয়া সুর বাহির করিলে পাই—এ (অ+ই)। অ উচ্চারণ পরে ঈ উচ্চারণ করিলে পাই—ঐ (অ+ঈ)। ঃ (বিসর্গ) স্বরের আশ্রয়-স্থানভাগী; তাহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই।

অতএব দেখিতে পাই যে, মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক যে স্বাভাবিক স্বর সহজে উচ্চারিত হয়—তাহাই অকার। আ, ই ঈ, এ, ঐ ইহারা—এই অকার হইতেই বা অকার বিকৃত হইয়া উচ্চারিত হয়।

যতটা মুখ ব্যাদান করিয়া সুর উচ্চারণ করিলে অ ধ্বনি বাহির হয়, তাহা অপেক্ষা মুখ আর একটু সঙ্কুচিত করিয়া সুর উচ্চারণ করিলে, আমরা পাই—উ; ইহারাই দীর্ঘ উচ্চারণ—ঊ।

ও ঔ (অ+উ), ঋ (র্+ই), ঌ (ল্+ই)—ইহারা মিশ্রস্বর। ইহা ব্যতীত স্বরের উচ্চারণের আর এক অবস্থা আছে। যেমন মুখ পূর্ণ ব্যাদান

করিয়া সহজ সুর উচ্চারণে পাওয়া যায়—অ ; যেমন মুখ অল্প ব্যাদান করিয়া সহজ সুর ধ্বনি করিলে পাওয়া যায়—উ ; তেমনি মুখ বন্ধ করিয়া সহজ সুর উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়—'ম্' বা 'ঁ'।

অতএব সহজ ভাবে, স্বাভাবিক ভাবে সুর উচ্চারণ করিবার তিনটী অবস্থা ; প্রথম মুখ পূর্ণরূপে ব্যাদান করিয়া—অ ; মুখ অর্দ্ধ ব্যাদান করিয়া—উ ; মুখ বন্ধ করিয়া—ম্ বা ঁ। তাহার পর সুর মিলাইয়া আইসে—অব্যক্ত হয়।

এক্ষণে সুরের উচ্চারণের বিষয় ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া—সাধারণ শব্দের বিষয় চিন্তা করা যাউক। শব্দ অসংখ্য—অনন্ত। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মূল শব্দ—আর কতকগুলি মিশ্র শব্দ। মূল শব্দগুলি—অক্ষর। অক্ষর দুইরূপ—স্বর ও ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন—স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারণ করা যায় না। অতএব সকল শব্দের আদি ও আধার—এই স্বর। সেই স্বরের মধ্যে প্রথম ও প্রধান—অ ; বলিয়াছি—আ, ই, ঈ, এ, ঐ এবং ঃ বিসর্গ এই অকারেরই রূপান্তর। স্বরের দ্বিতীয় হইতেছে—উ। আর স্বরের তৃতীয়—'ং' (অনুস্বর) বা 'ম্'। অতএব অনন্ত শব্দ রাশির মধ্যে—আমরা তিনটী মূল শব্দ পাই—অ, উ, ম্। যত প্রকার ধ্বনি আছে—সকলের মূল, সকলের আধার আশ্রয় এই—অ, উ, ম। যত অক্ষর আছে, তাহার মূল এই—অ, উ, ম।

মুখ ব্যাদান করিয়া সহজ ভাবে, অর্থাৎ মুখের মধ্যস্থিত জিহ্বা, তালু, বা দন্ত সমস্ত সহজ ভাবে রাখিয়া, সুর বাহির করিলেই পাওয়া যাইবে—অ। মুখ আকুঞ্চিত করিয়া সুর বাহির করিলে পাইব—উ। মুখ বন্ধ করিয়া সুর বাহির করিলে, সুর নাসিকা দিয়া আসিয়া ধ্বনি হইবে—'ঁ' বা ম্।

মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সুর বাহির করিলে ধ্বনি হইবে—'অ'। সেই ধ্বনি করিতে করিতে মুখ আকুঞ্চিত করিলে—অ, উকারে পরিণত হইবে। সেই ধ্বনি ঠিক রাখিয়া মুখ বুজিলে উকার—মকারে বা অনুস্বরে পরিণত হইবে। অতএব মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সহজে সুর উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে মুখ বুজিলে, আমরা ক্রমশঃ তিন সুর পাই—অ, উ, ম্। ইহার সম্মিলনে যে ধ্বনি হয়, তাহা 'ও ম্'। অর্থাৎ সুরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পূর্ণ বিরাম পর্য্যন্ত আসিতে হইলে পাওয়া যায়—অ উ ম্ বা ওম্।

অন্যদিকে মুখবন্ধ করিয়া সুর উচ্চারণ করিলে বা ধ্বনি করিতে চেষ্টা করিলে

পাওয়া যায়—ম্ বা ঁ। এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ অল্প আকুঞ্চিত করিয়া ব্যাদান করিলে পাওয়া যায়—উ। সুরের উচ্চারণ বন্ধ না করিয়া মুখ পূর্ণ ব্যাদান করিলে পাওয়া যায়—অ। অর্থাৎ সুর উচ্চারণ করিতে করিতে হাঁ করিয়া ক্রমে ক্রমে মুখ বন্ধ করিলে বা বুজাইয়া আনিলে, যেমন পাওয়া যায়—অউম্ বা ওঁ, তেমনি মুখ বুজিয়া সুর উচ্চারণ করিতে করিতে হাঁ করিলে পাওয়া যায়—ম্ উ অ—বা 'স্ব' (অস্ব) ; * অথবা সংক্ষেপে 'মা' অর্থাৎ যেমন স্বরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পূর্ণ বিরাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়—ওম্, তেমনি সুরের বিরাম অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় আসিতে পাওয়া যায়—মা। সুরের বা ধ্বনির উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত—ওঁ। সুরের বিলীন অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশ অবস্থা পর্য্যন্ত—মা।

অতএব মূল ধ্বনি বা আদি শব্দ—এই 'ওম্' বা 'মা'। ইহা সুধু শব্দের বা ধ্বনির আদি নহে, ইহা তাহাদের মূল। সমুদয় শব্দ এই ওঁকার দ্বারা ওত—প্রোত। ওঁকার বা প্রণবের দুই রূপ—'ওঁ' ও 'মা'। অতএব শব্দ জগতের আদি, মূল বা কারণ—এই "ওঁ" বা "মা"। "যেমন এক পর্ণ-নালের দ্বারা সমুদয় পর্ণ নিবদ্ধ বা ব্যাপ্ত, তেমনি ওঁকারের দ্বারা সমুদয় শব্দজাত বাক্য সম্বদ্ধ। অতএব ওঁকারই এই সমুদয়।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ২.২।২৩)

'ওম্' ও 'মা' একই। সুরের অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থার পরিণাম 'মা'। আর ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাবস্থার পরিণাম 'ওম্'। ওম্ বা মা বার বার একসুরে (অর্থাৎ সুর বন্ধ না করিয়া) উচ্চারণ করিতে হইলে, মুখ ব্যাদান করিয়া বন্ধ করিতে হয়—আবার মুখ ব্যাদান করিতে হয়, আবার মুখ বন্ধ করিতে হয়। সুতরাং সুরও একবার বিকাশ হইয়া বিনাশ হয়—বা ব্যক্ত হইয়া অব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, আবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হয়। সুতরাং "ওঁ" ও "মা" বার বার একসুরে একটানে উচ্চারণ করিতে করিতে পাওয়া যায়—অ+উ+ম্+ম্+উ+আ অথবা ওম্ স্বা, ওম্ স্বা, ওম্ স্বা, অথবা ওমা, ওমা, ওমা, ওমা—যদি অউম.....মউঅ.....এই কয় বর্ণেরই উচ্চারণ স্পষ্ট রাখা যায়—তবে উক্তরূপ ধ্বনি হয়। নতুবা ধ্বনি হয়—ওমোঁমোঁ.....অথবা মাঁ মাঁ

* 'ব' এস্থলে অন্তস্থ বকার ; সেই জন্য ইহার উচ্চারণ 'অয়া" এইরূপ হইবে।

মা.....মা মা। অতএব ওঁকার নিয়ত উচ্চারণে সাধারণতঃ ধ্বনি হয়—মাঁ মাঁ মাঁ..... বা মোঁ মোঁ মোঁ.....অথবা মা, মা, মা, মা.....।

অতএব বলিতে পারি যে, প্রণবের দুই রূপ ওম্ ও মা। ইহা ব্যতীত প্রণবের আরও রূপ আছে। অ+উ+ম হইতে পাওয়া যায়—ওম্। ম্+উ+অ হইতে পাওয়া যায়—মা। তেমনি উ+অ+ম্ হইতে পাওয়া যায়—'বং'।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ওঁকার আলোচনা করিয়া তাহাতে তিন স্বর বা তিন মাত্রা পাই—অ, উ, ম্(ং)। ইহা ব্যতীত ওঁকার উচ্চারণ শেষ হইয়া আসিলে, একরূপ চাপা অর্দ্ধমাত্রা অনুচ্চার্য্য (বা অস্পষ্ট) স্বর ও পরিণামে তাহার বিরাম পাই।—তাহার চিহ্ন ঁ। তাহাকে নাদ-বিন্দু কহে। ইহাই ওঁকারের চতুর্থ মাত্রা। উপরে যাহা বলিয়াছি, এস্থলে স্বরচক্র দ্বারা সেই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

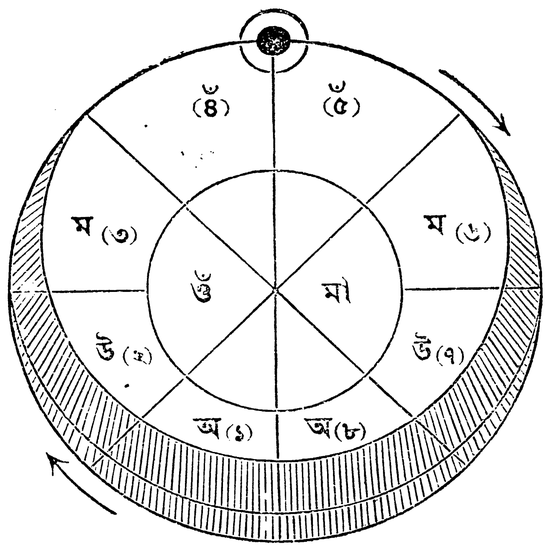

এই চক্রের 'অ'কার স্থান পূর্ণ উচ্চারিত। 'উ'কার স্থান অর্দ্ধ উচ্চারিত। 'ম'কার স্থান অল্প উচ্চারিত। ঁ স্থানে স্বরের বিরাম। সেখানে নাদ বিন্দুতে পর্য্যবসিত।

এই চক্রের অকার (১) হইতে আরম্ভ করিয়া তীর চিহ্ন ধরিয়া ঊর্দ্ধে বিন্দু (৪) পর্য্যন্ত উঠিলে—পাওয়া যায় ওঁ। আর বিন্দু (৫) হইতে আরম্ভ করিয়া অকারে (৮) পর্য্যবসিত হইলে—পাওয়া যায় 'মা'। প্রথম অকার (১) হইতে দ্বিতীয় অকার

(২) পর্য্যন্ত আসিলে—পাওয়া যায় 'ওমা'। উ (২) হইতে অ (১) পর্য্যন্ত আসিলে—পাওয়া যায় উম্বা—বা 'উমা'। ম (৩) হইতে উ (২) পর্য্যন্ত আসিলে পাওয়া যায়—'মোঁ। উ (৭) হইতে ম (৩) পর্য্যন্ত বা ৮ (৪) পর্য্যন্ত পাওয়া যায়—'ব্যোম্'।

যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, প্রণবের নানারূপ। তবে তাহার মধ্যে ওম্, ওঁ, মা, 'উমা বং 'ব্যোম্'—ইহাই প্রধান।

এই যে প্রণবের সহিত ব্রহ্মের, ও ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত্তিত জীবের ও জগতের বড় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে—এক্ষণে সেই বিষয় চিন্তা করা যাউক। আমরা শব্দের চারিটি অবস্থা দেখিয়াছি—পূর্ণ বিকাশাবস্থা, অর্দ্ধ বিকাশাবস্থা, বিরামের পূর্ব্বাবস্থা ও বিলীন অবস্থা। ব্রহ্মের পূর্ণবিকাশ বিরাটরূপে, অর্দ্ধবিকাশ হিরণ্যগর্ভরূপে। তাহার মূল বা প্রথম বিকাশ অবস্থা পরমপুরুষরূপে ও বিলীন অবস্থা নির্গুণ ব্রহ্মরূপে। ব্রহ্মের প্রথম অবস্থা 'ব্যক্ত', দ্বিতীয় 'অব্যক্ত', তৃতীয় 'চিৎ' চতুর্থ 'পরমপদ'। ব্রহ্মের বা পুরুষের—এই চারি অবস্থাকে চারি পাদ বলে।

ব্রহ্ম ও আত্মা এক। আত্মারও চারি অবস্থা। প্রথম অবস্থা জাগৃত, দ্বিতীয় অবস্থা নিদ্রিত, তৃতীয় অবস্থা স্বপ্নযুক্তা ও চতুর্থ অবস্থা তুরীয়—শান্ত শিব অদ্বৈত। বিষয় গ্রহণে মত্ত জাগৃত অবস্থায় আত্মা বিশ্ব, স্বপ্ন অবস্থার নাম তৈজস্, ও নিদ্রিত অবস্থার নাম প্রাজ্ঞ।

প্রণবের এক এক মাত্রা—ব্রহ্মের ও জীবাত্মার এক এক পাদ। প্রণবের অকার—ব্রহ্মের জাগরিত অবস্থা—বিরাট রূপ। প্রণবের উকার—ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভরূপ। প্রণবের মকার—ব্রহ্মের পরমপুরুষ রূপ। আর প্রণবের চতুর্থ—অর্দ্ধ অনুচ্চার্য্য মাত্রা—নির্গুণ ব্রহ্মরূপ। অকার ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা, উকার অব্যক্তা অবস্থা মকার চৈতন্যময় অবস্থা, আর 'ঁ' কার নির্গুণ অবস্থা। সেইরূপ জীবের জাগৃত, অবস্থা—প্রণবের অকার। তাহাই বৈশ্বানর। জীবের স্বপ্নাবস্থা—প্রণবের উকার—তাহাই তৈজস্। জীবের সুপ্তাবস্থা—প্রণবের মকার—তাহাই তৈজস। আর জীবের মোক্ষাবস্থা—প্রণবের চতুর্থ মাত্রা—তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মরূপ।

অকার সকল স্বরের—সকল শব্দের মূল; আর বিরাটরূপ এই জগতের মূল। অকার সকল শব্দে ওতপ্রোত; অকার দ্বারা সর্ব্ব বাক্য ব্যাপ্ত।—ব্রহ্মও বিরাট-

রূপে সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত ব্যাপ্ত। স্বরের আশ্রয় অকার; জগতের আশ্রয় বিরাট-রূপী ব্রহ্ম।

উকার স্বরের মধ্যবর্ত্তী রূপ; উকার—অকার হইতে শ্রেষ্ঠ।—হিরণ্যগর্ভ (বা তৈজস্)ও সেইরূপ ব্রহ্মের অন্য দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী; ও উহা বিরাট বা বৈশ্বানর-রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ।

অন্যদিকে ম্‌কার—স্বরের পরিণাম, অর্থাৎ 'ম্'কারে অন্য স্বরের বিলয় হয়। সেইরূপ পরম পুরুষে—বিরাটও হিরণ্যগর্ভের বিলয় হয়।

ব্রহ্মের চতুর্থ রূপ অব্যবহার্য্য প্রপঞ্চোপসম। ওঁকারের চতুর্থ মাত্রায়ও স্বরের উপসম হয়—তাহা অব্যবহার্য্য। (মুণ্ডক উপনিষদ্)

ব্রহ্ম ও আত্মার সহিত প্রণবের সাদৃশ্য দেখা গেল। এখন জগতের সহিত সাদৃশ্য চিন্তা করা যাউক। স্বরের যেমন উৎপত্তি-লয় আছে—যেমন স্বর তারা গ্রাম হইতে সুদারা গ্রামে আসিয়া ক্রমে উদারায় মিলাইয়া যায়, তেমনি জগতের উৎপত্তি বিকাশ ও বিলয় আছে। জড়-জগত হইতে উদ্ভিদ-জগৎ, ক্রমে জীব জগত ও পরিণামে চৈতন্যময় জগতের (আতিবাহিকী জীব জগতের) বিকাশ হইয়া থাকে। জড়শক্তি—উদ্ভিদের বিকাশ শক্তিতে পরিণত।—তাহাই ইচ্ছা-শক্তিতে জীবে বিকশিত হয়।

জড়ে চৈতন্যের সুপ্তাবস্থা, উদ্ভিদে চৈতন্যের স্বপ্নাবস্থা, আর জীবে চৈতন্যের বিকাশাবস্থা। জগতে—প্রথম ভূ, তাহার পর ভূব, তাহার পর স্বঃ। সৃষ্টিকালে প্রথম তমঃ প্রকাশিত হয়, পরে তাহা রজরূপে পরিণত হয়, শেষে তাহা সত্ত্ব-শক্তিতে উন্নীত হয়।

অতএব যেমন ওঁঙ্কারে স্বর—বিকাশ অবস্থা হইতে ক্রমে বিলীন হয়;—জগতও তেমনি বিকাশ অবস্থা হইতে ক্রমোন্নত হইয়া ক্রমে বিলীন হয়।

আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি যে, ওঁঙ্কার যেমন বিকাশ অবস্থা হইতে ক্রমে বিনাশ অবস্থায় আইসে—ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত অবস্থায় আইসে;—সেইরূপ ব্রহ্ম ও তাহা হইতে বিবর্ত্তিত জীব ও জগৎ—বিকাশ অবস্থা বা ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। ওঁঙ্কারের অকার যেমন উকার হইয়া পরে মকারে পরিণত হয় ও শেষে মিলাইয়া যায়;—ব্রহ্ম জীব, জগত—সর্ব্বত্রই সেইরূপ নিয়ম দেখা যায়।

সুধু তাহাই নহে। সংসারে কেবল একবার সৃষ্টি, ও আর একবার প্রলয়, এরূপ হয় না। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি—দোলকের মত নিত্য অনবরত চলিতেছে।

অতএব স্বর বিকাশ হইয়া—অকার হইতে যেমন ক্রমে 'ঁ' বিন্দুতে মিলাইয়া যায় আবার বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া বিকশিত হইয়া অকারে পরিণত হয়, তেমনি জগতও অব্যক্ত হইতে ক্রমে ব্যক্ত হয়, আবার ব্যক্ত অবস্থা হইতে ক্রমে অব্যক্ত হয়। স্বরের বিকাশ হইতে বিলয় পর্য্যন্ত রূপ ওঁ; আর বিলয় হইতে বিকাশ পর্য্যন্ত রূপ 'মা'। ব্রহ্মেরও বিকাশ হইতে বিলয় পর্য্যন্ত প্রতিরূপ ওঁ আর অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত পর্য্যন্ত প্রতিরূপ 'মা'। ব্রহ্ম-বিকাশ অবস্থায়—প্রকৃতি—বিশ্বময়ী "মা"। আর প্রলয় বা যোগনিদ্রা অবস্থায় পরমপুরুষ—'ও'। আর একরূপে দেখিলে তিনিই "বং" বা 'বাবা'—শিব মহাদেব। এই ওঁ আর 'মা' অথবা 'বাবা' আর 'মা' এই জগতও জীবরূপে ক্রীড়া করেন, জীবজ্ঞানে জগত ও জীবরূপে প্রতিগত হন। প্রকৃতি পুরুষরূপে নিত্য নবলীলা করেন। অবোধ আমি তাহা কিরূপে বুঝিব!

আমি ওঁকার বুঝিবার অধিকারী নহি। আমি সামান্য জীব, ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তে যাইবার শক্তি আমার নাই। প্রপঞ্চোপশম তুরীয় জ্ঞানাতীত অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ আমার ধারণা করিবার অধিকার নাই। আমি সেই অদ্বৈত অব্যক্তাবস্থা হইতে এই জীবরূপে বিকাশ অবস্থায় আসিয়াছি, আমি সেই অবস্থায় আছি, কতকাল সেই অবস্থায় থাকিব তাহা জানি না, আমি কিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশ অবস্থা হইতে অপ্রকাশ অদ্বৈত অবস্থা পর্য্যন্ত বুঝিব? আমি কিরূপে ওঁকার তত্ত্ব জানিব?

আমার কতটুকু অধিকার আছে? ব্রহ্মের প্রথম বিকাশ পূর্ব্বের অবস্থা (ম) হইতে পূর্ণ বিরাটরূপে (অ) বিকাশ বিশেষ সাধনা করিলে জানিতে পারিব। অতএব আমার সাধনা ম+উ+আ বা 'মা'। আমার প্রণব ওঁকার নহে। আমার প্রণব 'মা'। আমি মা মা মা বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিব। মা মা বলিয়া সাধনা করিব। মা মা বলিয়া—আমার ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমি অনধিকারী—ইহার উর্দ্ধে আর সাধনা করিতে পারিব না। আমি ওঁকার রূপে ব্রহ্মধ্যান করিতে পারিব না। আমি পূর্ণরূপে জাগ্রত অবস্থা-

পন্ন জীব। এই জীব জড়ময় জগত ও আমি—আমার জ্ঞানে পূর্ণ প্রতিভাত। নিদ্রাবস্থা অতিক্রম করিয়া, স্বপ্নাবস্থা অতিক্রম করিয়া—এই জাগ্রত অবস্থায় আসিয়াছি। ম্ অতিক্রম করিয়া, উ অতিক্রম করিয়া—'অ' অবস্থায় আসিয়াছি। আমার মধ্যে যিনিই আমার নিয়ন্তা—অন্তর্যামী তিনিও "ম্" হইতে ক্রমে "অ" হইয়াছেন। 'মা' হইয়াছেন। তিনি আমার মা। আমি সংসারী-জীব মোক্ষের অধিকারী নহি। আমি 'ওঁ' কোথায় পাইব। আমার প্রণব 'মা'। আমি চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া—অদ্বয় শিব মুদ্গর শাস্ত্র প্রপঞ্চোপশম চতুর্থ পাদে যাইবার অধিকারী নহি—আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি ওঁঙ্কার পাইবার অধিকার পাই নাই। আমি কেবল পাইয়াছি 'মা'। আমি 'মা' বলিয়া সাধনা করিব।

বুঝি দেবতারাও এই ওঁকার পান নাই। আমি কোন্ ছার।

দেবতারা ওঁকার কেন পান নাই, তাহা বলিতেছি। দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ পরাস্ত হইলে দেবগণের অহংকার হইল। তাঁহারা ভাবিলেন আমরাই অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছি। তখন নিমিষ জন্য ব্রহ্ম (ওঁ) তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে চিনিলেন না। কিন্তু ব্রহ্মের সম্মুখে দেবগণের বল লোপ পাইল। দেবগণ শক্তিহীন হইলেন। তখন দেবগণের অন্তরাকাশ হইতে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে জানিবার জন্য তাঁহাকে আবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু ব্রহ্ম আর আবির্ভূত হইলেন না। ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে দেবগণের হৃদয়াকাশে বহু শোভমানা হৈমবতী (হিরন্ময়ী) 'উমা' আবির্ভূত হইলেন। তাঁহা হইতে দেবগণ বুঝিলেন যে, সেই অজ্ঞেয় ব্রহ্মই তাঁহাদের বল, তিনিই দেবতাদের জন্য অসুর জয় করিয়াছিলেন। (কেনোপনিষদ্)। তাই বলিতেছিলাম যে দেবতারা ওঁকার পান নাই, তাঁহারা পাইয়াছিলেন "উমা"। এই "উমা" হইতেই দেবতারা ব্রহ্ম বুঝিয়াছিলেন। "উমা" বা "মা" দেবতাদের প্রণব। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে পাই "উমা"ই দেবতাদের সমষ্টি বল; তিনিই দেবাসুর সংগ্রামে অসুর জয় করিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য উপনিষদের "দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযতিরে" এ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে জানা যায় যে মানুষের শাস্ত্রোক্তাষিত ইন্দ্রিয় বৃত্তিই দেবতা, আর তামসিক প্রবৃত্তিই অসুর)।

অতএব যখন দেবতারাই ওঁকার পান নাই (কেননা সকল বৃত্তির উপসম

না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না) তখন আমি কোন্ ছার। আমি ওঁকারের অধিকারী নহি বলিয়া আমার দুঃখ নাই। যত দিন সে অধিকার না পাইব ততদিন আমরা প্রণব মা, মা আমার তারকব্রহ্ম। আমার উপাস্য ঈশ্বরের স্বরূপ এই 'মা' প্রণব, আমি হৃদয়ে 'মা' রূপও ভাবনা করিব।

এই 'মা' ব্রহ্মের বাক্। 'মা'ই ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি ব্রহ্মের বহু হইবার কল্পনা। ইহা হইতে নাম রূপময় জগতের বিকাশ। ব্রহ্মের জ্ঞান মূলক এই যে কল্পনা ইহার মূলে বাক্। ইনিই স্বরস্বতী। ভাষা ব্যতীত চিন্তা জ্ঞান বা কল্পনার সম্ভব কোথায়? জ্ঞানের বা চিন্তার মূল 'জাতি' নির্ণয় বা Concept Idea, এই জাতির কোন রূপ নাই। বাক্য বিশেষ বা শব্দ দ্বারা ইহার ধারণা হয়। ইহাই 'নাম'। Abstract Idea বা concept—নাম। আর Concrete Idea বা percept—রূপ। জগত জ্ঞান এই নাম রূপময়। তাই বলিতে ছিলাম প্রত্যেক চিন্তার, কল্পনার মূল ভাষা। ভাষার মূল শব্দময়ী বাক্। তাই বলিয়াছি ব্রহ্মের বাক্ অথবা ব্রহ্মময়ী বাক্ (স্বরস্বতী) হইতে জগতের বিকাশ। এই শব্দময়ী ব্রহ্মই শব্দ-ব্রহ্ম। ইনিই অনাদি মায়া-মূল প্রকৃতি-ব্রহ্মের চিন্ময়ী-সৃষ্টিশক্তি—জগন্ময়ী মা। আর এই জগৎ এই চিন্ময়ী বাক্‌রূপী—শব্দব্রহ্মের বিকাশ। জগত—Idea (Plato) বা Logos (stries) বা word (Bible) ইহারই বিস্তার।

আর যাহা মূল শব্দ, মূল Idea Logos বা word, তাহার রূপ অ, উ, ম্—ওঁ, অথবা ম্, উ, অ—মা। সৃষ্টির বিকাশ কালে—মা, আর সৃষ্টির লয় কালে মোক্ষকল্পে ওঁ।

অতএব শব্দরূপী বাক্‌মূল 'মা' হইতে এই জগতের বিকাশ। এই 'মা' বা 'উমা' হইতে দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এই বাক্‌রূপী 'মা' 'দেবীসূক্তে' আপনাকে জগৎ বিস্তার কর্ত্রী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই বলিতেছি এই 'মা' শব্দরূপী ব্রহ্মের প্রকৃতি বা জ্ঞান-পূর্ব্বিকাসৃষ্টি-শক্তি।

সুধু তাহাই নহে। এই প্রণব 'মা' এবং 'ওঁ' রূপে শব্দের মূল ও আধার রূপে সর্ব্বব্যাপী। যেখানে শব্দ সেইখানে ওঁ—সেইখানে 'মা'। এই কর্ম্মাত্মক জগতে যেখানে ক্রিয়া—আর ক্রিয়া কোথায় নাই? সেইখানেই শক্তির কার্য্য শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব—সেইখানেই শব্দ—সেইখানেই 'মা' ওঁ। সকল

শক্তির ক্রিয়া মূলে সেই শব্দ কেন না শব্দ—সকল শক্তির মূল। আর জগতে যেখানে বিভার বিকাশ—জ্ঞানের বিকাশ—সেইখানে ভাষা—সেইখানে শব্দ—সেইখানে 'মা' ওঁ। জড়শক্তি ক্রিয়ায় 'মা' ওঁ ; জীবশক্তি ক্রিয়ায় মা, ওঁ ; প্রাণ শক্তির অনুকম্পনে (এজৎ)—'মা' ওঁ ; জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ার মূলে মা ওঁ।

অতএব যেখানে শক্তি ক্রিয়া—সেখানে শব্দ, সেইখানে 'মা' সেইখানে ওঁ। অনন্ত শব্দপল্লবযুক্ত সংসারবৃক্ষের মূল ওঁ আর স্তম্ভ 'মা'। সংসার অশ্বত্থের বিকাশ 'মা' শব্দে, আর বিনাশ বা ভঙ্গ ওঁ শব্দে। জগতে যে কিছু শব্দ শুনিতে পাই তাহার মধ্যে সকল অবিকৃত শব্দ 'মা' ওঁ। আর বিকৃত অসংখ্য শব্দমূলে তাহাদের আধার রূপে ঐ 'মা' ওঁ। শিশু প্রথমে 'মা' বলে ; কোথাও 'মা মা' বা 'মাম্বা' বলে : গো মেষ ছাগ শিশু কেবল 'ম্যা' বা 'ব্যা' বলিতে পারে। শোকে দুঃখে ক্রন্দনে হাস্যে যে অর্থহীন শব্দ, তাহা এই ওঁ বা 'মা'। জড় জগতে শব্দরাশি মধ্যে কোথাও 'মা' কোথাও ওঁ কোথাও তাহার বিকার। অথবা সকল শব্দ মূলেই ওঁ ও 'মা' পাই। জীব জগতেও সেই কথা। আমাদের হৃদয়ের ধপ্ ধপানিতে, ফুস্ফুসের ফোঁসফোঁসনিতে, প্রাণের ক্রিয়াতে সেই ওঁ 'মা' বা ব্যোম শব্দ। সর্ব্বত্র সেই 'মা' সেই ওঁ ধ্বনি। আর যে জগতের সকল শক্তিতরঙ্গ মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত, আকর্ষণ বিক্ষেপ, অনুকম্পনাদি শব্দাত্মক ক্রিয়া, অনুকম্পনাধিক্যে (প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০ বারের অধিক অনুকম্পন হইলে) আমাদের সীমাবদ্ধ শ্রবণ শক্তির অগোচর থাকে (যাহা তাপ আলো তড়িত প্রভৃতি শক্তি ক্রিয়া রূপে কখন কখন গোচরীভূত হয়) সে সকলের মূলেও এই ওঁ এই মা। এই 'ওঁ' 'মা' ব্রহ্ম—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বমূল, সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তি নিত্য, অক্ষর, অব্যয়।

আমি যখন এই জগতে ও আত্মাতে এই 'মা'কে দেখিতে পাইব 'মা'কে চিনিতে পারিব তখনই কৃতার্থ হইব। কিন্তু কিরূপ সাধনায় তাঁহাকে চিনিব ? কে আমায় সে সাধনা শিখাইয়া দিবে? আমি কবে সে শিক্ষা পাইব ? কবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ অন্তরে বাহিরে সেই অনাহত 'মা' শব্দ শুনিতে পাইব ?

যদি 'মা'কে চিনিতে পারি তবেত আমার 'ওঁ' জানিবার অধিকার হইবে। হায় সে দিন কি কখন আসিবে ?

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(দ্বিতীয় সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠার পর)।

তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন দেখিয়া আমি প্রকৃত গুরুর উদ্দেশে প্রণাম, বন্দনা ও ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ, ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলাম। গুহাটির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক ; গুহাটি দ্বাদশ কোণী। গুহাভ্যন্তরে আলোক ও নাই অন্ধকারও নাই, যেমন বহুকাল অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিলে অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া বোধ হয় না, গৃহ মধ্যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল ; গুহার প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণের পথ একটি মাত্র, অন্য পথ নাই। একাগ্র চিত্তে রূপ ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিতেছি, এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া যাইল, কোন প্রকার বিঘ্ন বা বিভীষিকা অথবা বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলাম না, এইরূপ ভাবে আরও কিছু সময় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইল, ক্রমে বোধ হইতে লাগিল গুহাভ্যন্তর ভেদ করিয়া কি পড়িতে লাগিল, যেন গুহার ভিতর মাটিতে পূর্ণ হইতে লাগিল, বুঝি মাটি চাপা পড়িলাম, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম, ক্রমে মাটি সব যে কোথায় চলিয়া যাইল বুঝিতে পারিলাম না। আবার কিছুক্ষণ পরে জল পড়িতে লাগিল, জল পড়া প্রবল হইতে লাগিল, এইবার জলে মগ্ন হইতে হইল, তবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, আবার পূর্ব্ববৎ গুহা হইল, বুঝিলাম উহা কিছুই নয়, বিভীষিকা মাত্র। মনে মনে সাহস বৃদ্ধি করিলাম, দেখিতে দেখিতে অগ্নি এমন ভাবে জ্বলিয়া উঠিল যে, এবার ঠিক করিলাম, পুড়িয়া মরিতে হইল আর উপায় নাই, যখন পুড়িয়া মরা নিশ্চয় তখন আর অন্য দিকে মন দিব কেন ? উদ্দেশে গুরুকে প্রণাম করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম।

কোথাও কিছুই নাই, গুহা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যত এইরূপ হইতে লাগিল তত সাহস বাড়িতে লাগিল। একি ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত! গোঁ, গোঁ শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল, যেন প্রলয় উপস্থিত, কখনও কখনও বাতাস এরূপ অনুভব হইতে লাগিল যে বরফ অপেক্ষা শীতল ; দন্তে দন্তে ঠেকিতে লাগিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, হস্ত, পদ অসাড় হইয়া যাইল, বুঝি সমস্ত রক্ত জমিয়া যাইবে, মৃত্যু নিশ্চয়। দেখিতে দেখিতে বাতাস অন্যরূপ হইল, এত

গরম বোধ হইল যে, অগ্নিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, গায়ে বুঝি ফোস্কা হইল, আবার পূর্ব্বের ন্যায় গুহা হইল।

গুহাটি দ্বাদশ কোণী, একটি মাত্র গতায়াতের পথ, দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ দিকে দ্বাদশটি পথ হইল, ক্রমে ক্রমে গুহার দেয়াল ছাদাদি লোপ হইতে লাগিল, চারি দিক পরিষ্কার, কোথাও কিছু নাই, তলস্থ জমী, আসন ও আমি ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না, হঠাৎ আসন নড়িয়া উঠিল, আসন সহ আমি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এবার দশদিক অন্ধকার অনুভব করিলাম, দশদিক নিরীক্ষণ করিলাম, কিছুই লক্ষ্য হয় না, কেবল শূন্য, শূন্যের পর শূন্য, মহা-শূন্য, অনন্ত শূন্য, দশদিক শূন্য দেখিয়া বিশেষতঃ অধঃদিক শূন্য দেখিয়া হৃদয় গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিতে লাগিলাম। এত একাগ্র চিত্তে মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিতেছিলাম যে, আমি কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলাম তাহা জানিতে পারি নাই, যখন ধ্যান ভঙ্গ হইল তখন দেখি যে, পূর্ব্ববৎ সেই গুহার আসনে বসিয়া রহিয়াছি।

মনে বড় আনন্দ হইল। স্থির মনে মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিতেছি, সহসা গুহাটি সদ্গন্ধে ভরিয়া যাইল, মন মাতিয়া উঠিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে রসনার তৃপ্তিকর নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য থরে থরে কেমন রাখিয়া যাইল ও আবার কি সুন্দর বেশ ভূষাযুক্ত সুন্দর যুবাগণ ও যুবতীগণ পরস্পর কত হাবভাবের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতেছে, একটি সুন্দর যুবা পুরুষ কতকগুলি উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও সুকোমল পরিচ্ছদাদি লইয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার এ বয়সে এরূপ বেশ শোভা পায় না, এই মহামূল্য অলঙ্কার ও এই সুন্দর সুকোমল পরিচ্ছদগুলি পরিধান কর এবং সুবাসিত ও রসনার তৃপ্তিকর খাদ্যাদি ভক্ষণ কর, আর দেখ ঐ যুবক যুবতীরা কেমন আনন্দে রহিয়াছে, তুমি এই কষ্টকর বৃথা কার্য্য হইতে উঠিয়া আমার নিকটে আইস, আবার ঐ কেমন সুন্দর গীত ধ্বনি উঠিতেছে শোন।

সঙ্গীত।

ভালবাসা এজগতেরই সার।
আমার জীবন ভার যে করে বর্জ্জন।

এস, এস ওগো মম প্রাণ সখি।
তোমারে হৃদয়ে রাখিয়ে করিব যতন!
ছাড় এবেশ, পর পরিমল বেশ।
ত্বরে ফেল মালা, পর আভরণ।
রাখ মোর কথা করি গো মিনতি।
তব রূপ হবে জগৎ মোহন।
নিশ্চিত ছাড়িয়ে কেন অনিশ্চিতে ধাও।
ভালবাসা ধনে করহ যতন॥
তোমায় দিব কতই ভালবাসা।
তুমি দেহ ভালবাসা প্রতিদান॥

আমি যুবকের কথা ও গান শুনিয়া একেবারে মরমে মরিয়া যাইলাম, অপমান ভরে কাঁদিয়া ফেলিলাম, কি ভয়ানক পরীক্ষা! হে গুরুদেব এ কি করিলেন, এ পরীক্ষায় কেমনে উত্তীর্ণ হইব, মৃত্যু যে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, ঐ মনোমুগ্ধকর প্রণয় সঙ্গীত শুনিয়া, সুন্দর অলঙ্কার ও সুকোমল পরিচ্ছদাদি ও যুবক যুবতীদিগের মনোমুগ্ধকর সুন্দর রূপ দেখিয়া আমার সমস্ত হৃদয় কণ্টকিত হইবার উপক্রম হইতেছে, চারিদিক সদ্গন্ধে আমোদিত ও উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যের সম্ভার সম্মুখে স্থাপিত—এ যে ভয়ানক প্রলোভন—দেব, তোমার কৃপা ভিন্ন এ প্রলোভন হইতে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইব, দেব, রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া চক্ষু মুদিয়া কাতর ভাবে ডাকিতে লাগিলাম।

কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল যে, "একাগ্র চিত্তে ধ্যান ও মন্ত্র জপ কর তাহা হইলে তোমার শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন ও ঘ্রাণ শক্তি সমস্তই তোমাতেই লয় পাইবে। তোমার নিজের কার্য্য নিজে কর অপরে তোমাকে পথ ও উপায় দেখাইয়া দিবে, কার্য্য তোমাকে নিজে সাহস পূর্ব্বক করিতে হইবে।" এই বাক্যে আমার সাহস দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর হইল, কিন্তু আমার চেষ্টা ও সাহস যত বাড়িতে লাগিল তত তাহারা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল ও ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতে লাগিল, যতক্ষণ শত্রুগণকে শত্রু বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ তাহারা নম্রভাবে থাকিয়া নাচিয়া বেড়ায়, যখন শত্রুকে শত্রু জ্ঞান হয়, তখন নষ্ট করিবার জন্য প্রবল বেগে আক্রমণ করে, তাই তাহারা

এখন আমাকে প্রবলরূপে আক্রমণ করিল, আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিলাম, দেখি, প্রলোভনের দুর্দ্ধর্ষ্য আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারি কি না, এই বলিয়া সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে এক কেন্দ্রীভূত করিয়া ইষ্টদেবে অর্পণ পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্য রূপ ধারণ করিল, সেই মন উত্তেজক উগ্র সদ্গন্ধের পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ শান্তিপ্রদ অগুরু চন্দন, ধুপ, ধুনা, গুগ্‌গুলাদি ও পূজা উপযোগী পুষ্পাদির সদ্গন্ধে গুহা ভরিয়া যাইল, নৈবেদ্য ও ভোগাদি পূজার উপকরণ থরে থরে সজ্জিত হইল; গুহাটি নানা বর্ণে ও নানা দেব দেবীর চিত্রের দ্বারা শোভিত হইল; এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন বড় পুলকিত হইল, কেমন পূজার দ্রব্য সব আসিয়াছে, কেমন কত শত শত দেব, দেবীর চিত্র ও নানা বর্ণ দ্বারা গুহাটি রঞ্জিত হইয়াছে, যে দিকে তাকাই সেই দিকে কত দেব দেবীর চিত্র দেখিতে পাই, দেখিতে দেখিতে দেব দেবীদিগের প্রতি মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, মন্ত্রোক্তরূপ ধ্যান ও মন্ত্র জপ ভুলিয়া যাইবার উপক্রম হইল, পূজার পূর্ব্বে ও পরে যে সমস্ত গাত্র অনুলেপন আবশ্যক হয় তাহা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে দেখিয়া গাত্রে সুখ স্পর্শজন্য অনুলেপনাদি দিব কি না ভাবিতেছি এমন সময়ে গুহার ছাদ ভেদ করিয়া প্রণয় সঙ্গীত পরিবর্ত্তে তানপুরা সহযোগে একটি শ্রুতিমধুর ও মনোমুগ্ধকর ধর্ম্ম সঙ্গীত ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আহা কি সুন্দর সঙ্গীতের ভাব, মনকে যেন জোর করিয়া বৈরাগ্য দিকে লইয়া যাইতে চাহে। সঙ্গীতের এক একটি শব্দ যেন আমার অন্তরের মর্ম্মস্থল ভেদ করিতে লাগিল।

সঙ্গীত।

করো না হেলন অবোধ সন্তান,
ভবেরই খেলনে পড়িয়ে।
হবে দুঃখ পাবে শোক নিরন্তর,
সংসার সাগরে ডুবিয়ে।
(কর) শিব নাম সার, নামেরই প্রচার,
শিব শিব মুখে বলিয়ে।
(আছে) ছটা রিপু দমন সবার,
করহ পীড়ন নিদয় হইয়ে।

যায় যদি প্রাণ ছেড় না তাঁহারে।
পাবে মোক্ষ যাঁরে অন্তরে রাখিয়ে।
ভবে করিতে হইবে না আর যাওয়া আসা,
জঠর যন্ত্রণা সহিয়ে।

আমি সঙ্গীতের স্রোতে ভাসিলাম, সমস্ত ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম ও স্পন্দহীন জড়ের মত বসিয়া রহিলাম, সঙ্গীত থামিবামাত্র এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। সহসা আমার চমক ভাঙ্গিল, আমার কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া কয়েকটি বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, "মূর্খে সাবধান নিম্ন জগতের শত্রু প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা করে, তাহাকে দমন করা সোজা, কিন্তু উচ্চ জগতের শত্রুরা মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়া নিজের আয়ত্বাধীন করে ও অতল তলে ফেলিয়া দেয়, প্রতারিত হইও না, ধ্যান মন্ত্র জপ কর"।

একি ভয়ঙ্কর অনুজ্ঞা, এইবার আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, উক্ত সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রতারিত হইতেছি কি এই অনুজ্ঞায় প্রতারিত হইব, ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, কি করিব ও কি করা উচিত তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে এই ঠিক করিলাম, ধ্যান ও মন্ত্র জপ করাই শ্রেয়ঃ, নিঃসন্দেহে ধ্যান ও মন্ত্র জপ আরম্ভ করিয়া দিলাম, দেখিতে দেখিতে সমস্ত গুহাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পূর্ব্ববৎ হইল, এইরূপ কিছু সময় অতিবাহিত হইল, এমন সময়ে বোধ হইতে লাগিল কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, স্বর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, ক্রমে স্বর অতি নিকটবর্ত্তী হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার স্বামী আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন; তাঁহার স্বর শুনিয়া বড় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তিনি গুহার ভিতর আসিলেন দেখিয়া আমি আনন্দে কিছু শশব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, মনে হইতে লাগিল যে, তিনি পূর্ব্বে কতবার আমাকে পূজাদি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার এই অবস্থা দেখিয়া হয়ত কত সুখী হইয়াছেন ও আমাকে এই কার্য্যের জন্য কত উৎসাহ দিবেন। তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু পূর্ব্বের মত তাঁহার সেই উৎসাহ ব্যঞ্জক মুখের পরিবর্ত্তে কর্কশতাপূর্ণ মুখ দেখিয়া আমার মনে বড় ব্যাকুলতা আসিল, কাতর ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিলাম, মনে করিলাম হয়ত আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া খুঁজিতেছেন, সেইজন্য বুঝি মৌখিক রাগ করিয়াছেন,

দুইটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিলে এখনি সমস্ত মিটিয়া যাইবে মনে করিয়া কথা কহিবার উপক্রম করিতেছি এমত সময়ে তিনি আমাকে কর্কশ স্বরে ব্যঙ্গভাবে বলিলেন "স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই উত্তম, আপন ঘর, দ্বার, স্বামী ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া একজন অজ্ঞাত কুলশীল অপরিচিত পুরুষের সহিত নির্জ্জন স্থানে বাস করা, উঠ ঢের হইয়াছে আর কেন" তাহাতে আমার বড় কষ্ট হইল, যিনি জীবনে একদিনের জন্য আমাকে কর্কশ কথা বলা দূরের কথা বরঞ্চ পূজাদির বিষয় ও তাহার আবশ্যকতা কেন, এই সম্বন্ধে কত যুক্তিপূর্ণ বাক্য বলিয়াছেন ও যাঁহার কথা ধ্রুব জ্ঞানে কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, আজ কিনা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহারই নিকট সেই কার্য্য জন্যই তিরস্কৃত হইলাম। কি করি মুখের উপর জবাব করা বা তাঁহার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করা জানি না, কাজে কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "ওগো গৃহস্থের বউ উঠ, উঠ আর কেন অনেক হয়েছে, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়, মানে মানে বাড়ী চল," একথা শুনিয়া আমার শরীর এত অবসন্ন বোধ হইল যে, উঠিতে পারা দূরের কথা, অতি ক্ষীণ ও কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিলাম," আমার শরীর অসাড় মত হইয়াছে, আপনি আমার হাত ধরিয়া উঠান, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি, আমি কি আপনার কথার অবাধ্য? সবে মাত্র এই কথা উচ্চারণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি, "বড় বেঁচে গেলি" এই কথা সহসা শ্রুত হইল ও বজ্র নির্ঘোষিত উচ্চহাস্য করিয়া সেই স্বামী রূপধারী মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল, সেই উচ্চ হাস্যের ঘাত প্রতিঘাতে বিকট হাস্য তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল, হাস্য যেন রাক্ষসী হইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, আমি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, হৃদয় দুর্, দুর্, করিতে লাগিল, হঠাৎ আমার মুখ হইতে কম্পিত স্বরে "গুরুদেব একি ভয়ানক পরীক্ষা! আমি যে যাই, রক্ষা কর, কর," এই বাক্য উচ্চারিত হইল। দূরে "বৎসে! ভয় নাই, ভয় নাই" শব্দ শ্রুত হইল।

(ক্রমশঃ)

উত্তরাখণ্ডে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তামণি কিছুক্ষণ অনন্যমনে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং যে স্থলে বালক অদৃশ্য হইয়াছিল কলের পুত্তলিকার ন্যায় তথায় গমন পূর্ব্বক সেই স্থল পদ দলিত করিলেন; পরে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া একখানি বেত্রাসনে বসিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন, ভাবিলেন—"বালক কিরূপে অন্তর্হিত হইল? হাতার কোন স্থানইত আমার অবিদিত নাই। বিশেষ ঐ স্থানটি আমি স্বয়ংই নির্ব্বাচন করিয়াছিলা। ভূগর্ভ বা শূন্য পথে কখনও যাওয়া সম্ভব নহে। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে—হয় বাজিকর আমাকে কুহকিত করিয়াছিল; আর যদি আমার ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকে তবে, বাজিকর যে ক্ষমতার কথা বলিয়াছিল, সত্যই তাহার সেই ক্ষমতা আছে—অর্থাৎ সে নরদেহস্থ পরমাণু সমষ্টি একবার বিশ্লিষ্ট করিয়া পুনরায় সংশ্লিষ্ট করিতে পারে।

সে রাত্রে চিন্তামণির আর নিদ্রা হইল না,—তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন "যদি একজন ভিক্ষুক আমাকে যাদু করিতে পারে, আমার অজ্ঞাতসারে দিনে দ্বিপ্রহরে আমার ইন্দ্রিয় কার্য্য রুদ্ধ করিতে পারে, আমার চৈতন্য হরণ করিতে সমর্থ হয়, তবে আমার জীবনের মূল্য কি? আহা! যদি তাহাই হয় তবে এই দুঃখময় সংসার হইতে অপসারিত হইতে পারিলেই ভাল!" আবার ভাবিলেন, "যদি মনুষ্য, জড় পদার্থ কি জীবিত পদার্থ বা অপর অপর মনুষ্যের উপর এইরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে, তবে মনুষ্যের দেহ, মন বা আত্মায় গুপ্তভাবে এমত কিছু শক্তি নিশ্চয়ই আছে, যাহার সত্বা বিজ্ঞানাভিমানী য়ুরোপীয়গণের মস্তিষ্কে অদ্যাপি প্রবেশ লাভ করে নাই। আমিও সেই বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধা করি—আমি কিরূপে বুঝিব। যাহা হউক আমাকে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। ইহার গূঢ়-তত্ব আমাকে জানিতেই হইবে।"

ইহার কিছুদিন পরে চিন্তামণির পূর্ব্ব পরিচিত শিকিম নিবাসী জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বর্ণণ করিলেন। বৌদ্ধ বন্ধু কহিলেন—"মনুষ্যের অব্যাহত প্রবল ইচ্ছা দ্বারা অসীম ক্ষমতা লাভ হইতে পারে।

অসামান্য অধ্যবসায় ও প্রবল ইচ্ছায় একটি বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা অধিক কি ঐশি শক্তি লাভ হওয়াও বিচিত্র নহে। সম্প্রতি সিদ্ধাশ্রম হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তিনি যে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহা সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য।

চিন্তামণি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাতের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পরদিবস মধ্যাহ্নে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ, পরিধান ত্রকমাত্র কৌপিন—বাম বাহু উন্নত। তিনি ভীষণ যন্ত্রণা উপেক্ষা করতঃ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নিবিড় অরণ্যে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। মনের একাগ্রতা ও ইচ্ছার দুর্দ্দমনীয়তা সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। ঊর্দ্ধ বাহুখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, একবারে অনমনীয় হইয়া পড়িয়াছে, মুষ্টিবদ্ধ থাকায় কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ পাণিতল ভেদ করিয়া পাণিপৃষ্ঠে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সম্ভবতঃ তিনি ভীষণ যন্ত্রণানুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ সম্প্রদায়িকগণ বলেন যে, ইচ্ছার দুর্দ্দমনীয়তা প্রভাবে দেহের উপর মনের এতই ক্ষমতা বিস্তার করা যায় যে, একার্য্যে তাঁহাদের অল্পই ক্লেশানুভব হইয়া থাকে।

যোগীগণ এই ইচ্ছা শক্তিকেই কুহক বা ভেল্কী এবং গুপ্ত বিদ্যার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে, ইচ্ছার সৃষ্টি, জড় ইচ্ছানুবর্ত্তী—জড় মনের দাস, সুতরাং তাহার আদেশ পালনে বাধ্য।

চিন্তামণি আমেরিকা ভ্রমণকালে ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত এক প্রকার বৃক্ষের কয়েকটি বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই বীজে বৃক্ষোৎপাদন করাইবার জন্য প্রাতঃকালে স্বহস্তে একটি মাটির গামলা মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া হাতার মধ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধবাহু আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া গামলা দেখাইয়া বলিলেন "এই গামলায় আমি একটি বীজ বপন করিব, আপনাকে সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দেখাইতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে গামলার মৃত্তিকা ঢালিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পুনরায় গামলা পূর্ণ করিলেন ও কিছুদূর পশ্চাতে গিয়া বলিলেন—

"আপনার অভিমত বীজ রোপণ করুন।"

ঊর্দ্ধবাহু দেখিতে না পান এইভাবে তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিয়া, চিন্তামণি

বীজটি মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে স্থাপনানন্তর মৃত্তিকা আবৃত করিয়া বলিলেন—"হইয়াছে।"

ঊর্দ্ধ। "উহাতে একটি কাটি পুতিতে হইবে এবং কাটির সহিত সমুদয় গামলা ঢাকা পড়ে এইরূপ একখানি কাপড় দিয়া ঢাকিতে হইবে।"

চিন্তামণির আদেশক্রমে তাঁহার একজন অনুচর তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলে, ঊর্দ্ধবাহু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আপনারা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবেন, না নড়িয়া থাকিতে পারিলে আরও ভাল—বিশেষ আমার আদেশ ব্যতীত গামলা স্পর্শ করিবেন না।"

চিন্তা। "আপনার আজ্ঞামতই কার্য্য হইবে।"

তখন তিনজনে পরস্পর দুই হস্ত ব্যবধানে দাঁড়াইলেন; ঊর্দ্ধবাহু, আবৃত গামলায় স্থির দৃষ্টি রাখিয়া একমনে চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার শরীর মৃদু উচ্চারিত মন্ত্রের তালে তালে দুলিতে লাগিল, তিনি দক্ষিণ হস্ত বক্ষস্থলে স্থাপন করিলেন। পাদ্রি ও তাঁহার অনুচর মনোযোগ সহকারে তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্তানুযায়ী একজন কুহকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, অন্যজন গামলাটি দেখিতে লাগিলেন।

ঊর্দ্ধবাহু একদণ্ড কাল সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার চক্ষুর্জ্যোতি হ্রাস হইয়া আসিল—বহির্দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল—বাহ্যজ্ঞানশূন্যবৎ অনুমান হইল। প্রায় দুইদণ্ড মধ্যে তিনি এককালীন নিস্পন্দ হইয়া গেলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় মৃত ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হয় তিনি মৃত, না হয় মৃতবৎ মূর্চ্ছিত। তখনও চিন্তামণিও তাঁহার অনুচর বিশেষ মনোযোগে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন সময় উপস্থিত প্রায়। দর্শকদ্বয় একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, অবিলম্বে কার্য্য শেষ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তখন ঊর্দ্ধবাহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাদের মনে শান্তির উদয় হইল। কয়েক পল মধ্যে তাঁহার নেত্র পূর্ব্বভাব ধারণ করিল; তিনি হস্ত দ্বারা গামলা দেখাইয়া বলিলেন, "উন্মোচন কর।"

চিন্তামণি উদ্বিগ্ন চিত্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, যে জাতীয় বৃক্ষের বীজ রোপিত হইয়াছিল, অর্দ্ধহস্ত পরিমিত তজ্জাতীয় একটি চারা এবং তাহাতে তজ্জাতীয় একটি পুষ্প ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

"বীজটি বহুদিনের, উহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছিল, এজন্য এত বিলম্ব হইয়াছে,'" এই বলিয়া ঊর্দ্ধবাহু পাদ্রি সাহেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে, চিন্তামণি পাদ্রি তাঁহাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে গেলেন। ঊর্দ্ধবাহু ঈষৎ হাস্য সহকারে তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন দেখিয়া তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।

"আমি অর্থের নিমিত্ত একার্য্য করি নাই, আমার অন্য মহৎ উদ্দেশ্য আছে। আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন আপনি মনুষ্যের বিশেষ হিতসাধনার্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ দাস পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" এই বলিয়া ঊর্দ্ধবাহু তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ গমনোন্মুখ হইলেন, চিন্তামণি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"যেরূপ দেখিলাম, সেই অসাধারণ ক্ষমতাসম্বন্ধে আপনার সহিত কিছু আলাপ করিবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।

"কল্য বৈকালে আবার আসিব।" এই বলিয়া নমস্কার পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণের সেই অনন্য সাধারণ কার্য্য দর্শন করিয়া চিন্তামণির মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু শয়ন করিলেন না। একখানি চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক বক্ষস্থলে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোচনার নিমিত্ত তাঁহার এত গর্ব্ব, সেই বিজ্ঞানই সেই দিনের পত্যক্ষীভূত কার্য্যের নিকট একেবারে নগণ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাপেক্ষা একটু উচ্চতর বৈজ্ঞানিক কৌশলক্রমে সৃষ্টির মহান্ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। অনেকবার যুক্তি দ্বারা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং অজ্ঞানতাবশতঃ মানব সেই সামঞ্জস্য বুঝিতে অক্ষম ইহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে কৃতবিদ্যও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান অভিজ্ঞতায় য়ুরোপীয় দর্শন শাস্ত্র তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহার চিত্ত এক নূতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইল। তিনি চিন্তার এক নূতন ক্ষেত্রপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু কিরূপে সেই ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে তাহার পন্থা স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন "আমার কি ভ্রম হইয়াছিল? এটা কি বাজিকরের চালাকি এবং মন হইতে

অপসারিত করিবার উপযুক্ত; অথবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ক্ষমতা বাস্তবিকই মনুষ্যে লাভ করিতে সমর্থ?"

ফলতঃ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার মনে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইল। মনে নানারূপ অসংলগ্ন চিন্তা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উদ্যমবিহীন হতাশপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন প্রতারকবৎ প্রতীয়মান দুই ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার বৈজ্ঞানিক মত পরাজিত, তাঁহার জীবনব্যাপী অধ্যয়নের মূল কুঠারাহত! তিনি সহসা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'না, না, আমি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি।"

আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তিনি, পুরোবর্ত্তী কণ্টকাবদ্ধ মস্তক যিশু খৃষ্ট মূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া সৎপথ প্রদর্শনার্থ তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।—"হে ঈশ্বর! হে জগৎপাতা! তোমার কিছুই অবিদিত নাই, তুমি আমার ভ্রম দূর কর, তোমার দাসের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়া হৃদয়ে একটু আলোক সঞ্চারিত কর, আমার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দেও, তোমার পবিত্র সত্য আমার নিকট প্রকাশিত কর, আমার হৃদয়কে শান্ত কর,—তোমার গুপ্ত পথ প্রদর্শন কর। তোমারই কার্য্য সম্পাদনার্থ আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি—আমাকে সেই কার্য্যের উপযুক্ত কর।"

মনোরমার নিকট হইতে দূরান্তর হওয়ার পর, তাঁহার মন আর কখনও এরূপ চঞ্চল হয় নাই। সরল হৃদয় ও সত্য প্রিয় বলিয়াই তাঁহার এত কষ্ট। তিনি ঈশ্বরকেই সত্য বলিয়া জানিতেন, সেই সত্য প্রচারই তাঁহার ব্রত, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান যথা সম্ভব লাভ করাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার নয়নবারি দুর্ব্বলের অশ্রুপাত নহে—আত্মার আনন্দাশ্রু দ্বারা অনন্ত দেবের চরণাভিষেক—সত্য জ্ঞান পিপাসু আত্মার হৃদয়ভেদী রোদন। তিনি উজ্জ্বল দিবালোকে বালককে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়াছেন, দণ্ডদ্বয় মধ্যে সপুষ্প বৃক্ষোৎপাদন করিতে দেখিয়াছেন। একজন বিজ্ঞানবিৎ, দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে দুইজন সামান্য লোকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া গেল ইহা তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সরল হৃদয় বলিয়াই, পূর্ব্বোক্ত অতিমানুষিক ঘটনায় তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল—তিনি তদ্বিষয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানদ্বারা

একটি মানসিক শক্তি উৎপন্ন হয়—কেহই সেই শক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে না। তিনি স্বীয় দর্শনশক্তি ও সাধারণ জ্ঞানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। খোলা মাঠের মধ্যে বাজিকর যে তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। মনে মনে প্রত্যক্ষীভূত কার্য্য বিশ্বাস করিলেন বটে কিন্তু বিশ্বাস করিতে মন ব্যাকুল হইল, শান্তি নষ্ট প্রায় হইল।

প্রার্থনায় মন শান্তভাব ধারণ করিল, তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলেন।

পরদিবস যথাসময়ে ঊর্দ্ধবাহু আগমন করিলেন ও অভ্যর্থিত হইয়া উপবেশনানন্তর, যেন চিন্তামণির চিন্তার বিষয় অবগত আছেন, এইভাবে কথারম্ভ করিলেন বলিলেন—"আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন, অনুগ্রহ লাভ করিবেন। আপনি উপবাস, নিরামিষ ভোজন, সৎচিন্তা, সত্যানুসন্ধিৎসা, বৈরাগ্যাবলম্বন, জীবনের পবিত্রতা ও জীবের উপকার করিবার অকপট ইচ্ছাদ্বারা আত্মাকে প্রকৃতির গূঢ় নিয়ম অবগত হইবার উপযোগী করিয়াছেন।"

চিন্তা। আজ্ঞা হাঁ, সত্য জ্ঞানলাভে আমার বড়ই আগ্রহ। কিন্তু গুপ্ত বিদ্যা কিরূপে লাভ হয়? বিজ্ঞান দ্বারা কি ইহার কিছুই স্থির হয় নাই?

ব্রাহ্মণ। "জড়বাদীগণের স্থূল বিজ্ঞানে ইহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। আপনি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু, আপনি অবশ্যই বুঝেন যে, মনোবিজ্ঞান বা দর্শন ও বিশ্বাস দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ হয়। স্থূল বিজ্ঞান পরাস্ত ও নিরস্ত হইলে বিশ্বাসের সূত্রপাত হয়। শাস্ত্রবিদ্ মাত্রেই স্বীকার করেন যে, বিশ্বাসেই তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি; সুতরাং যে নিয়মে জগৎ পরিচালিত তাহা জানিতে হইলেও বিশ্বাস আবশ্যক। কিন্তু তাহা কিরূপে লাভ হয় বা লাভার্থ কি পরিমাণ বিশ্বাস প্রয়োজন তাহা শাস্ত্রবেত্তাগণ বলিতে পারেন না।

চিন্তা। "এ কথা মিথ্যা নহে; কিন্তু আমাদিগের কাথলিক শাস্ত্র বিদ্যালয় সমূহে এই কথা প্রচার আছে যে, পোপের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আছে এবং তিনি অভ্রান্ত গুরু।"

ক্রমশঃ—

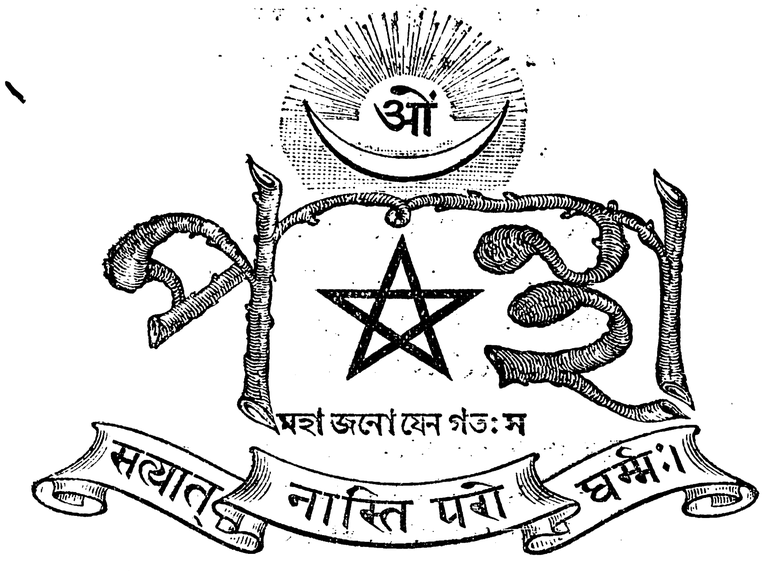

২য় ভাগ। শ্রাবণ, ১৩০৫। ৪র্থ সংখ্যা।

নূতন রাগিণী।

শুধুই গাহিতে গান, যদি গো জনম মম;
তবে দেবি, গানে মোর দাও সেই সুর;
যে সুরে মৃতের প্রাণে অমৃত লহরী বহে,
যে সুরে জড়ের করে অবসাদ দূর।—১।

মরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হ'য়ে যায় সহসা হীরক।
যে তীব্র উন্মত্ত সুর, তাড়িৎ সঞ্চারি দেয়
হৃদয় হইতে হৃদে,—ফেলিতে পলক।—২।

এমন করিয়া শুধু গতানুগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা বধুর
সহিতে করিয়া খেলা, জীবন, স্বপ্নের মত
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর।—৩।

আমি অগ্রসর হ'ব, সত্যের ধরিয়া হাত;
সূর্য্যের রশ্মির মত কিরণ যাহার।
নিখিল বিশ্বের সর্ব্ব, স্বচ্ছ মুকুরের সম;
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার। ৪।

ক্ষুদ্র যশ, অপযশ, থাকে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে;
—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া।
কেবলি আমার তরে, রেখোনা অস্তিত্ব মম;
—আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া। ৫।

ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম, দাও এক করি দেখি,
দাও যোগ করি দেবি, হৃদয়ের তার।
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরো দুখ, ওরো সুখ,
অনুভব করি যেন আত্মায় আমার। ৬।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

পৌরাণিক কথা।

দশবিধ সৃষ্টি।

সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত ভেদে দ্বিবিধ। যাহা ব্যাপক অর্থাৎ যাহা নানা-জীবে এককালে থাকিতে পারে যাহা দ্বারা জীবের প্রাকৃতিক অংশ সংগঠিত হয়,

এবং ইন্দ্রিয়শক্তি পরিচালিত হয় তাহাই প্রাকৃত সৃষ্টি। প্রাকৃত উপাদান সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব শরীর রচনা করে এবং প্রাকৃতদেব সকল জীবের ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধিনায়ক হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন জীবই বৈকৃত সৃষ্টি। যাহাকে প্রাকৃত বলা চলেনা, অথচ বৈকৃত বলা চলেনা, এইরূপ উভয়াত্মক সৃষ্টিকে কুমার সৃষ্টি বলে। সনৎকুমারাদি যে সকল কুমারের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, তাঁহারা আমাদের মত দেহাদি বিশিষ্ট নহেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকল স্থানে যাইতে পারেন এবং সকল দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তাঁহারা দেহদ্বারা অবিচ্ছিন্ন নহেন। ত্রিলোকীর কোন স্থান তাঁহাদের গতি অবরোধ করিতে পারেনা। তাঁহারা মৃত্যুর সীমার বহির্ভূত। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু যে সকল মানসিক বৃত্তি দ্বারা মনুষ্য পশু হইতে ভিন্ন তাঁহারা সেই সকল বৃত্তির সঞ্চার করেন। শ্রীধর স্বামী বলেন,—

"সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্য ইত্যর্থঃ"

(ভাঃ পুঃ ৩—১০—২৫ শ্লোকের টীকা)।

অর্থাৎ সনৎকুমার আদির সৃষ্টি প্রাকৃত এবং বৈকৃত উভয়ই বলা চলে, কারণ তাঁহারা দেবতাদিগের ন্যায় অপ্রতিহত গতি বিশিষ্ট অথচ মনুষ্য দিগের ন্যায় অন্তঃকরণ সম্পন্ন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অধোমুখ ও সত্ত্ব প্রধান। এবং তাঁহাদেরই শক্তি বলে আমরা বিশুদ্ধ চিত্ত লাভ করি।

প্রাকৃত সৃষ্টি ছয় প্রকার।

(১) মহত্তত্ত্ব।

(২) অহঙ্কার তত্ত্ব।

(৩) পঞ্চ তন্মাত্র।

(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়।

(৫) ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বৈকারিক দেবসকল এবং মন। বৈকারিক দেব সকলকেই অধিদেবতা বলে।

(৬) পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা, ইত্যাদি) এই সকল সৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বৈকৃত সৃষ্টি তিন প্রকার। ঊর্দ্ধস্রোতঃ, তির্য্যক্ স্রোতঃ এবং অর্ব্বাক্ স্রোতঃ।

(৭) ঊর্দ্ধস্রোতঃ। যাহাদের আহার ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হয় তাহাদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতঃ বলে। বৃক্ষ লতাদি ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে এবং সেই রস ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হয়।

"উৎস্রোতসস্তমঃ প্রায়াঃ অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ।" ৩—১০—২০

বৃক্ষাদি স্থাবর সৃষ্টি তমঃ প্রধান। ইহাদের জ্ঞান এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যে ইহারা বাহিরের কোন পদার্থকে জানিতে পারেনা। রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের গ্রহণ ইহারা করিতে পারেনা। কিন্তু ইহাদের স্পর্শ জ্ঞান আছে। সে স্পর্শজ্ঞানও অন্তর্নিহিত। ঊর্দ্ধস্রোতঃ সৃষ্টির মধ্যে নানা প্রকার ভেদ আছে।

(৮) তির্য্যক্‌স্রোতঃ। যাহারা আহার করিলে ভক্ষিত দ্রব্য বক্রভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে তির্য্যক্‌স্রোতঃ বলে। পশু, পক্ষীর শরীর কিছু না কিছু বক্র। তাহাদের খাদ্য মুখ হইতে পাকস্থলী প্রবেশ করিতে হইলে, কিছু না কিছু তির্য্যক্ ভাবে গমন করে।

"অবিদো ভূরি তমসো ঘ্রাণতো হৃদ্যবেদিনঃ।" ৩—১০—২১

পশু পক্ষীর কল্য কি হইবে, সে জ্ঞান থাকেনা। আহারাদিই তাহাদের এক মাত্র নিষ্ঠা। তাহাদের ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় প্রবল এবং ঘ্রাণ শক্তিদ্বারা তাহারা ইষ্ট অর্থ জানিতে পারে। তাহাদিগের হৃদয় বৃত্তি নাই। এই জন্য তাহারা দীর্ঘ অনুসন্ধান শূন্য।

(৯) অর্ব্বাক্ স্রোতঃ। যাহাদের আহার সঞ্চার নিম্নগামী তাহারাই অর্ব্বাক্ স্রোতঃ। এই নবম সৃষ্টি একবিধ। এই সৃষ্টিকেই মনুষ্য সৃষ্টি বলে।

"রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।" ৩—১০—২৪

মনুষ্য রজোগুণ প্রধান, কর্ম্মপরায়ণ এবং বাস্তবিক দুঃখ প্রদ বিষয়কে সুখময় মনে করিয়া থাকে।

(১০) দশম সৃষ্টি সত্ত্বপ্রধান কুমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

লাঙ্গুল লইয়া কিম্বা মস্তিষ্কের পরিমাণ লইয়া মনুষ্য ও পশুর বাস্তবিক ভেদ নহে। এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর হইলেও তাহারা চৈতন্য বিহীন নহে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ লইয়াই জীবের প্রকৃত ভেদ। তমোগুণ দ্বারা যাহাদের চৈতন্য প্রভৃত পরিমাণে আবৃত হয় তাহাদিগকে স্থাবর জীব বলে। যাহাদিগের

জ্ঞান শক্তি তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইলেও, যাহারা বাহ্য পদার্থের গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগকে পশু পক্ষী বলে। মনুষ্য রজোগুণ প্রধান। রজোগুণ প্রশমিত হইলে, মনুষ্য কুমার পদবী লাভ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বৈকারিক দেবগণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ত্রিলোকীমধ্যে অন্যান্য দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন। বিকৃত দেবসৃষ্টি অষ্ট বিধ।

স্বর্গলোকবাসী বিবুধগণ, অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, এবং অসুরগণ এই তিন এক জাতীয় দেবতা। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা চতুর্থ। যক্ষ ও রাক্ষস পঞ্চম। ভূত, প্রেত ও পিশাচ ষষ্ঠ। সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর সপ্তম। কিন্নরাদি অষ্টম।

দেব সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া, বিকৃতদেবগণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

"অয়ন্তু ততোন্যূনত্বাৎ বৈকৃতঃ। দেবসর্গত্বাৎ তদন্তর্ভূতশ্চ।"

প্রাকৃত দেব অপেক্ষা এই সকল দেব ন্যূন শক্তি সম্পন্ন। এই জন্য ইহাদিগকে বিকৃত দেব বলা যায়। কিন্তু দেবতা বলিয়া প্রাকৃত দেব সৃষ্টির অন্তর্ভূত।

ত্রিলোকী বাসী অন্যান্য জীব যেমন, প্রতি কল্পে ত্রিলোকীর মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং তাহাদের ক্রমিক উন্নতি যেমন ত্রিলোকী মধ্যে সংসাধিত হয়, যেমন তাহারা ত্রিলোকীর মধ্যেই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা লাভ করে, দেবগণ সেইরূপ সপ্তলোক মধ্যে আপন আপন ক্রমিক উন্নতি লাভ করে। এমন অনেক দেবতা আছে, যাহাদের ত্রিলোকী বাসী জীবগণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অনেক দেবতা আছে, যাহাদের উপর মনুষ্যগণ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে এবং অনেক মনুষ্য কর্ম্মবলে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে। ভগবান্ ব্যাস বলেন,—

"ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
নচৈতদিষ্টং দেবানাং মর্ত্ত্যৈ রূপরিবর্ত্তনম্॥"

অনুগীতা।

অনেক দেবতা আছে যাহারা মনুষ্যের পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তাহারা মনুষ্য দিগকে আপনার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করে।

"তস্মাদেষাং তন্নপ্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ"।

বৃঃ আঃ ১—৪—১০।

এই জন্য তাহারা চায়না যে মনুষ্য আত্মবিদ্যা লাভ করে। সন্তুষ্ট হইলে তাহারা মনুষ্যের নানারূপ উপকার করে; এবং আপনার ভক্তদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করে,—

"নদেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশু পালবৎ।
যংহি রক্ষিতু মিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্॥"

যেমন পশুপাল দণ্ড গ্রহণ করিয়া পশুগণকে রক্ষা করে, দেবতারা সেই রূপ দণ্ডগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন না। তাঁহারা যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এইরূপ বুদ্ধি সংযুক্ত করেন, যে সেই বুদ্ধি দ্বারা সে ইষ্ট লাভ করিতে পারে।

সপ্তলোকের মধ্যে যে লোকে দেবতাগণ, যে নামে অভিহিত হন, এবং যে লোকে তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব ও শক্তি হয়, পতঞ্জলি সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে তাহা বিবৃত রহিয়াছে।

"ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমনাৎ॥" বিভূতি পাদ ২৫॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, ব্যাসদেব ভুবন বর্ণন করিতে গিয়া, দেবতা দিগের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

স্বামীজির ভোজন।

স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীজি ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ কি কি?

স্বামীজি উত্তর দিলেন, ধর্ম্মের অঙ্গ কি তাহা শুনিতে চাও তবে বলি শুন। বেশ ধপ্‌ধপে সুগন্ধি আতপ তণ্ডুলের অন্ন, ঘ্রাণ মনোরম দানাদার গব্য ঘৃত, আলুভাতে, পলতার ডালনা, মোচার ঘণ্ট, সোনামুগের ডাল, কিছু আলু পটল ভাজা, একটা চড়চড়ি, এঁচোড়ের দালনা, চিনিপাতা কিঞ্চিৎ দধি, খান দুই

রাঙ্গাবী সন্দেশ, সরু পুরানধানের চিঁড়ের পরমান্ন, একটু ক্ষীর, গোটাদুই নেংড়া আম, দুখানা পাটাসাপটা পিটে, আর এক গেলাস কর্পূর বাসিত জল; এই হল ধর্ম্মের অঙ্গ।

আমি রাগ করিয়া বলিলাম যে. আমি সত্য সত্য উপদেশ চাহিলাম তুমি কিনা এখন তামাসা আরম্ভ করিলে?

স্বামীজি। যাহা বলিলাম তাহা বুঝি তোমার পছন্দ হইল না; তবে আর এক রকম বলি শুন। ভাল সুগন্ধি চালের পোলাও, নধর কৃষ্ণকায় ছাগ মাংসের ঝোল, গোটাকত মাংসের চপ, খান দুই কট্‌লেট্, খানকত মাছভাজা, এক টম্বলার স্যাম্পেন মদ্য এও হল ধর্ম্মের অঙ্গ।

আমি। হয়েছে, ধর্ম্মের অঙ্গ খুব শুনেছি, আর বলতে হবে না।

স্বামীজি। এও বুঝি পছন্দ হল না; তবে এই পান্তা ভাত, লোনা ইলিশের অম্বল, খোসাছাড়ান কুঁচো চিংড়ি ভাজা, টক দধি (একটু লবন অবশ্যই দিতে হবে), আর এক বাটি আমানি; এও হল ধর্ম্মের অঙ্গ।

আমি। আমি এইবারে উঠে চল্লেম; এই বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, স্বামীজি ধরিয়া বসাইলেন ও বলিলেন বোস্, মূর্খ বোস্; আমি কি কেবলই উপহাস করিতেছি তাহা নহে। ধর্ম্মের রহস্য বুঝিবার আগে অন্নের রহস্য বোঝ। দেব ভোগ্য দ্রব্য দেবোদ্দেশে ত্যাগ করার নামই ধর্ম্ম কর্ম্ম ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

"ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।"

এই বিসর্গ শব্দের অর্থ টীকাকারগণ বলেন দেবোদ্দেশে ত্যাগ। এখন দেখ কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হল দুইটি; প্রথম দেবভোগ্য পদার্থ, দ্বিতীয় সেই পদার্থের ভোক্তা দেবতা। ভোগ্য পদার্থ অর্থাৎ অন্ন এবং এই অন্ন যিনি ভোগ করেন অর্থাৎ অত্তা, এই উভয়ের সংযোগ সংঘটনই সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। উপনিষদ বলেন যে, প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া মিথুন উৎপাদন করিলেন, অন্ন ও অত্তা সেই মিথুন। এই মিথুনের মিলন হইতেই সৃষ্টি চক্র ঘুরিতেছে। এই মৈথুন তত্ত্ব যবে বুঝিতে পারিবে তবে ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইবে।

গুন ভেদে অন্নের ভেদ ত্রিবিধ, যথা. সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এবং

অন্তারও ভেদ ঐরূপ ত্রিবিধ। সেই জন্যই তোমার কথার উত্তরে প্রথমে একটু রঙ্গচ্ছলে স্বাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকারের স্থূল অন্নের কথার উত্থাপন করিয়াছি।

আমি। স্থূল অন্ন কথাটি কি অর্থে প্রয়োগ করিলে বল?

স্বামীজি। যে অন্নে স্থূলদেহের ক্ষুধার শান্তি হয় উহাকে স্থূল অন্ন বলিতেছি। যখন সমস্ত ভোগ্য বিষয়ই অন্ন শব্দ বাচ্য, তখন যে সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থ পুরুষের সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীরের ক্ষুধার শান্তি করে, তাহারাও অন্ন শব্দ বাচ্য। শুধু অন্নের কথা কহিয়া আমার এখন ক্ষুধার শান্তি হইবে না; চল এখন তোমাদের বাড়ী যাই, তোমার গৃহিনী ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন; আমি আজ তিন দিন উপবাসী।

আমি। তিন দিন উপবাসী! কেন স্বামীজি আমার বাড়ীতে কি তোমার দুইটা অন্ন জুটিত না। ওঠ তবে, শীঘ্র ওঠ। তোমাকে যতক্ষণ না খাওয়াইতেছি ততক্ষণ সুস্থির হইতে পারিতেছি না।

স্বামীজি ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর দিলেন না।

উভয়ে বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। স্বামীজির সহিত আমার স্ত্রী কথা কহিয়া থাকেন। আমরা উভয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমার স্ত্রী উঠানে বসিয়া আল্‌তা পরিতেছিলেন; তাঁহার আল্‌তা পরা শেষ হইয়াছে এমন সময়ে আমরা সেই খানে উপস্থিত হইলাম। স্ত্রী একটু শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন ও মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন। স্বামীজি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার স্ত্রীর পদতলে নমস্কার করিলেন ও বলিলেন মায়ের আল্‌তা পরা পায়ে নমস্কার; ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। আমি পাগলের রকম দেখিয়া বলিলাম কি কর ঠাকুর, ওযে তোমার চেয়ে ঢের ছোট।

স্বামীজির চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। গদ গদ স্বরে বলিলেন

ওঁ সর্ব্বভূতস্থাং বিদ্মহে ভক্তিনীরদাং ধীমহি
তন্নো সতী প্রচোদয়াৎ।

আমার দেবতা সর্ব্বভূতস্থা; বিশেষতঃ তিনি উমারূপে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বিরাজ করেন, সতী স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁহার তেজের আধার; আজি আমি নমস্কার দ্বারা আমার ললাট নিঃসৃত চান্দ্ররস, উমা মার উদ্দেশে, সতীর

অনুক্তরঞ্জিত পরিবেষ্টিত অগ্নিসম তেজে আহুতি প্রদান করিলাম। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এই নমস্কার যজ্ঞ যে শিখিয়াছে সেই ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে পারিবে।

স্বামীজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আমার স্ত্রী স্বামীজির পদতলে নমস্কার করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন,"সাবিত্রী সহশীভব।"

আমি গৃহিনীকে বলিলাম স্বামীজি আজি তিন দিন কিছু খান নাই, শীঘ্র উহাঁকে কিছু খাইতে দাও। গৃহিনী দ্রুতপদ গমনে গৃহে প্রবেশ করিয়া, কিছু খাদ্য আনিতে গেলেন, আমরা উঠান হইতে শয়নগৃহে আসিয়া বসিলাম। গৃহিনী কিছুক্ষণ পরেই সেইখানে ফিরিয়া আসিলেন; চক্ষু দুটি জলে পূর্ণ; বড় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন ওগো ঘরে খাবার যে কিছুই নাই; আমি শীঘ্র ভাত রাঁধিয়া আনিতেছি।

স্বামীজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তোমার গৃহিনীর চক্ষে এই যে জল দেখিতেছ ইহাই ধর্ম্মকর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ। ক্ষুধিতকে অন্নদান করিবার জন্য ব্যাকুলতা যাঁহার জন্মে নাই তিনি ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে পারিবেন না।

গৃহিনী পাকশালাতে গমন করিলেন। স্বামীজি বলিলেন গৃহিনীকে রোজ নমস্কার করিস্।

আমি। এই আবার পাগলামি আরম্ভ হইল।

স্বামীজি। মূর্খ, স্বামী যেরূপ স্ত্রীর গুরু, স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীর গুরু; পরস্পর পরস্পরকে ভক্তি করিতে না শিখিলে কামের পীড়ন হইতে উদ্ধার পাইবে না।

আমি। আমি এখন আর তোমাকে বকাইব না।

স্বামীজি। তবে একখানা আসন দাও, আমি জপ করি।

স্বামীজিকে আসন দিলাম; তিনি আসনে উপবেশন করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। আমিও নিকটে একখানি আসন লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক মধ্যে গৃহিনী একটি থালে করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনিলেন এবং স্বামীজির সমক্ষে রাখিলেন। স্বামীজি বলিলেন যে "মা আজি তুমি কাছে বসে আমাকে খাওয়াও। একখানি আসন আনিয়া স্বামীর বামপার্শে উপবেশন কর"। স্বামীজির উপদেশ মত আমরা তিনজনে এরূপ ভাবে উপ-

বেশন করিলাম যে, আমাদের আসনগুলির মধ্যস্থল সব যোগ করিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ হয়। মধ্যে অন্নের থালা রহিল। স্বামীজি তখন এক গণ্ডুষজল লইয়া অনেকক্ষণ সেই দৃষ্টে চাহিয়া একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে আমাদের সকলকে বেষ্টন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। পরে আবার এক গণ্ডুষ জল লইয়া অন্নের দিকে কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে চাহিয়া মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল গৃহিনীর বাম হস্তে অর্পণ করিলেন; উহার পর আবার এক গণ্ডুষ জল লইয়া ঐরূপ মন্ত্রপূত করিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করিলেন। আর এক গণ্ডুষ জল ঐরূপ মন্ত্রপূত করিয়া নিজের হস্তে রাখিলেন; পরে তাঁহার উপদেশ মত আমরা তিন জনেই একসঙ্গে, ভগবতী স্মরণ করিয়া আপন আপন হস্তস্থিত জলগণ্ডুষ অন্নের উপর দিলাম। স্বামীজি বলিলেন—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা।" ওঁ।

স্বামীজি যখন মন্ত্রপূত জল আমার হস্তে দেন তখন আমার বোধ হইল যেন একটা তাড়িৎশক্তি আমার শরীরে প্রবেশ করিল; আমার স্ত্রীও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। স্বামীজি যখন অন্নের উপর জল দিয়া অন্ন নিবেদন করিলেন তখন আমার ঠিক্ বোধ হইল যেন তিনটি তড়িন্ময় রশ্মি তিন জনের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্নের উপর পড়িল এবং ঠিক শুনিতে পাইলাম যে একটী ধ্বনি হইল "ওঁ"।

স্বামীজি বলিলেন "মা, কেই বা খায় আর কেই বা খাওয়ায় আজি অনন্তরামকে দেখাও" এই বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা স্ত্রীপুরুষে উভয়ে এক দৃষ্টে স্বামীজির ভোজন দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু শরীর অল্পক্ষণ মধ্যেই কেমন আসন্ন হইয়া পড়িল; যেন বড়ই ঘুম আসিতে লাগিল; চক্ষু বুজিলাম ক্ষণ কাল মধ্যেই বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম। চকিতের ন্যায় এক দৃশ্য দেখিলাম; এক পর্ব্বতের উপর একটি মন্দির, সেই মন্দিরে আমি ও আমার স্ত্রী রহিয়াছি; এতক্ষণ যে অন্ন ব্যঞ্জন বাহিরে দেখিতেছিলাম দেখি সেই অন্ন ব্যঞ্জন আমার স্ত্রীর সমক্ষে রহিয়াছে; তিনি উহা এক এক গ্রাস করিয়া ভোজন করিতেছেন ও এক একটি ওঁকার ধ্বনি হইতেছে, আমার তখন মনে হইতেছে যে ইনি দুর্গা আমার স্ত্রীর আকার ধরিয়া আমাকে দেখা

দিয়াছেন; তখন আমি তাহার পদদ্বয় হৃদয়ে ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম—শিবোহ'। এই শব্দটি আমি প্রকৃতই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়া উঠিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। চক্ষু চাহিয়া দেখি স্বামীজি ভোজন সমাপনান্তে গণ্ডুষ করিতেছেন।

আমার স্ত্রী সেই সময়ে আমাকে বলিলেন যে দেখ আমি দেখিয়াছি যে ভগবতী এই অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন এস আমরা প্রসাদ ভোজন করি। আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; স্ত্রীর চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে, তিনি স্বামীজির ভুক্তাবশেষ অন্ন এক গ্রাস উঠাইয়া আমার মুখে দিলেন, আমিও এক গ্রাস অন্ন উঠাইয়া তাহার মুখে দিলাম; স্বামীজির চক্ষে জল বাহিতেছে আমারও চক্ষে জলধারা বহিতেছে; স্বামীজি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এক অঙ্কে আমাকে উঠাইয়া এবং অপর অঙ্কে আমার স্ত্রীকে উঠাইয়া লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ মধুর স্বরে এই গান গাহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া উভয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলাম। স্বামীজি স্নেহসহকারে আমাদিগকে উঠাইলেন ও বলিলেন বৎস, মা ইহার নাম সংসারধর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া ক্ষুধিতের ক্ষুধা শান্তি উদ্দেশে অন্ন দান কর; স্বয়ং ভগবতী অন্নপূর্ণা অন্ন প্রসবিতা এবং তিনিই যাবতীয় অন্নের গ্রহীতা; তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া, আজি যে যজ্ঞ করিলে এই যজ্ঞে আমার এই দেহ কেবল ভোজন পাত্র মাত্র। উভয়ে মিলিত হইয়া পৃথিবী হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া ভগবতীর উদ্দেশে সৎপাত্রে অন্ন দান করাই প্রকৃত সংসার ধর্ম্ম। করণ দ্বারা সংগৃহীত পদার্থ, সৎপাত্ররূপ বহ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবার পর ইন্দ্রিয় সকল যখন শান্তভাব ধারণ করে, তখন অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হয়, সেই অবস্থায় জীব বুঝিতে পারেন যে প্রকৃতির ষড়বিধ শক্তি দ্বারাই জগতের যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, এই ষড়বিধ শক্তিই প্রকৃতির ক্রিয়ার ষট্‌কারক; জীব স্বয়ং প্রকৃতির অন্ন প্রসব ও অন্ন ভোজনরূপ ক্রিয়ার দ্রষ্টামাত্র। এই জ্ঞান হইতেই জীবের ভোগের শান্তি হয়। বৎস অদ্য তোমার স্ত্রী আমার ক্ষুধাগ্নিতে আহুতি দিয়া যে যজ্ঞ করিলেন এই ক্রিয়ার কর্ত্তা তোমার স্ত্রী, অন্ন কর্ম্ম, তোমার ইন্দ্রিয়গণ পৃথিবী হইতে এই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছে, তুমি এই ক্রিয়ার করণ, পৃথিবী অপাদান এবং ক্ষুধাগ্নির কুণ্ডস্বরূপ আমার এই দেহ

অধিকরণ কারক ; পৃথিবীর অধিষ্টাত্রী দেবী উমা সম্প্রদান কারক। তোমা দ্বারা সংগৃহীত অন্ন কর্ত্রী যখন আধারে নিহিত করিয়া শান্ত হইলেন তখন তুমি কি দেখিয়াছ স্মরণ কর ; শিবোহং এই জ্ঞান তোমার তখন উদয় হইয়াছিল, তখন তুমি বুঝিয়াছ যে প্রকৃত পক্ষে তুমি এই ক্রিয়ার কোন কারক নহ, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ শিবস্বরূপ। ইহার নাম আত্মজ্ঞান।

ক্রিয়ার ষট্‌কারক এবং ক্রিয়ার সাক্ষী পুরুষ এই সপ্ততত্ত্বের রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই পরম গুরু ভগবান মহাদেব, যিনি আমাকে এই সপ্ত তত্ত্ব চিন্তায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে বারবার নমস্কার করি ; আর মা, যে পরমাশক্তি আজি স্নেহরূপে তোমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমাকে আজিকার যজ্ঞের কর্ত্রী করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি; বৎস, যিনি তোমাতে অর্জ্জন স্পৃহা রূপে আবির্ভূতা হইয়া তোমার ইন্দ্রিয়গণকে অন্ন সংগ্রহের করণ করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি ; যিনি ক্ষুধারূপে আমার দেহে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে যজ্ঞপাত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি ; যিনি উর্ব্বরতা শক্তি রূপে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিতা হইয়া শস্য প্রসব করিতেছেন সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি ; যিনি সর্ব্বযজ্ঞের ফল গ্রাহিকা শক্তি রূপে দেব তনুতে অধিষ্ঠিতা হইয়া যজ্ঞ ভোগ করেন, সম্প্রদানরূপী সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি, আর যিনি কর্ম্ম স্বরূপে অন্নে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্নের পরিণামচক্র ঘুরাইতেছেন, সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি। বৎস, বৎসে, এই যে বিভিন্নরূপ শক্তির কথা বলিলাম সমস্তই একের শক্তি। একই আধারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া এক চেতনকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ করিতেছেন। সেই এক চেতন পুরুষ কে জান?

তৎ ত্বমসি

ওঁ

এই বলিয়া স্বামীজি উঠিলেন ; আমাদের উভয়ের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন যে "আশীর্ব্বাদ করি যে তোমাদের আজিকার এই যজ্ঞ জীবের মঙ্গলদায়ক হউক। ওঁ তৎ সৎ"।

শ্রীঅমলরাম।

আমাদিগের যোগশক্তি।

ইংরাজি মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের উত্তরে তির্ব্বত বলিয়া একটি দেশ আছে। ঐ দেশ সম্বন্ধে এদেশের লোকের বিশেষ কিছু জানা নাই। দুই এক জন সাহেব পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে যাহা জানা যায় তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যাহাকে এখন তির্ব্বত বলা যায়, পূর্ব্বে তাহা আমাদের দেশের অন্তর্গত ছিল। এখনও সন্ন্যাসী পরিব্রাজকেরা তাহাকে উত্তরাখণ্ড বলিয়া অভিহিত করেন। ভারতের দক্ষিনাংশ দাক্ষিনাত্য এবং উত্তর পার্ব্বত্যপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড নামে অভিহিত ছিল। তির্ব্বত ইহার অন্তর্গত। মধ্যাংশ গঙ্গা যমুনা উপত্যকা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন তির্ব্বত দেশ সম্পূর্ণ বিদেশ হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইলে তির্ব্বতদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তির্ব্বতের প্রধান স্থান হ্লাসা নগরে উক্ত ধর্ম্মের প্রধান মঠ স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে তির্ব্বতে লামা বলে। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও যোগপথাবলম্বী। লামাদিগের যোগশক্তি বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায়। লামা মাত্রেই যোগী নহে, যেমন ভারতবর্ষে গৈরিক কমণ্ডলুধারী মাত্রেই প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তবে প্রকৃত যোগী লামা অনেক আছেন। এই শ্রেণীর একজন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে দারজিলিং গিয়াছিলাম। সেখানে আমার কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া দেখিলাম তাঁহার একটি পুত্র হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং তিনি তাহার চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত এবং চিন্তাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে সেই সময় একজন বৌদ্ধ লামা মাসাবধি বাস করিতেছেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রকোষ্ঠের বাহিরে প্রায়ই দেখা যাইত না ; সর্ব্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল কিন্তু তিনি কাহারও সহিত

সাক্ষাত করেন না শুনিয়া দর্শনের অভিলাষ সম্বরণ করিলাম। আমি নিরস্ত হইলাম বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাক্ষাত হইল। তিনি সেই সময় নিজ কুটির ত্যাগ করিয়া বন্ধুর নিকটে আসিয়া কি কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে শুনিলাম তিনি বন্ধুকে বলিতেছিলেন "তোমার পুত্র এমন কঠিন আঘাত পাইয়াছে অথচ তুমি আমাকে সম্বাদ দাও নাই কেন"। বন্ধু উত্তরে বলিলেন তিনি যে কৃপা করিয়া আরোগ্য করিয়া দিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। ইহার পর আরও কি কথোপকথন হইলে পর উভয়েই বাটীর ভিতরে গেলেন, আমি বাহিরে রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই বন্ধু বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন "ওহে লামা ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে; এক কড়া আগুণ করিয়া কয়েকটা লোহার শিক তাহাতে পোড়াইতে দিয়াছে। ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি? তুমি ও আইস।" আমার যাওয়ার সম্বন্ধে একবার লামার অনুমতি লওয়া আবশ্যক হইল। অনুমতি পাইয়া আমি বন্ধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া দেখি একটা প্রকাণ্ড কড়ায় আগুণ জ্বালাইয়া কতকগুলি লোহার শিক ছুরির ফলা এবং অন্যান্য লৌহখণ্ড উত্তপ্ত করা হইতেছে; লামা গম্ভীর ভাবে বালকের মস্তকের নিকট বসিয়া জপ করিতেছেন এবং বালক শয়ন করিয়া আছে। কিছুকাল জপ করিয়া লামা সেই উত্যপ্ত অগ্নিমূর্ত্তি লৌহখণ্ড গুলি একে একে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া জিহ্বাদ্বারা চাটিতে আরম্ভ করিলেন। কি ভয়ানক ব্যাপার! এক বার চাটেন এবং কি মন্ত্র পড়িয়া বালকের ক্ষত স্থানে ফুৎকার দিতে থাকেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টাকাল হইল অথচ লামার জিহ্বা কিছুমাত্র বিকৃত বা সঙ্কুচিত হইল না। আমি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরদিন এই গল্প সহরে রাষ্ট্র হইলে অনেকেই দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সেই সময়ে দারর্জ্জিলিঙ্গে একজন বাঙ্গালী উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তিনিও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বন্ধুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি কিছু ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন, এমন কি তাঁহার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সাহেবী ধরণের ছিল। এসকল বিষয়ে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। লামা প্রথমে তাঁহাকে দেখাইতে রাজি হন না, বলেন উনি পিলিং অর্থাৎ ইউরোপীয়। (তির্ব্বত দেশে ইউরোপীয়দিগকে পিলি বলে)। আমরা বলিলাম তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান, ইউরোপীয় নন। লামা বলিলেন তোমরা জান না উনি

ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও উহার হৃদয় পর্য্যন্ত পিলিং হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এরূপ বাক্‌বিতণ্ডার পর লামা অবশেষে সম্মত হইলেন এবং বাবুকে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় ঐ দিনেও লৌহখণ্ড গুলি উত্তপ্ত করিয়া অবলেহন করা হইল এবং ক্ষত স্থানে ফুৎকার দেওয়া হইল। বাবু অবাক্। বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন,

এ এক অপূর্ব্ব শক্তি তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও কোন রাসায়নিক দ্রব্য জিহ্বায় লাগাইয়া এইরূপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেও এক অপূর্ব্ব দ্রব্য যাহার সাহায্যে জিহ্বা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং ইউরোপীয়গণ যাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লামা বাহিরে আসিয়া দুই একটী মিষ্ট মিষ্ট কথায় বাবুকে ইউরোপীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। বলিলেন পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা যোগ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমি সুদূর মঙ্গোলিয়া দেশ হইতে ব্রাহ্মণ দিগের পবিত্র দেশ দেখিতে যাইতেছি আর তোমরা সেই ব্রাহ্মণদিগের সন্তান হইয়া ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া নাস্তিক হইয়া যাইতেছ, এ বড় লজ্জার কথা। দুই তিন দিন উক্ত প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা বন্ধুপুত্র আরোগ্য হইয়া গেলেন; আমাদেরও কৌতুহল নিবৃত্তি হইল। বলা বাহুল্য, তাহার পর হইতে উল্লিখিত রাজকর্ম্মচারী বাহিরে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর আর পিলিং ছিল না।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(তৃতীয় সংখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

ভয় নাইশব্দশুনিয়া কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু হৃদকম্প এখনও রহিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলাম, ক্রমে বল সাহসাদি সংগ্রহ করিতে করিতে মন স্থির হইয়া আসিল, একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম—গুহাটি পূর্ব্ববৎ গাম্ভীর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে মনে হইতে লাগিল নাজানি আরও কত ভয়ানক ভয়ানক পরীক্ষায় পড়িতে হইবেক। আরও

মনে হইল গুরুদেবের ও ইষ্টদেবের কৃপায় সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতেছি, তবে "আমি আমি" করিয়া কেন ভাবিয়া অস্থির হই—, যাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন, আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাই একাগ্রমনে করিব। তাঁহার আদেশ পালন করাই আমার কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া কর্ত্তব্য পালনে মন নিবেশ করিলাম। এইরূপ ভাবে কিয়ৎকাল গত হইলে সহসা গুহায় মনুষ্য পদ ধ্বনি শ্রুত হইল, চাহিয়া দেখি আমার সম্মুখে দুইখানি আসন, ও আসন দুইখানিতে দুইজন লোক উপবেশন করিলেন। দুই জনের মধ্যে একজনকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, তিনি আমার মন্ত্র দাতা ও অপরটি অনুমান করিয়া লইলাম আমার প্রকৃত গুরুদেব। আমি আনন্দে তাঁহাদের উভয়কে গাঢ় ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাছা তোমার কার্য্যে ও সাহসে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি, এখন তোমায় বর দিতে প্রস্তুত আছি, যাহা তোমার অভিরুচি হয় বর প্রার্থনা কর"। আমি কি বর প্রার্থনা করিব খুঁজিয়া পাইলাম না,—ভাবিতে লাগিলাম কি উত্তর দিব, অবশেষে বলিলাম,—দেব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কি এবং কোন্ বর প্রার্থনা করিব তাহাও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অতএব আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন" এই প্রকার বলিলে পর তাঁহারা আমায় বলিতে লাগিলেন দেখ,—"এ বিশ্ব জগতে যে সমস্ত জীব আছে তাহারা সকলেই দ্বন্দের জীব, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিয়া অধিককাল স্থায়ী হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, এই চেষ্টা করিতে হইলে গণপতির ও শক্তির সাধনা আবশ্যক, অতএব সিদ্ধি লাভে যত্নবতী হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য; তুমি এখন আমাদের নিকট হইতে গণপতি ও শক্তি মন্ত্র গ্রহণ কর, উঠিয়া আইস, মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সফল কামা হইয়া নিজেকে কৃতার্থ কর"।

আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, শক্তি সংগ্রহ আবশ্যক বটে, কিন্তু আমার পক্ষে শক্তি সংগ্রহ আবশ্যক কিনা, যে বিষয়ে আমার অভাব বোধ হয় না তাহা লইয়া আমি কি করিব, এই ভাবিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, আপনারা আমাকে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধি লাভে

যত্নবতী হইতে বলিতেছেন কিন্তু আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে সিদ্ধি লাভে আত্মসুখ হয় আর মত্ততা আসে, আরও ভাবিয়া দেখুন সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করা ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি গুলিকে দমন করা এবং ভোগ বিলাসে অনিচ্ছা ও উহা ত্যাগ করাই সাধনার প্রথম উপায় তখন আপনারা কেমন করিয়া আমাকে সেই বিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছেন, আর এক কথা যাহার সমুদ্র পারে যাওয়াই উদ্দেশ্য তাহার পক্ষে সমুদ্রের মধ্যস্থলে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনাদের অনুজ্ঞা অবহেলা করা আমার সাধ্য নাই, তবে কেমন করিয়া আপনাদের কথায় প্রত্যুত্তর করিতে সক্ষম হইলাম, আরও ভাবিতেছি যে কি আপনারা আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন; যখন আমি আপনাদের উপর আমার যাহা কিছু আছে তৎ সমুদায় অর্পণ করিয়াছি, তখন আপনাদের দ্বারা এরূপ পরীক্ষা সম্ভবে না। অতএব আমার চিত্ত বড় সংশয়াবিষ্ট হইয়াছে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সংশয় নিবারণার্থ হস্ত ধারণ করিয়া আসন হইতে উত্থিত করুন, নচেৎ আপনাদের কথা রক্ষা করিতে অক্ষম। আমার সমস্ত কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে সহসা আমার কর্ণে অভূতপূর্ব্ব অতি ভয়ানক বিকট ধ্বনি প্রবেশ করিল গুহায় যেন প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি শিখা লক্, লক্ করিয়া জিহ্বা প্রসারণ করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, আর অগ্নির আলোকে দেখিলাম যে,তাঁহারা সেই সৌম্য মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর বিভৎস্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এমন সময়ে একজন অপরকে বলিল যে ইহার কোন দ্রব্য আসনের বাহিরে আছে কি না অনুসন্ধান কর এই বলিয়া উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক গুহা তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু অবশেষে কোন দ্রব্য না পাইয়া "পদে পদে তোর অনিষ্ট করিব দেখ্‌বি, তখন আমাদের কথায় অবহেলায় কত মজা" বিকট অমানুষিক স্বরে এই কথা গুলি বলিয়া গুহা হইতে অপসৃত হইল। সেই সঙ্গেই গুহার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল; গুহাটি যেন অন্ধকারে ভরিয়া যাইল। আমি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ জড়বৎ বসিয়া রহিলাম। আমি আছি কি আমি ভাবছি ইত্যাদি সংজ্ঞা সুচক কোন বিষয়ানুভব করিতে পারি নাই—কি যেন কি এক প্রকার অবস্থা হইল—এইরূপ অবস্থায় যে আমি কতক্ষণ ছিলাম বলিতে

পারি না, যখন আমার অনুভব শক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন দেখিলাম গুহাটি পূর্ব্ববৎ অলোক অন্ধকার বর্জ্জিত শান্তিপ্রদ গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে, যেন মহাঝঞ্ঝাবাতের পর নিস্তব্ধ। মনে মনে ভাবিলাম যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে তবে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করি কেন। এই ভাবিয়া মন্ত্র জপ ও ধ্যানে মন নিবিষ্ট করিয়া দিলাম, কিয়ৎপরে এরূপ অনুমান হইল কে যেন আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, সহসা আমার শরীর মন, প্রাণ যেন তাড়িতশক্তি দ্বারা সঞ্চালিত হইল, অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি যে,সম্মুখে দুইটি দেব সম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন ; দেখিয়া গাঢ় ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলাম, কিন্তু পুনর্ব্বার প্রতারিত হইতেছি কি না এইরূপ সন্দেহ আমার মনে স্থান পাইল না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবার আমার স্থির বিশ্বাস হইল যে আমার মন্ত্রদাতা ও প্রকৃত গুরু কৃপা করিয়া দেখা দিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহারা বলিলেন বৎসে! যাহারা সরল বিশ্বাসে কার্য্য করে, ও গুরুর কার্য্যে সন্দেহ না করে ও গুরুর আদেশ কর্ত্তব্য জ্ঞানে পালন করে তাহাদের মঙ্গল হয়, সেইজন্য তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ ও ভবিষ্যতে সক্ষম হইবে, এরূপ আশা করা যায় এক্ষণে শিষ্য বলিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। যে পর্য্যন্ত লোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করে, সংশয়াবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির বিষয় জানিতে চেষ্টা না করে, শম দম উপরতি ও তিতীক্ষা এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ে সাধক না হয় ও নিত্যানিত্য বিচার করিতে না শিখে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত শিষ্য হইবার উপযুক্ত হয় না। তবে যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে, তাহারা যাহাতে সক্ষম হইতে পারে তজ্জন্য আমরা প্রকারান্তরে সহায়তা করিয়া থাকি”।

(ক্রমশঃ)

ওঁকার, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

আষাঢ় মাসের পন্থার ‘প্রণবের নানারূপ’ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম, এ, বি, এল; এক স্থলে লিখিয়াছেন ‘আমি চতুষ্পাদ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া অদ্বয় শিবমুদ্গর শাস্ত্র প্রপঞ্চোপশম চতুর্থ পাদে যাইবার অধিকারী নহি—আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি ওঁকার পাইবার অধিকার পাই নাই’। ওঁকারে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা বেদের কথা; স্ত্রী ও শূদ্র হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি বেদ, সুতরাং যদি কেহ বেদের ঐ কথা অমান্য করেন তবে হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান নহেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু বেদের ঐ কথার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা সাধারণে সম্যক্ বুঝেন না। ওঁকারে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই ইহাও সত্য কথা এবং স্ত্রী শূদ্র সহ সকলেরই ওঁকারে অধিকার আছে ইহাও সত্য কথা।

ওঁকার দ্বিবিধ, বৈদিক ও তান্ত্রিক। ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ অবগত হইয়া মন্ত্র সাধনা করিতে হয়। বৈদিক ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, তান্ত্রিক ওঁকারের ঋষি সদাশিব। ব্রহ্মা তাঁহার মুখ বিনির্গত ওঁকারে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার দেন নাই কিন্তু পরম কারুণিক উমাপতি মহেশ্বর তাঁহার মুখ নির্গত ওঁকারে সকল জাতিকেই অধিকার দিয়াছেন। বৈদিক ওঁকার অবলম্বনে বেদোক্ত ক্রিয়া সাধিত হয় এবং বেদোক্ত দেবতাগণের সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে ; অবশেষে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ওঁকারই যে ব্রহ্ম সেই জ্ঞান লাভ হয়। মহাদেব মুখ নিঃসৃত ওঁকার অবলম্বনে তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত মহাবিদ্যা রাজবিদ্যা বা শাম্ভবীবিদ্যা সাধিত হয় এবং এই শাম্ভবীবিদ্যা সাধককে শিবজ্ঞান বা অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। বৈদিক কর্ম্ম ও তান্ত্রিক কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন ; বৈদিক কর্ম্ম সৃজন ক্রিয়া ; তান্ত্রিক কর্ম্ম সংহার ক্রিয়া ; চিত্তের ব্যুত্থান শক্তিকে পর ব্রহ্মের পথে চালান বৈদিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, চিত্তের নিরোধ শক্তিকে (যাঁহার অপর নাম সংহারিণী শক্তি,) পরব্রহ্মের পথে চালান তান্ত্রিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। বৈদিক কর্ম্ম Expansion তান্ত্রিক কর্ম্ম contractior।

বৈদিক কর্ম্ম ও তান্ত্রিক কর্ম্ম যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ তাহা সকলেই জানেন; এই প্রভেদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মের মুল অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে ওঁকার উভয়বিধ কর্ম্মেরই আদি উহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ভিতর দিয়া আসিয়া যে আকার অর্থাৎ যে শক্তিযুক্ত হইয়াছে, সংহার কর্ত্তা বা উদ্ধার কর্ত্তার ভিতর দিয়া আসিয়া উহা অন্যবিধ শক্তিযুক্ত হইয়াছে বৈদিক ওঁকারের শক্তি, ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী; তান্ত্রিক ওঁকারের শক্তি, মহাদেবের উমা। সুতরাং বৈদিক ওঁকার ও তান্ত্রিক ওঁকার মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইহা বেশ বুঝা গেল।

এই পার্থক্য টুকু না বুঝায় আমাদের বড় ক্ষতি হইয়াছে। বুদ্ধদেব বেদোক্ত ক্রিয়া নিষেধ করিয়া, নিরোধ মার্গের ওঁকার, জাতি বিচার না করিয়া যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছেন সেই খানে দিয়া গিয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণ উভয়বিধ ওঁকারের ভেদ না বুঝিয়া বুদ্ধদেবের স্ত্রী শূদ্রকে ওঁকার মন্ত্রদান অশাস্ত্রীয় বুঝিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী হইয়া উঠেন; তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও জাত্যভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই সেই জন্য বুদ্ধদেবের শক্তি ভারতবর্ষ এতদিন গ্রহণ করিতে পারে নাই। শক্তিহীন হইয়াই ভারত আজি পরাধীন। ভারত আজি পরাধীন কথাটি মনে আসিলেই কান্না আসে। আমি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা পরাধীনতার কথা বলিতেছি না; ভারতবাসীর মানসিক ভাব সকল এখন আর ভারতবাসী চালায় না; যে ব্রাহ্মণগণের বাক্যদ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ চালিত হইত, সেই ব্রাহ্মণগণের কথা আর কেহই মানে না। গলায় উপবীত ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে ও গৃহস্থ তাড়াইয়া দিতেছে ভারতের এই দৃশ্য হৃদয় বিদারক। ব্রাহ্মণের আর আদর নাই—নাই কেন? তাঁহারাহীনবীর্য্য হইয়াছেন বলিয়া। কোনপাপে তাঁহারা হীনবীর্য্য হইয়াছেন?

জাত্যভিমান। আমরা জাতিভেদ মানি। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বীজগত পার্থক্য আছে মানি এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণের যে বৈদিককর্ম্মে অধিকার আছে শূদ্রের উহাতে অধিকার নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করি কিন্তু সে জন্য অভিমান কেন? ব্রাহ্মণ! তুমি নিজেকে বড় বলিয়া অভিমান করিয়াছিলে তাইত ভগবান তোমাদিগকে দেখাইতেছেন—ঐ দেখ ইংরেজ, সেত ব্রাহ্মণ নয় সে তোমাদের

অপেক্ষা বড় হইয়াছে; এখন তোমাদের কথা কেহ মানে না কিন্তু ম্যাক্সমূলর হক্সলি টিণ্ডল ইঁহাদের কথা সকলে মানিতেছে আর তোমরাও পেটের দায়ে তাহাদের পদানত হইয়াছ। ইংরাজ ত বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী নহে, এবং বৈদিক কর্ম্মও ত করে না, অথচ ইংরাজ এখন তোমাদের অপেক্ষা বড় সুতরাং বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী হইলেই বড় হয় না ইহা তোমরা এখন ভাল করিয়া বুঝ। ভগবান যে জাতিতে যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, সেই জাতি যদি তাহারই সম্যক্ পরিচালনা করে সেই জাতিই তেজস্বী হয় ইহাই বুঝাইবার জন্য দর্পহারী ভগবান তোমাদের দর্পচুর্ণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে ঐ তেজস্বী জাতির পদানত করিয়াছেন; তাঁহার রাজত্বে অবিচার নাই। যদি উদ্ধার হইতে চাও জাত্যভিমান ত্যাগ কর।

ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ত্যাগ করার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে; বেদে কথিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ওঁকারে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই, এই কথাটির কদর্থবাদই সেই মহা অন্তরায়। ওঁকার জীবের জীবনের লক্ষ্য—অমূল্য ধন, উহা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ পাইতে পারে না এই বিশ্বাস যতদিন ব্রাহ্মণের থাকিবে ততদিন তাহার অভিমান দূর হইবে না। লেখক জাতিতে ব্রাহ্মণ; আমি আমার নিজের জীবন আলোচনা করিয়া ইহা দেখিয়াছি যে যতদিন "ওঁকারে শূদ্রের অধিকার নাই" এই বিশ্বাস বলবান্ ছিল ততদিন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীর কোন লোকের মুখ হইতে ধর্ম্মের পবিত্র রহস্য সকল আগ্রহ সহকারে শুনার পরেও মনে এই কথা আসিত যে ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা বেশই বলিতেছেন কিন্তু পবিত্র ওঁকার রহস্য ইনি এজীবনে পাইবেন না এবং সেই সঙ্গে, আমার ওঁকারে অধিকার আছে ইহা ভাবিয়া, আমি যে তাঁহা অপেক্ষা বড় এই ভাবই মনে আসিত। ভিন্নজাতির ধর্ম্ম রহস্যবিৎ সাধককে যেরূপ শ্রদ্ধাদান উপযুক্ত, অহাঙ্কার বশে তাহা দিতে পারি নাই এবং প্রতিদানও পাই নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বুঝিয়াছি যে ব্রাহ্মী ওঁকার ও শাম্ভবী ওঁকার পৃথক্ এবং মহাদেব তাঁহার মুখ নিঃসৃত ওঁকারে সকল জাতিকেই অধিকার দিয়াছেন সেই দিন হইতে একখানি

মেঘ আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে। উমা মা, ঐরূপে সকল ব্রাহ্মণের হৃদয় হইতে জাত্যভিমানরূপ মেঘ অপসারিত কর; এই কামনা করিয়া আজি আমার এই কর্ম্মফল তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

গান।

শশীশেখর।—

রাগিনী সুহিনী বাহার, তাল ঢিমে তেতালা।

রৌপ্য তুঙ্গ সম, অঙ্গ নিরুপম,
রতনরুচির প্রভা ধরে।
চারুচন্দ্র ভালে, ক্ষীণরশ্মি ঢালে,
পঞ্চ পঙ্কজ নিভাধরে॥
তিন আঁখির ছবি, বহ্নি শশী রবি,
অর্দ্ধ মীলিত নেশাভরে॥
শিরে শোভে পিঙ্গল, জটিল কেশদল,
প্রহৃত প্রবাহে কলস্বরে।
অহি ভীষণ ভূষণ বিহরে॥
শূল অভয় বর, পরশুধর কর,
পদ্মাসীন বাঘাম্বরে।
হাসে প্রমথনাথ প্রীতিভরে॥

শ্রী প্র ঃ—

উত্তর। খণ্ড।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শেষাংশ।

(তৃতীয় সংখ্যার ১০০ পৃষ্ঠার পর)

ব্রাহ্মণ। "আদি পোপদিগের মধ্যে কোন একজন মিসর হইতে এক খানি হস্ত লিখিত আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ পুস্তক পাইয়াছিলেন। তাহাতে উপবাস, নিভৃতবাস মৌন ব্রতাদি ও পবিত্রাচার দ্বারা সংযম শিক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক উপদেশের উপযুক্ত হইবার নিয়মাবলি লিখিত আছে। যদি তাঁহারা মানব হিতার্থ তৎসমুদয় প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু পার্থিব ক্ষমতা লাভেচ্ছার বশবর্ত্তী হইলে, অধ্যাত্মিক উন্নতি বা পরব্রহ্মজ্যোতি লাভের আশা করা যায় না॥"

চিন্তা। "আমি নিশ্চয় জানি তাঁহারা ভগবৎপ্রীত্যর্থ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন।"

উর্দ্ধবাহু ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন। "সেই রূপই আশা করা যায় বটে।"

চিন্তা। "যখন আমি যাযক পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন আমাকে তিন বৎসর কাল মৌনব্রত, উপাসনা, উপবাসাদি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল। তখন সময়ে সময়ে যেন জগজ্জ্যোতির জ্যোতি আমার অন্তরে প্রবেশ করিত, যেন স্বর্গীয় সত্য আমার বুদ্ধিগোচর হইত, যেন কোন মহাত্মা আমার আবাস স্থলে আমার নিকট আসিতেন।"

উর্দ্ধ। "ইহার একটিও যে মিথ্যা নহে, তাহা আমি জানি এবং হিমাচলস্থ পূজ্যপাদ গুরুগণ (তাঁহাদের চরণে বারবার নমস্কার) অবগত আছেন; আপনাকে তাঁহারা উপযুক্ত জানিয়াই প্রতীচ্য জ্ঞানে দীক্ষিত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন ও আপনাকে জগতের একটি বিশেষ অনুগ্রহ দানার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনি

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চক্ষে যাহাকে প্রবঞ্চনা চাতুরী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাকেই প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন।"

চিন্তা। "স্থূল বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ইহা অল্প সন্তোষ জনক নহে।"

ঊর্দ্ধ। "আপনি বিশেষ অবগত আছেন যে, যে ভৌতিক পদার্থের প্রকৃতির জ্ঞান আয়ত্ব করা যায় তাহাকে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বাষ্পের প্রকৃতি জ্ঞানে বাষ্পীয়যন্ত্র সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে; বৈদ্যুতিক জ্ঞানে তাড়িত যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের অনেক কার্য্য সাধন করিতেছে। দৃষ্টি বিজ্ঞান সাহায্যে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি হওয়ায় গগন বিহারী কত অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবের অস্তিত্ব আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারিতাম না, অনুবীক্ষণ সহায্যে তৎসমুদয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার হইতেছে। গুপ্ত বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাষ্পীয়াদি যন্ত্র দ্বারা যেমন মানবের অশেষ উপকার সাধিত হয়, তেমনি প্রকৃতির নিয়ম বিরূদ্ধে চালিত করিতে গেলে, সেই সকল মনুষ্যের দাস দাসত্ব ছাড়িয়া মনুষ্যের জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংশ করিয়া ফেলে। গুপ্ত বিদ্যাও তদ্রূপ প্রকৃতির অনুকুলে চালিত হইলে মনুষ্যের আদেশ পালন করে, প্রতিকুলে চালিত হইলে নানা দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়া তুলে। অনেকে এইরূপ প্রতিকুলাচরণে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কেহ বা উন্মাদাবস্থাপন্ন হইয়া আছেন।"

চিন্তামণি এই সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সেই সময়ে ছাদের নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘণ্টার ন্যায় অতি মধুর ধ্বনি শ্রুত হইল, চিন্তামণি সে রূপ মিষ্ট ধ্বনি কখনও শ্রবণ করেন নাই।

তখন ঊর্দ্ধবাহু কহিলেন,—"ও সকল তির্ব্বতীয় মহাত্মার ভুবলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি (astral bells) উহা দ্বারা তিনি আমার সহিত আলাপ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন। তিনি আতিবাহিক দেহে এখনই আসিবেন আমাকে যাইতে হইতেছে। আপনি বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু দীক্ষিত শিষ্যগণের নিকট উহা সামান্য কথা; উহা আকাশিক স্পন্দন মাত্র, আকাশমার্গেই প্রেরিত। দিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঐরূপ স্পন্দন দূরদেশে প্রেরণে সমর্থ।

আপনাকে কতকটা উপর উপর বুঝাইতেছি। মনে করুন একটি লৌহ কীলকের উভয় কেন্দ্রে যদি অতিশয় শক্তি সম্পন্ন যন্ত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে উহা নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া থাকে। বস্তুত উহা ধ্বংশ হয় না, উহার পরমাণু সমূহ আকাশে পরিণত হয়। যেমন সূর্য্যালোকে সকল ধাতুই বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার পরমাণুই আকাশে বর্ত্তমান। প্রাগুক্ত রূপ স্পন্দন প্রয়োগে আকাশস্থ পরমাণু সঙ্কলিত হইয়া একটি লৌহ কীলক প্রস্তুত হইতে পারে। বুঝিয়াছেন?"

চিন্তা। "বুঝিয়াছি কিন্তু কি উপায়ে সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হয়?"

ঊর্দ্ধ। "মস্তিষ্ক হইতে একপ্রকার স্পন্দন উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের কার্য্যের ন্যায় ভূবর্লোকিক স্পন্দন এবং কার্য্যও অনন্ত, অসীম। জড়-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আলোক, উত্তাপ, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে স্পন্দন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতির গূঢ়নিয়মাভিজ্ঞগণ আকরিক পদার্থের বিশ্লেষণ হইতে, উদ্ভিজ্জ, জীব, মনুষ্য এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমুদয়ই স্পন্দন ক্রিয়ায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া জানেন। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার গতিই মূলে স্পন্দনজাত—সমস্তই গতিসম্পন্ন, সকলই স্পন্দন বিশিষ্ট। ঐ স্পন্দন উৎপাদন, নিয়মিত ও বশীভূতকরণ গুপ্ত বিদ্যার দ্বারস্বরূপ। সমগ্র স্পন্দন সমষ্টি ঈশ্বরায়ত্ব। হিমাচলস্থ মহাত্মাগণ (মহর্ষিগণ) অনেকগুলি আয়ত্ব করিয়াছেন। তদ্বারা তাঁহারা—অজ্ঞদিগের তথা কথিত অমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করেন।"

চিন্তা। "যুক্তি সঙ্গত। এমত সময় আসিতে পারে যখন জড়বিজ্ঞানও ইহা অঙ্গীকার করিবে। এসকল চিন্তার বিষয়—প্রমাণেরও আবশ্যক।"

ঊর্দ্ধ। "স্পন্দন দ্বারা গামলায় বৃক্ষোৎপাদন করিয়া কল্য আপনার হাতাতেই তো তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। বৃক্ষটি আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন প্রয়োগেই উৎপন্ন হইয়াছিল—অমানুষিকত্ব ইহাতে কিছুই নাই।"

চিন্তা। "আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি স্পন্দনের আর একটি ক্রিয়া প্রদর্শন করেন—যেমন বলিলেন আমার সম্মুখে একটি লৌহ কীলক উৎপাদন করেন।"

উর্দ্ধ। "দেখা যাউক। কিন্তু এরূপ কার্য্যে মনকে অধিক নিবিষ্ট করা মঙ্গলদায়ক নহে। তবে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বিশ্বাস দৃঢ়তর করণার্থ দুই একটি আবশ্যক বটে।"

চিন্তা। "তাহাই হউক।"

উর্দ্ধ। "এই সাদা কাগজখানির উপর আপনি ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগে চাহিয়া থাকুন; নচেৎ আপনার দ্বারা বিপরীত স্পন্দন উৎপাদিত হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাৎ বা বিলম্ব জন্মাইতে পারে।"

উর্দ্ধবাহু পূর্ব্বদিবস বৃক্ষোৎপাদনার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্য ও তদ্রূপ করিলে, দণ্ডেক কাল মধ্যে কাগজের উপর শ্বেতবর্ণ বাষ্প তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বাষ্প প্রকাশিত হইল, ক্রমে বিভিন্ন বর্ণ দেখা দিল। ঐ সমস্ত আন্দোলিত ও বিমিশ্রিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সমস্তই কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া একটু দীর্ঘাকার ধারণ করিল, অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে অদৃশ্য হইল এবং দেখা গেল একটি নূতন লৌহ কীলক কাগজের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

তদ্দর্শনে চিন্তামণি চমৎকৃত হইলেন; ব্রাহ্মণ সন্তোষব্যাঞ্জক স্মিত মুখে তাঁহার প্রতি তাকাইলেন ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ববৎ ঘণ্টা ধ্বনি হইল।

"এক্ষণে এক মাসের নিমিত্ত আপনার সহকারীর হস্তে এখানকার কার্য্যভার অর্পণের বন্দোবস্ত করুণ। অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে সূর্য্যোদয়ে আপনার অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর পশ্চিম দিকে গমন করিবেন। বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া যাইবেন;—পথে পথদর্শক যুটিবে।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ উঠিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ সে স্থান ত্যাগ করিলে, চিন্তামণি পুনরায় চিন্তা মগ্ন হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, হিমালয়ের গুপ্ত স্থানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অসাধারণ অমানুষিক কার্য্য করিয়া থাকেন—ইচ্ছা মাত্র ঝড়বৃষ্টি উৎপাদন বা প্রশমন, জলের উপর দিয়া গমন, পীড়িতকে আরোগ্য করণ, বিভিন্ন ভাষার বাক্য কথন, সূক্ষ্ম শরীরে যথা ইচ্ছা গমন এবং অপরাপর বিস্তর অতিমানুষিক কার্য্য করণে সমর্থ।

পৌরহিত্য অবলম্বন করিয়া অবধি চিন্তামণি এতাবৎ সাগ্রহে তৎকার্য্য সমাধান ও জড়বিজ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকায়, গুপ্ত বিদ্যায় মনোনিবেশের অবসর পান নাই। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি স্থির চিত্তে "যাইতেই হইবে" এই কথা বলিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন। সত্বর সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া এক সপ্তাহের জন্য তিনি অশ্বারোহণে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পথে যাইতে যাইতে উর্দ্ধবাহুর কথা চিন্তামণির মনে উদয় হইল, ভাবিলেন, তিনি প্রকৃতির রহস্যজ্ঞ একজন ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী, সাধারণ বাজীকর বা অর্থাভিখারী নহেন। চিন্তামণি সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত গমন করিলেন; কেহ যেন অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সন্দিগ্ধ চিত্তে কোন চৌমাথার পথে উপনীত হইবা মাত্র, কোন হিন্দু অলক্ষিত ভাবে উপস্থিত হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির সামান্য ফল মূল আহার, নির্ঝর বারি পান ও দূর ভ্রমণে নিশাগমে পান্থ অশ্বসহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া একখানি লতাচ্ছন্ন তৃণ মণ্ডপ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তদভিমুখে অশ্ব চালন করিলে এক জন হিন্দু উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মণ্ডপে সাদরে লইয়া গেলেন। সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ মাত্র, তাঁহার শরীরে কি যেন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ক্লান্তি হরণ করিল; তাহাতে তিনি উদারচরিত কোন যোগীর আশ্রমে আসিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলেন। গৃহোপকরণ মধ্যে সেই গৃহে একখানি খট্টা, একটি ক্ষুদ্র বেদীকা, কয়েকটি দেব মূর্ত্তি, ধূপদানাদি পূজোপকরণ এবং কয়েকটি সামান্য রন্ধন ও ভোজন পাত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

অশ্বকে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিয়া সেই হিন্দু প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, স্নানার্থ তাঁহাকে একটি নির্ঝর দেখাইয়া দিলেন। তিনি স্নানান্তে সম্পূর্ণ

বিগতক্লম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে গৃহস্বামী তাঁহার আহার্য্যার্থ অন্ন, ব্যঞ্জন, মধু, করোটিকা (রুটি) এবং দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ভোজনে আহ্বান করিলেন। গৃহস্বামীর ভাব ভঙ্গী আচার ব্যবহারে এমত একটু স্নেহ, একটু সহৃদয়তা, একটু সম্ভ্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, চিন্তামণির হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়া গেল। আহারান্তে মনোরমার কথা মনে পড়িল, লঙ্গা পাদরীর কথা মনে পড়িল। "যদি পাদরী সাহেব আমাকে এইরূপ কার্য্যে অনুরক্ত দেখেন, তবে কি মনে করিবেন" এই ভাবিয়া কথঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

গৃহস্বামী এতক্ষণ সঙ্কেতে কার্য্য করিতেছিলেন, এই প্রথম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভ্রাতঃ! আইস আমরা ভগবানকে ডাকি; তিনিই সত্য পথ প্রদর্শন করিবেন।"

চিন্তামণি বুঝিলেন তাঁহার উৎকণ্ঠা গৃহস্বামীর অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার সহিত একত্রে প্রার্থনা করিলেন—হৃদয়ের ভার দূর হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে।"

পরে গৃহস্বামীর নির্দ্দেশানুসারে তিনি একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা গেলেন। পর দিবস প্রাতে গিরিভিৎ* পানান্তে চিন্তামণি পুনর্যাত্রার্থ বাহিরে আসিয়া দেখেন তাঁহার অশ্ব সুসজ্জিত। গৃহস্বামী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গন্তব্য পথ প্রদর্শন ও পথের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া নমস্কার করিলে, তিনি প্রতি নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইলেন। অশ্বারোহী দৃষ্টি পথের অতীত হইলে, "ভগবান তোমার উপর কৃপাদৃষ্টি করুন।" এই কথা বলিয়া গৃহস্বামী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে তুরগারোহী ভাবিলেন "কি আশ্চর্য্য! গৃহটির মধ্যে যেন শান্তিপ্রদ, চিন্তাদূরকারী এবং সৎচিন্তা উদ্দীপক একটা কি আছে।" হিমাদ্রির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু গৃহস্বামী ও পথদর্শকগণের ব্যবহারে তাঁহারা যেন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই ভাবিয়া তিনি সমধিক চমৎকৃত হইলেন।

---

* গিরিভিৎ—চা।

মধ্যাহ্নে গিরিতটবর্ত্তী একখানি গৃহ দেখিতে পাইয়া চিন্তামণি সেই দিকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটি ব্রাহ্মণ নির্গত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে তিনি পুনর্যাত্রার অভিপ্রায় করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"দূরবর্ত্তি গ্রামে বিদেশীয়গণের অপরিজ্ঞাত একটি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি আপনার সহিত যাইব।"

অলৌকিক ঘটনাবলী।

(১১)

বহুবাজারস্থ বাবুরাম শীলের গলিতে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল, যাহা শুনিলে পাঠক মহাশয়গণ চমৎকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহ ছিল। তদুপলক্ষে লোক জন খাওয়ানর জন্য ও ভেয়ান করিতে তাঁহার নিজ বাটীতে স্থানাভাব বশতঃ সম্মুখস্থ কোন এক ভদ্রলোকের বাটী খালি থাকায় সেই বাটীতে এই কার্য্য করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ঐ খালি বাটীতে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একজন স্ত্রীলোক সধবাবস্থায় পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বাটীতে ক্রমশঃ ভূতের দৌরাত্ম হইতে থাকে, এজন্য বাটীর অপর পরিবারেরা ক্রমশঃ ভূতের দৌরাত্মের ভয়ে বাটী ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান, সেই অবধি ঐ বাটী খালি পড়িয়া আছে। এমন কি যাঁহার কন্যার বিবাহ তাঁহার বাটীর ও তাঁহার প্রতিবেশীর বাটীর লোকেরা কখন কখন ঐ খালি বাটীতে লোক বেড়াইতেছে এরূপ অনেক সময় দেখিয়াছেন; কিন্তু কখন কাহারও বাটীতে কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। এক্ষণে তাঁহাদের কন্যার বিবাহের জন্য ঐ বাটী ব্যবহার করার মনস্থ করাতে কন্যার মাতা ঐ বাটীতে ভূতের উপদ্রব আছে ভাবিয়া ঐ বাটী ব্যবহারে অমত করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিজ বাটীতে স্থানাভাব ভাবিয়া তাঁহার মাতার কথায় অসম্মত হইয়া ঐ বাটীতেই খাওয়ান হইবেক স্থির করেন। ইতি মধ্যে এক দিবস রাত্রে

কন্যার মাতা স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন যে, সেই মৃতা স্ত্রীলোক যেন তাঁহার নিকট, আসিয়া বলিতেছে যে, "দেখ তোমরা আমার বাটী ব্যবহার করিবার মনস্থ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা তাহা করিও না—তবে যদি তোমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়, তাহা হইলে আমার থাকিবার ঘরখানা ছাড়া বাটীর অপর সমস্ত ঘর তোমরা ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু আমার ঘর যেন.কোনরূপ অপরিষ্কার না হয়।' ইহা দেখিয়া কন্যার মাতা অত্যন্ত ভীতা হয়েন ও পরদিন বাটীর সকলকে এই স্বপ্ন বিবরণ বলিয়া ঐ বাটী ব্যবহার করিতে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু বাটীর পুরুষ পক্ষীয়েরা তাঁহার কথা না শুনিয়া বিবাহের দিবস ঐ বাটীতে নিমন্ত্রিত লোকজন খাওয়ান ও ভেয়ানের কার্য্য করেন। পর দিন মঙ্গলবার বিবাহোপলক্ষে অনেকগুলি নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোককে তাঁহার বাটীতে লইয়া আইসেন ও খাওয়ান হয়; সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুটুম্বেরা সকলে তাঁহার নিজ বাটীর ছাদের উপর বসিয়া ছিলেন ও কন্যার মাতা ঐ ছাদের উপর তাঁহাদের যে ঠাকুর ঘর আছে,সেই ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে বসিয়া কুটুম্বদিগের খাওয়াইবার জন্য একথাল বর্ফি কাটিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে সেই সময় হঠাৎ মেঘ উঠিয়া অত্যন্ত ঝড় উপস্থিত হইয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইল; ইহাতে ছাদের উপরিস্থ স্ত্রীলোকেরা সকলে নিচে নামিয়া আইসে, কেবল কন্যার মাতা একা বসিয়া বর্ফি কাটিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, একটা দীর্ঘাকার লোক, প্রকাণ্ড মাথা, খুব বড় বড় চোক, যেন তাঁহার নিকটে আসিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার নিকট বর্ফি চাহিতে লাগিল। তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ভীতা না হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে,—"আমি কুটুম্বদিগের জন্য বর্ফি কাটিতেছি, তুমি কে, তোমাকে কি নিমিত্ত দিব, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া সে না গিয়া বরং বার বার চাহিতে লাগিল। তখন তিনি বর্ফির থালা খানা ঠাকুর ঘরের ভিতর সরাইয়া দিয়া একটা ধামা লইয়া মাথা ঢাকা দিয়া ছাত হইতে নিচে নামিয়া আসিয়া নিজের শুইবার ঘরের ভিতর গিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও অপর কয়েক জন স্ত্রীলোক তাঁহার কাঁপনির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিবা মাত্র তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ও দাঁত লাগিয়া গেল।

অনেক চেষ্টার পর প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে তাঁহার সংজ্ঞা হয়, কিন্তু একেবারে বাক্‌রোধ হইয়া গেল--কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন ডাক্তার আনাইয়া অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কথা বাহির হইল না—কেবল ইঙ্গিতে কথা কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ রাত্র বারটা হইল বর কনে চলিয়া গেল। তিনি সমস্ত রাত্র এই ভাবেই রহিলেন। পর দিন বুধবার প্রাতে ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে পক্ষাঘাত হইয়াছে কি না, কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার কোন যন্ত্রণা হইতেছে কি না,জিজ্ঞাসা করায় তিনি ইঙ্গিতে কহিলেন না; কেবল বুকের উপর হাত বুলাইয়া দেখাইলেন বুক কেমন করিতেছে, ইহা দেখাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ডাক্তার কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যান। ডাক্তার গেলে পর তিনি পূর্ব্ব দিন ছাদে বর্ফি কাটিবার সময় যেরূপ ঘটনা দেখিয়াছিলেন সেই সমস্ত ইঙ্গিতে কহিতে লাগিলেন,তখন বাটীর ও অপর সকলে বলিতে লাগিলেনযে,ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ করিয়া ওঝা আনাইয়া ঝাড়ান হউক। তাহাতে নৈহাটীতে গঙ্গা ময়রা ওঝার নাতির নিকট লোক পাঠান হইল ও খিদিরপুরে একজন ওঝার নিকট লোক গেল, খিদিরপুরের ওঝা আসিয়া বেলা একটার সময় তাঁহাকে একটা জলপড়া দিল ও তুলসিপাতা খাইতে দিল, ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বক্তার হইয়া পড়িলেন, তখন ঐ ওঝা তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই মৃতা রমণীর নাম বলিলেন ও কহিতে লাগিলেন যে,—"আমি ভদ্র ঘরের কন্যা, ভদ্র ঘরের কুলবধু, আমি কখন বাটীর বাহিরে যাই নাই, কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই, আমার সঙ্গে এই স্ত্রীলোকের অনেক দিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল, আমার বিবাহের পর হইতে আমরা দুই জনে একত্রে খেলা করিতাম ও আমাদের দুই জনে পরস্পর খুব ভালবাসা ছিল। ইহার কন্যার বিবাহের জন্য যখন আমার বাটী ব্যবহার করিবার মনস্থ করেন তখন আমি স্বপ্নে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। পরে আবার ইহাদের কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমার নিজের থাকিবার ঘর ছাড়া অন্য ঘর সকল ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অনুমতি পাইয়া ইহারা আমার বাটীর সমস্ত ঘরই ব্যবহার করে এমন কি আমার নিজের ঘর পর্য্যন্ত ব্যবহার করে ও ঘর সকল ধোবার সময় আমার গায়ে ছিটে লাগে, তাহাতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত

হইয়া ইহাকে জব্দ করিবার জন্য অভিপ্রায় করি। বিবাহের পর দিন সন্ধ্যার সময় যখন ঝড় উঠে সেই সময় আমি উহাকে ছাতে একলা পাইয়া দেখা দিয়া উহার নিকট বর্ফি চাই, কিন্তু আমাকে দেখিয়াও কিছুমাত্র ভয় না করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল। এজন্য আমি উহার সাহসকে ধন্য দিই। পরে যখন সন্দেশ আমাকে না দিয়া ঠাকুর ঘরের ভিতর সরাইয়া দিল আমি রাগ করিয়া উহার মাথায় একটা ছোট ইট মারিলাম, তাহাতে ইনি ছাত হইতে নিচে নামিয়া যান, কিন্তু আমি বেশি কিছু অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করি না, আমি শীঘ্রই ইহাকে ছাড়িয়া দিব।” তখন ওঝা কহিল “এখনিই ছাড়িয়া দাও” তাহাতে সে কহিল "কিছুক্ষণ পর যাইব” তাহাতে ওঝা কহিল “যদি তুমি সহজে না যাও, তুমি জান আমার তোমাদের উপর অত্যাচার করিবার ক্ষমতা আছে— তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইব”। তাহা শুনিয়া সে কহিল “কিছু করিতে হইবেক না আমি আপনিই বেলা ৫টার সময় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।” তাহার পর বেলা ৫ টার সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং সংজ্ঞা হইলে পর তিনি বেশ ভাল অবস্থায় যেরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেন সেইরূপ কথা কহিতে লাগিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিজে কহিতে লাগিলেন মাথায় যে একটা ইট্ লাগিয়াছিল তাহাতে মাথা ফুলিয়া রহিয়াছে ও বেদনা আছে তাহাও দেখাইলেন এবং সেই অবধি তিনি বেশ ভাল আছেন ও বেশ কথা কহিতেছেন, কেবল অত্যন্ত কাহিল আছেন স্ত্রীলোকটার বয়স প্রায় ৪৩।৪৪ হইবেক।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

গান।

মন আড়ালে আড় হয়ে শুনছ কি,
তোমার ঘাড়ে চেপেছে কি চণ্ডালের ঝি!
তুমি জানতে চাও পরছিদ্র ছি ছি ছি!
আপনার অপরাধ, সে ত নয় সোণার খাদ
সে সকল দিয়ে বাদ পরোক্ষে সাধ বাদ,
তুমি পেতে উড়ুট্টি ফাদ, ধর চৌষট্টি চাঁদ
সোণার চাঁদ তুমি কি নও কলঙ্কী,
এতে হবেনা মহেন্দ্রের মন সুখী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

২য় ভাগ। } ভাদ্র, ১৩০৫। { ৫ম সংখ্যা।

মানবের ভাগ্য লিপি।

মানবেরি লেখা।

স্রোতের তৃণের মত যেয়োনা ভাসিয়া।
বর্ত্তমান নহে নহে উপাস্য নরের।
কোরোনা ভবিষ্যে ভুল অদৃষ্ট ভাবিয়া,
সৃজিতঃ সে তোমারই আপন করের।

তুমি যদি চাও তারে করিতে সুন্দর,
বর্ত্তমানে করিওনা নিয়ন্তা আপন।
জেনে রেখো সে কেবল তব অনুচর;
রাখুক্ তাহারে বশ, তোমার শাসন।

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যে অশ্ব দুর্দ্দমন,
সে নিজ ঈপ্সিত পথে চাহিলেও যেতে,
তাহারে নির্দ্দিষ্ট দিকে অবহেলে ল'ন
শিক্ষিত আরোহী, দৃঢ় অঙ্গুলী সঙ্কেতে।

টেনোনা সকল কাজে বিধাতারে একা।
—মানবের ভাগ্যলিপি মানবেরি লেখা!

শ্রীমতী মৃণালিনী।

ব্রহ্মের লক্ষণ।

শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অবাঙ্‌মনসগোচর বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর, অতীত। বাক্যে তাঁহাকে বলা যায় না, মনে তাঁহাকে ধারণা করা যায় না। তাঁহার নিকট হইতে বাক্য মন হটিয়া আসে।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। বাক্য মন সসীম সান্ত। যাহা সীমান্বিত অন্তশালী, বাক্য মনের তাহাই বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যে পদার্থ অসীম অনন্ত, বাক্য মন তাহার লাগ পাইবে কিরূপে? ব্রহ্ম অতি বৃহৎ, পরম মহৎ পদার্থ; সেই জন্য ব্রহ্ম বাক্য মনের গোচর নহেন।

শাস্ত্র ব্রহ্মকে অনির্দ্দেশ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের কোন রূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। ব্রহ্মের এরূপ কোন চিহ্ন নির্দ্ধারণ করা যায় না যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে চিনিয়া লওয়া যায়। আমরা পদার্থের গুণ (attribute) ধরিয়া পদার্থকে চিনিয়া লই। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ পদার্থ। ব্রহ্মের নির্ব্বাচন স্থলে শ্রুতি নেতি নেতি এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার ভাব এই যে আমরা যে পদার্থেরই নাম করিনা কেন, যে পদার্থেরই বিষয় ধারণা করিনা কেন, ব্রহ্ম সে পদার্থ নহেন। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, তারা, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, ক্ষিতি, জল, অগ্নি আকাশ—ব্রহ্ম এ সকলের কোনটিই নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ জ্ঞাত ও ব্যক্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন অনির্ব্বচনীয় কিছু। সেই জন্য শ্রুতি ব্রহ্মের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে এত 'ন' শব্দ ব্যবহার করেন। 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মের শব্দ নাই স্পর্শ নাই রূপ নাই হ্রাস নাই। ব্রহ্ম স্থূল নহেন অণু নহেন হ্রস্ব নহেন। সেই জন্য ব্রহ্মকে নিরঞ্জন বলে। যিনি অঞ্জন (চিহ্ন) বিহীন, তিনিই নিরঞ্জন।

যেমন কমলা লেবু একটি পদার্থ। ইহার আকার আছে, সৌরভ আছে রস আছে বর্ণ আছে কোমল স্পর্শ আছে। ইহা শীত কালের ফল, বীজ হইতে উৎপন্ন, অমুক দেশের মাটিতে জন্মে। এইরূপ আমরা কমলা লেবুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। আর আমাদের মনে কমলা লেবু ঐ সকল গুণ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ অন্যান্য পদার্থ। যদি আমরা কমলা লেবু হইতে একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ সকল কয়টি গুণ বাদ দিই তবে কি অবশিষ্ট থাকে? শূন্য। এই শূন্যই ব্রহ্ম। সমস্ত পদার্থে নেতি নেতি প্রণালী প্রয়োগ করিয়া সেই সেই পদার্থের গুণাবলি বর্জ্জন করিলে শূন্য বই আর কি অবশিষ্ট থাকে? এই শূন্য ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন।

বৌদ্ধদিগকে শূন্য বাদী বলিত। তাহাদের শূন্য ও বেদান্তের ব্রহ্ম পৃথক জিনিষ নহেন। যাহা এক হিসাবে শূন্য তাহা অপর হিসাবে পূর্ণ। গুণের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম শূন্য (ইহাই বৌদ্ধের লক্ষ্য); আর অনন্তের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম পূর্ণ (ইহাই বৈদান্তিকের লক্ষ্য)। উভয় মতেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই শাস্ত্র সময়ে সময়ে ব্রহ্মে বিরোধী গুণের আরোপ করেন। যিনি কিছুই নহেন, তিনি সবই। সেই জন্য শ্রুতি বলেন তিনি দূরে অথচ নিকটে; তিনি অণুরও অণু, আবার মহান্ অপেক্ষাও মহান্। তিনি নির্গুণ অথচ গুণাত্মন্; তিনি নিষ্ক্রিয় তথাপি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি অমূর্ত্ত এবং জগন্মূর্ত্তি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর—বাক্য ও মনের অতীত। ইহা মায়া-মোহজড়িত সাধারণ মনুষ্যের বাক্য ও মনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কারণ যাহারা তত্ত্বদর্শী মায়াতীত ব্রহ্মজ্ঞানী, এক কথায় যাঁহারা ঋষি (seer)

তাঁহারা বিরাট ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন এবং মায়াবদ্ধ জীবকুলের উদ্ধারের জন্য শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহে সেই ধারণার ফল নিবিষ্ট করিয়া রাখেন। কঠ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মান প্রকাশতে দৃশ্যতে ত্বগ্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ—এই আত্মা (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে অপ্রকাশ ভাবে প্রচ্ছন্ন আছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা (ঋষিরা) তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। সর্ব্বদর্শী শাস্ত্র কখন অসাধ্য সাধন উপদেশ করেন না। অতএব আত্মদর্শন (ব্রহ্ম জ্ঞান) যে জীবের অসাধ্য নহে, তাহাউপরোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায়। এইরূপে যাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাই ঋষি। ব্রহ্মশাস্ত্র উপনিষদ তাঁহাদেরই ব্রহ্মজ্ঞান প্রসূত।

সাধারণ জীবের বাক্যাতীত হইলেও ব্রহ্ম যে ঋষি বাক্যের অতীত নহেন তাহার প্রমাণ আমরা উপনিষদেই প্রাপ্ত হই। কেন উপনিষদে গুরু শিষ্য সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—"উপনিষদং ভো ব্রূহি ইত্যুক্তা তে উপনিষদ। ব্রাহ্মীং বাব উপনিষদং অব্রূমেতি।" গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন—ব্রহ্ম-বিষয়িণী উপনিষদ্ (তত্ত্ববিদ্যা) তোমাকে বলা হইল। যদি ব্রহ্ম ঋষি বাক্যেরও সম্পূর্ণ অতীত হইতেন, তবে ঋষি ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষদ্ কিরূপে বলিতে সমর্থ হইতেন? তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ঋষিরাও ব্রহ্মের সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারেন না। বর্ণনা যেরূপই হউক না কেন, তাহা সসীম হইবে। অতএব অসীম ব্রহ্মের বর্ণনা কিরূপে সম্ভব? আর ব্রহ্মের সম্পূর্ণ সম্যক্ ধারণা তত্ত্বদর্শীরও সাধ্যাতীত; কারণ, যস্যামতং তস্য মতং যস্যন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্। যত দিন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিভিন্ন থাকে তত দিন ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কন্তু যখন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় একত্বে পরিণত হয় তখনই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হয়েন।

এই তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি সম্প্রদায় মানবের হিতার্থে যে অমূল্য উপনিষদ সকল প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা ব্রহ্মের কি লক্ষণ জানিতে

পারি? ব্রহ্মের স্বরূপের কি পরিচয় পাই? এ প্রবন্ধে এই প্রশ্নের অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যাহা পদার্থকে চিনাইয়া দেয় তাহা সেই পদার্থের লক্ষণ। লক্ষণ দ্বিবিধ—স্বরূপ ও তটস্থ। যাহা পদার্থের বস্তুতঃ পরিচায়ক, যাহা দ্বারা আমরা পদার্থের প্রকৃত পরিচয় অবগত হই, তাহাই সেই পদার্থের স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ পদার্থের অনিত্য সহচর গুণের (accidental attribute) নির্দ্দেশ মাত্র; অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ বস্তুর স্বরূপের (essence) জ্ঞাপক; আর তটস্থ লক্ষণ বস্তুর অস্থায়ী গুণের নির্দ্দেশক। যেমন মরণশীলতা বা বাক্‌শক্তিমত্তা মনুষ্যত্বের স্বরূপ লক্ষণ; কিন্তু সংগীত প্রিয়তা মনুষ্যত্বের তটস্থ লক্ষণ মাত্র।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা ভূত সকল জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে প্রলয়ান্তর বিলীন হয় তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি কারণ তিনিই ব্রহ্ম।

সেই জন্য অন্যত্র শ্রুতিতে ব্রহ্মকে তজ্জলান বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম তজ্জ তল্ল তদন। অর্থাৎ জগৎ তাঁহা হইতে জাত তাঁহাতেই লীন এবং তাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে। এই লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই অনাদি অনন্ত বিরাট বিশাল অসীম জগৎ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিবেন, তাঁহার বিরাটভাব, তাঁহার অসীম শক্তিমত্তার ইহার দ্বারা কতকাংশে হৃদয়ে অবভাস হয় বটে। সেই জন্যই শ্রুতি তটস্থ লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সূত্রের প্রথমেই ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশে ভগবান্ বাদরায়ন 'জন্মাদ্যস্য যতঃ, এই সূত্র নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান পক্ষে তটস্থ অপেক্ষা স্বরূপ লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অধিক। সেই জন্য শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশেও বিরত হন নাই। সে লক্ষণ এই—'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্।' এই লক্ষনটির প্রতি বিশেষ অনুধাবন করা আবশ্যক। কারণ ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে আমরা কতকটা ব্রহ্মের স্বরূপের আভাষ পাইব।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্' অদ্বৈত বাদের মূল সূত্র। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু; তাঁহার দ্বিতীয় নাই। এই অশেষ বৈচিত্রময় জগতে কত কত বিভিন্ন পদার্থজাত বিরাজিত রহিয়াছে, ইহাত আমাদের অনুভবসিদ্ধ। তবে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, একথার অর্থ কি? ইহার দুইটি উত্তর হইতে পারে। প্রথম আমরা যে বিভিন্ন পদার্থ জাত দেখি তাহারা অসৎ, বাস্তব পক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে তাহা গত কাল ছিল না আর পরশ্ব থাকিবে না। যাহা গত কাল ছিল তাহা আজ নাই। যাহা আজ নাই তাহা ভবিষ্যতে হইবে। এইরূপ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে স্বপ্নে তাহা থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখি তাহা জাগ্রত অবস্থায় ছিল না এবং সুষুপ্তিতে থাকিবে না। অতএব তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল কালে সকল অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন আছেন ও থাকিবেন। অতএব ব্রহ্মই সৎ। দ্বিতীয় উত্তর এই যে জগতে যে কিছু পদার্থ আছে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন কুণ্ডল বলয় হার প্রভৃতি স্থূল দৃষ্টিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণ বই আর কিছুই নহে; সেইরূপ এই অশেষ বৈচিত্রময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়। কুণ্ডলের রূপ এক প্রকার, বাজুর রূপ আর এক প্রকার এইমাত্র ভেদ— নাম রূপের ভেদ। বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই।

এইরূপ জাগতিক পদার্থ সমূহের মধ্যেও নাম রূপের ভেদ মাত্র। কাহারও নাম পর্ব্বত কাহারও নাম নদী; কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত কাহারও রূপ পশু তুল্য। এই মাত্র ভেদ। কিন্তু নদী পর্ব্বত পশু মনুষ্য সকল পদার্থই ব্রহ্ম। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এক ব্রহ্মই আছেন—জগতে নানা পদার্থ নাই।

ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলাতে এই বুঝিতে হয় যে ব্রহ্ম নির্দ্দোষভাবে সম (absolute homogeneity)। 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'। অর্থাৎ ব্রহ্ম ত্রিবিধ ভেদ বর্জ্জিত। জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়। বিজাতীয় স্বজাতীয় ও স্বগত। ভিন্ন জাতীয় দুই পদার্থে যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ। যেমন পশুতে ও মানুষে ভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্য জাতীয় পদার্থ নাই, তখন ব্রহ্ম যে বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এক

জাতীয় দুই ব্যক্তিতে যে প্রভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। যেমন রাম ও শ্যামে ভেদ। ব্রহ্ম যখন অদ্বিতীয়, সমকক্ষ হীন তখন তাঁহাতে স্বজাতীয় ভেদের সম্ভাবনা কোথায়? একই ব্যক্তিগত যে প্রভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন একই বৃক্ষে পত্র শাখা ফুল ফল ইত্যাদির ভেদ। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সম—সর্ব্বাংশে সর্ব্বাবয়বে এক, তখন তাঁহাতে স্বগত ভেদেরই বা অবকাশ কোথায়?

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।" ইহার অর্থকি? ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। 'যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎসত্যম্'। যাহার নিশ্চিতরূপের ব্যভিচার হয় না, সেই সত্য। ব্রহ্ম সৎ বলিলে এই বুঝায় যে ব্রহ্ম বিকার বর্জ্জিত; অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার সনাতন ধ্রুব অচল। ব্রহ্ম স্থাণু, অব্যয় অচ্যুত শাশ্বত।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ হ্রাস বৃদ্ধি, উৎপত্তি বিনাশ, বিকারের নামান্তর। সনাতন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ সম্ভবে না। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। নির্ব্বিকার অচল বস্তুর হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই। অতএব ব্রহ্ম সৎ বলাতে এত কথা বুঝাইল।

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম জড় নহেন চিৎ, চৈতন্যময়। জড় ও চেতনের ভেদ আমাদের অনুভব সিদ্ধ; অতএব তাহা বুঝান অনাবশ্যক। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহারই বিকার জড়বর্গ। বিক্রিয়াহীন ব্রহ্ম তাহা হইতে স্বতন্ত্র, চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ চেতন। সেই জন্য তাঁহাকে চিদ্‌ঘন বলে। চিতের একটি লক্ষণ স্বপ্রকাশিতা। অর্থাৎ চিৎ আপনাকে-আপনিই প্রকাশ করে; তাহার প্রকাশ জন্য পদার্থান্তরের প্রয়োজন হয় না। জড়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝান যাইতে পারে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ পদার্থ। নিশার অন্ধকারে বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, গৃহ প্রভৃতি অপ্রকাশ থাকে; কিন্তু সূর্য্য উদিত হইয়া উহাদিগকে প্রকাশিত করেন। অতএব বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, গৃহ প্রভৃতি স্বপ্রকাশ পদার্থ নহে, কারণ তাহারা সূর্য্যালোক ভিন্ন প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সূর্য্য আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই জন্য তিনি স্বপ্রকাশ। কিন্তু সূর্য্য কাহার তেজে তেজীয়ান্, কাহার জ্যোতিতে জোতিষ্মান? তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ব্রহ্মের ভাতিতে সকলেই

ভাতিমান্, তাঁহার জ্যোতির অনুসরণ করিয়াই অন্যের জ্যোতিঃ। ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো ন চন্দ্রমা ন তারকঃ। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহাকে ভাসিত করে না।

আলোকের ভাতির বিষয়ে যাহা বলা হইল জ্ঞানের ভাতির বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য। বিষয় সংযোগে ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন উদ্‌ভূত হয়। ঐ স্পন্দন ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নীত হয়। পরে কোশ হইতে কোশান্তরে সংক্রামিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশে (বুদ্ধি ভূমিকায়) উপনীত হয়। কিন্তু স্পন্দন কিরূপে জ্ঞানে পরিণত হয়? পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ। এ বিষয়ে বৈদান্তিকের উত্তর এই যে যেমন আলোক ঘট প্রভৃতি পদার্থকে উজ্জলিত করিয়া প্রকাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিস্থ ব্রহ্মজ্যোতিতে উজ্জলিত হইয়া চিত্তবৃত্তি জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী ও বহুরূপী। সেই জন্য তদ্দ্বারা উপহিত হইয়া জ্ঞান (যাহা ব্রহ্ম স্বরূপ) তাহা ও ক্ষণিক ও নানারূপ মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবা কুসুমের সংযোগে লাল মনে হয়, অপরাজিতার সংযোগে নীল মনে হয় এবং গাঁদা ফুলের সংস্রবে হলুদ বর্ণ মনে হয়, কিন্তু স্ফটিক বাস্তবিক বর্ণ রহিত। সেই রূপ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্য্যে চিদ্‌ঘন শুদ্ধ আত্মা সেই সেই বৃত্তির তাদাত্ম্য লাভ করে। সেই জন্য আত্মাকে সুখী দুঃখী কামী লোভী ইত্যাদি রূপ মনে হয়। অর্থাৎ সুখের অবস্থায় জ্ঞান সুখাকারে আকারিত হয়; দুঃখের অবস্থায় জ্ঞান দুঃখাকারে পরিণত হয়। এই বিভিন্নতা উপাধি জন্য, বাস্তবিক নহে। আর চিৎ নিত্য বস্তু, কোনকালে কোন অবস্থায় ইহার বাধ হয় না। জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা স্বপ্নে বিদ্যমান থাকেনা। এই রূপ স্বপ্নাবস্থায় যাহা বেদ্য, সুষুপ্তি অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকেনা। কিন্তু চিৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। এমন কি যখন আমরা ঘোর নিদ্রায় সুষুপ্ত থাকি তখনও চিৎ তিরোহিত হয় না। এইরূপ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকালেই চিতের সত্তা অক্ষুন্ন থাকে। সেই জন্য পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন মাসাব্দযুগ কল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ং প্রভা। মাস বর্ষ যুগ কল্প—অতীত অনাগত কোন কালেই স্বপ্রকাশরূপ চিৎ উদিত বা অস্তমিত হয় না।

সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্মের অন্ত নাই, ইয়ত্তা নাই সীমা নাই। ব্রহ্ম অতি মহান্। 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। সেই জন্যই তাঁহার নাম ব্রহ্ম। আর অনন্ত বলিয়াই তিনি সর্ব্বতঃ পূর্ণ। তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই।

পূর্ণ-মদঃ পূর্ণমিদং, পূর্ণাৎ হি পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। আর অতি মহান ও সুসম্পূর্ণ বলিয়াই তিনি আনন্দস্বরূপ। কারণ 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখ মস্তি'। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমা কি? 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পং'। যেখানে দ্বৈত, যেখানে ভেদ,যেখানে অংশাংশী ভাব,যেখানে দ্রষ্টা দৃশ্য জ্ঞাতা জ্ঞেয় প্রভৃতি বৈষম্য আছে সেই অল্প। যেখানে নাই সেই ভূমা। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং অনন্ত; সেই জন্য তিনি ভূমা। এবং ভূমা বলিয়াই আনন্দস্বরূপ।

ব্রহ্ম যে আনন্দময় এ বিষয়ে শ্রুতি অনেকবার উপদেশ দিয়াছেন। "এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানমুপসংক্রামতি" 'আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানৎ। বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম' আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চেন।" 'রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি' ইত্যাদি।

এই আত্মা আনন্দময়। আনন্দই ব্রহ্ম! জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিলে, আর কিছুতে ভয় থাকে না। আত্মা রসস্বরূপ; রস লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। ইত্যাদি।

মানুষ সুখান্বেষী। মানুষ যখন কিছুতেই মরিতে চায় না, আত্মাকে হারাইতে চাহে না, তখন বুঝিতে হইবে আত্মা সুখস্বরূপ। অন্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে যে আমাদের প্রেম হয়, তাহারা যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহার কারণ এই যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম (যিনি ঐ ব্যক্তি বা বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন) আমাদের নিয়তই প্রেমাস্পদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী পত্নীর নিকট এই তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন। পঞ্চদশীকারের মতে গুণময়ী প্রকৃতির বিকার বিষয় হইতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ আনন্দঘন ব্রহ্মের ক্ষণিক অবভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতার প্রমাণ জন্য শাস্ত্র অন্যান্য যুক্তিও উপস্থান করিয়াছেন। তাহার উল্লেখ বা বিচার এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

অতএব আমরা ব্রহ্মের লক্ষণ এই মাত্র পাইলাম। তিনি সচ্চিদানন্দ এবং এক ও অদ্বিতীয়।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

কর্ম্ম।

অশ্বথ বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যা রচনা করিয়া স্বামীজি একটা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন; আমি সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি উপস্থিত হইবার পরেই স্বামীজি মুড়ি খুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীজি শুয়ে শুয়ে কি করিতেছিলে? স্বামীজি বলিলেন বুকটার ভিতর একটা ঢেঁকি দুম্ দুম্ ক'রে উঠিতে ও পড়িতেছিল, তাই সেই শব্দটাকে অনন্ত আকাশে মিলাইতেছিলাম। তুমি এসেছ বেশ হয়েছে, একটু গল্প করা যাউক; আজ প্রাণটা বড় চঞ্চল হয়েছে।

আমি। কেন, অকারণ প্রাণ চঞ্চল হল কেন?

স্বামীজি। সহধর্ম্মিনী বিরহে।

এই কথা বলিয়াই ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি বলিলাম বুঝিয়াছি।

স্বামীজি। কি বুঝিলে?

আমি। কেন সেই উইল লেখার দিনত বলিয়াছ যে ভক্তিদেবী তোমার সহধর্ম্মিনী আজি তাঁকে হৃদয়ে পাচ্চনা বলেই হৃদয় চঞ্চল হয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে দুটা ভাল কথা কহ; তাহা হইলেই প্রাণের চাঞ্চল্য কমে যাবে এখন! সে দিন তুমি আমার বাড়ী ভোজন করিয়া আমার হৃদয় ভক্তি জলে ভরাইয়া রাখিয়াছ, আজি আমি সেই জল তোমার হৃদয়ে ঢালিয়া তোমার হৃদয় চাঞ্চল্য দূর করিব।

স্বামীজি। আয় তবে, আমার বুকের উপর হাত দিয়া বসে থাক, আমি একটু শুয়ে পড়ে গান গাই। স্বামীজি শুইয়া পড়িলেন আমি তাঁহার বুকের কাছে বসে হৃদয়ে হাত দিয়া রহিলাম, তিনি গান গাহিতে লাগিলেন।

আজি পূজিব মায়ের চরণ,
মায়ের চরণ হৃদে করিয়া ধারণ,
ভক্তি জলে আগে করিব প্রক্ষালন।
আমি জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, কামাহুতি দিব;
মা মা মা মন্ত্রে তুষিব মায়ের মন।

স্বামীজির গানের তালের সঙ্গে সঙ্গে একটা তড়িৎ স্রোত আমার হৃদয় হইতে করতল এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ গুলির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া স্বামীজির হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, আমি ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। গান গাহিতে গাহিতে যখন শেষ চরণের মা মা মা ধ্বনি করিতে লাগিলেন, সেই সময় আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং স্বামীজিরও নয়ন জলে ভাসিয়া গেল। সেই সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি দেখিয়াছি, তোমরা সকলে উহা কল্পনা মনে করিবে আমি কিন্তু উহা স্পষ্ট দেখিয়াছি; দেখিলাম একখানি রাঙ্গা টুক্‌টুকে ছোট পা স্বামীজির বুকের উপর রহিয়াছে এবং আমি সেই পায়ের উপর হাত দিয়া রহিয়াছি। দর্শন মাত্রেই আমিও মা বলিয়া স্বামীজির হৃদয়ে নমস্কার করিলাম; স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ।' মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পদ অন্তর্হিত হইল। স্বামীজি উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন দেখেছ এই চোকের জলটুকু এতক্ষণ আসিতেছিল না। এখন সব ঠাণ্ডা।

আমি জিজ্ঞসা করিলাম স্বামীজি, আমি আজি একি দেখিলাম?

স্বামীজি। তুই কি দেখ্‌লি তা আমি কি জানি?

আমি। এই যে ছোট টুক্‌টুকে রাঙ্গা পা তোমার হৃদয়ে দেখিলাম।

স্বামীজি। সে যার পা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করগে।

আমি। তিনি কে?

স্বামীজি। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমি। সবই ত বুঝিলাম।

স্বামীজি। বুঝলি না?

আমি। কিছু না।

স্বামীজি। সে দিন যে নট্‌কারকের কথা বলিয়াছিলাম মনে আছে?

আমি। মনে আছে, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

স্বামীজি। হৃদয়ঙ্গম কি অমনি চট্ করে হবে; কর্ম্ম কর তবে কর্ম্মের রহস্য ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

আমি। কর্ম্মত কতই করিতেছি; কত সাক্ষীর জবানবন্দী লিখছি, কত মোকদ্দমা ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিতেছি; টাকা রোজগার করিতেছি, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিতেছি; আবার কি কর্ম্ম করিব।

স্বামীজি। ও সব যাহা করিতেছ তাহা অসৎকর্ম্ম; ভগবদুদ্দেশে যাহা করা যায় তাহাই সৎ আর যা কিছু কর সব অসৎ। কর্ম্মকর অর্থাৎ সৎ কর্ম্ম কর; ষট্‌কারক তত্ত্ব যাহা কর্ম্মের গূঢ় রহস্য, তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

আমি। আজি তুমি আমাকে উহা কিছু কিছু বুঝাইয়া দাও।

স্বামীজি। ভগবান কর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা গীতাতে বলিয়াছেন তাহা এই :—

"ভূত ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সঞ্জিতঃ।"

গীতা ৮ম অধ্যায়।

ভূতানাং ভাবাঃ ভূতভাবাঃ, তেষাং উদ্ভবকরঃ ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ ত্যাগঃ। যে ত্যাগ ক্রিয়া, জীবের ভাবের উদ্ভাবন করিয়া থাকে, উহারই নাম কর্ম্ম। জীবের অন্তরস্থ ভাব সমূহ যাহা প্রসুপ্ত অবস্থায় আছে, উহাদিগকে প্রস্ফূটিত করার নাম কর্ম্ম। দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ ক্রিয়া দ্বারা এই ভাবকুসুম ফুটান কার্য্য সাধিত হয়। Karma is that expenditure of energy which brings about the development of ideas latent in beings. তোমরা সব এম-এ, বি-এ, পাস। অনেক বিষয় ইংরাজী কথা লইয়া ভাব, সেই জন্য আমি ইংরাজীতে কর্ম্মের সংজ্ঞা কি হইতে পারে তাহা বলিলাম। আজিকালকার বিজ্ঞানশাস্ত্রে তোমরা শিখিয়াছ work is the expenditure of energy কিন্তু শক্তির যে কোনরূপ বিসর্গকে আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্ম বলেনা, যে বিসর্গ ভূতগণের ভাবের বিকাশক তাহাকেই কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। দেবোদ্দেশে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহাই কর্ম্মশব্দবাচ্য, কিন্তু যাহা দ্বারা শক্তির অপব্যয় হয় তাহার নাম বিকর্ম্ম।

আমি। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

স্বামীজি। ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রী গমনে শক্তির অপব্যয় হয়, সুতরাং উহা

বিকর্ম্ম; কিন্তু ঋতুকালে স্ত্রী সহবাসে জরায়ু মধ্যস্থ ডিম্বের বিকাশ সম্পাদিত হয়, সেই জন্য উহা কর্ম্ম। জরায়ু ও ডিম্বের কথা যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একটা কথা বলিয়া ফেলি। বলি শুন, প্রত্যেক কর্ম্মই মৈথুন ক্রিয়া; কথাটা অতি গভীর ভাবে শুনিও; মৈথুন ক্রিয়া কথাটা শুনিয়াই আমাকে কুরুচির দাস বলিয়া বসিওনা। সৃষ্টি স্থিতি সংহারের একটি নিয়ম আছে, সেই একই নিয়মে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে। যে নিয়মের বশে গর্ভে সন্তান জন্মে, সেই নিয়মে বৃক্ষে ফল ফলে, সেই নিয়মের বশেই প্রকৃতি দেবীর গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড পরিস্ফূটিত হইতেছে। সেই নিয়মটির নাম কর্ম্ম। সৃষ্টি আর কিছুই নয়; উহা ভাবের বিকাশ। জগৎকর্ত্তার অন্তরে এই জগৎ ভাবরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, কর্ম্মদ্বারা সেই ভাবের ক্রম-বিকাশ হইতেছে, ইহার নাম সৃষ্টি। এই জগৎ ব্রহ্মযোনী মধ্যস্থ কারণ বারিতে ভাসমান ডিম্ব স্বরূপ সেইজন্য উহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। যদি সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝিতে চাও তবে মৈথুন তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহা বুঝি-বার জন্য সাধনা চাই। একজন গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে "যদি আমি পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও দাঁড়াইতে পারি তবে পৃথিবীকে একটি তুলা দণ্ড দ্বারা ওজন করিতে পারি।" তুমি ও যদি তোমার বুদ্ধি দ্বারা মৈথুন তত্ত্ব পরিমাণ করিতে চাও তবে তোমাকে মৈথুনাশক্তি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে। যখন এইরূপ হইতে পারিবে তখন বহির্মুখী বৃত্তি সকল অন্তর্মুখী হইয়া অনন্ত সাগরোদ্দেশে ধাবমান অন্তরাভিমুখী স্রোতে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে তোমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিবে; সেইখানে তখন দেখিতে পাইবে যে একটি মিথুন তোমাকে সৃষ্টিরহস্য বুঝাইবার জন্য একটি পদ্মে উপবেশন করিয়া আছেন; পুরুষ উচ্চারণ করিতেছেন "ওঁ"; স্ত্রী উচ্চারণ করিতেছেন "তৎ সৎ"। ইঁহাদের শরণাপন্ন হও কর্ম্ম রহস্য বুঝিতে পারিবে। এই মিথুন ব্যতীত আর কেহ কর্ম্ম-রহস্য বুঝাইতে সক্ষম নহেন, ইহা নিশ্চিত জানিও। আজি তুমি ইঁহাদেরই একজনের রাঙ্গাচরণ দেখিতে পাইয়াছ। যাও ঘরে যাও, স্ত্রীকে বামে রেখে ঐ রাঙ্গাচরণ ধ্যানে জীবন যাপন কর, আর গায়ত্রীচ্ছন্দে "মা" মন্ত্র জপ করিতে থাক, ক্রমে কর্ম্ম-রহস্য বুঝিতে পারিবে। গায়ত্রীচ্ছন্দ ত্রিপাদ,

সেই ত্রিপাদচ্ছন্দে কেবল মা মা মা বলে ডাক করুণাময়ীর কৃপা লাভ করিতে পারিবে।

আমি। স্বামীজি, তোমার চোক দুটো যেন জ্বলছে।

স্বামীজি। সাবধান যেন পুড়ে যাস্‌নে।

আমি। তা পুড়ি পুড়িব, তুমি এখন আমাকে কর্ম্ম-রহস্য, ষট্‌কারক রহস্য, মৈথূন-রহস্য বুঝাও।

স্বামীজি। আমি কি ছাই বুঝিয়াছি যে তোমাকে বুঝাইব।

আমি। তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহাই বুঝাও। আচ্ছা প্রথমে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সঞ্জিতঃ" গীতার এই কথা গুলির অর্থ তুমি যেমন বলিলে টীকাকারগণত তাহা বলেন না। আমি শঙ্করাচার্য্যের অর্থ ছেড়ে তোমার অর্থ মানিব কেন, তাহা অগ্রে বুঝাইয়া দাও।

স্বামীজি। টীকাকারগণ 'ভূতভাব' শব্দের অর্থ করেন জীবের উৎপত্তি। আমি বলিয়াছি জীবের অন্তরের ভাব যাহাকে ইংরাজীতে Idea বলে। আমি বুঝি যে আমার অর্থেও টীকাকারগণের অর্থে কোন প্রভেদ নাই। মহাত্মা কুথুমীদেব, এ, পি, সিনেট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে আমার যে টুকু স্মরণ আছে বলি শুন।

"Every thought of man upon being evolved passes into the inner world, and there associating—coalescing we might term it, with an elemental becomes an active entity. We are constantly peopling our current in space with creatures of our own begettings, these the Hindus call *Karma* and the Buddhists *Skandha*."

মানবের মানসে উদিত ভাব অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া কোন না কোন এলিমেণ্টালের সহিত মিলিত হইয়া গিয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটি প্রাণীরূপে পরিণত হয়। আকাশের স্রোতে আমরা অহরহ এইরূপ কত কত প্রাণীর সৃজনকরিতেছি; হিন্দুদের "কর্ম্ম" ও বৌদ্ধদের "স্কন্ধ" কথার ইহাই অর্থ।

এই কথা গুলি বুঝিলেই বুঝিতে পারিবে যে ভাবের পরিস্ফুটন এবং ভূতের উৎপত্তি একই কথা।

আমি। এলিমেণ্টাল কথাটির অর্থ কি?

স্বামীজি। এলিমেণ্ট অর্থ ক্ষিত্যপতেজাদি ভূত। এই ভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্যই উক্ত পত্রের এলিমেণ্টাল কথার অর্থ। তোমার তৃতীয় চক্ষুর আবরণ আজি ক্ষণেক অপসারিত হওয়ায় তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পাদপদ্ম অনুভব কবিয়াছ; উক্ত চক্ষুর আবরণ যতই ক্ষয় হইবে ততই ক্রমে অনুভব করিতে পারিবে যে মাটী, জল, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি সকলই কোন না কোন চেতনের আধার মাত্র। ক্রমে যখন তৃতীয় নেত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে তখন বুঝিবে যে ভিন্ন ভিন্ন আধারের যে ভিন্ন ভিন্ন আধিষ্ঠাতা উঁহারা সকলেই এক চেতনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি মাত্র।

আমি। তৃতীয় চক্ষু আবার কি?

স্বামীজি। মাথার মধ্যে পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ড (Pineal gland উচ্চারণটা পাইনিয়াল কি পিনিয়াল ঠিক জানিনা) বলে একটি গ্ল্যাণ্ড আছে। উহাই অন্তর্দৃষ্টি শক্তির আধার। বিবাহাদি মাঙ্গল্য কর্ম্মে পিটুলি দিয়া যে শ্রী (আগ) প্রস্তুত করে, উক্ত পদার্থ সেই আকারের তবে খুব ছোট। ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কি এই পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ডকে হরনেত্র বা তৃতীয় নেত্র বলিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় নেত্র যে শক্তিহীন হইয়া পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ড রূপে পরিণত হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে রহিয়াছে ইহা কোন কোন বিলাতী বড় ডাক্তার ও স্বীকার করিতেছেন। সে দিন Kirkes Handbook of Physiology পড়িতে পড়িতে পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা টুকিয়া রাখিয়াছি।

স্বামীজি এই বলিয়া তাঁহার ঝুলির ভিতর থেকে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া পড়িলেন।

'The pineal gland is the atrophied remains of a third eye situated centrally. This eye is formed in a more perfect condition though covered by skin in certain lizards such as Hatleria.'

Kirkes Handbook of Physiology fourteenth edition page 503.

যাক এখন তৃতীয় চক্ষুর-কথা থাক। কর্ম্মের কারকের কথা তোমাকে বলতে হবে। তা আজি থাক আর এক দিন সে সম্বন্ধে কথা হবে।

শ্রীঅনন্তরাম।

রাধা তারা (পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড)।

মড়ার মুণ্ডে দিয়ে পা
ডেকে বল্লেন কালী মা।
যদি শ্রীরাধারে চাস্
মুণ্ড মধ্যে কর বাস॥
এই পায়ের কর পূজা এই পায়ের কর পূজা।
দেখতে পাবি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মজা॥
তোর মাথার মধ্যে আছে তারা, শ্রীরাধা তার নাম।
শ্রীরূপা দেবী তিনি, শ্রীমন্ত্রের ধাম॥
ভালকরে কর পায়ের পূজা, শ্রী পাবি পিছে।
আমার এই পদতলে তোর শ্রীরত্ন আছে॥
এই পায়ের নাম মায়া, এই পায়ের নাম মায়া।
অন্তরের আকাশে ইহা সংজ্ঞা দেবীর ছায়া॥
আমি সেই সংজ্ঞা দেবী সূর্য্যের শকতি।
সাবিত্রী, কমলা, মহাবিদ্যা স্বরস্বতী॥
হৃদ্‌কুম্ভ তোর পূজার ঘট সুধায় পূর্ণ করে।
দুহাতেতে উঠাইয়ে, মাথার উপর ধরে॥
ধীরে ধীরে জলের ধারা ঢাল মোর পায়ে।
স্নানে তৃপ্ত হয়ে আমি পা নিব সরাইয়ে॥
তখন তুই আকাশেতে কত দেখতে পাবি তারা।
তার মধ্যে একটি হচ্চে তোর মনোহরা॥

তোর কাছেতে সেইটি বড় ঠেকবে জ্বলজ্বলে।
তার ভিতরে তোর রাধা জগৎ উজলে॥
আংটীর মধ্যে ছোট ছবি ঢাকা আতস কাচে।
দেখিছিস ত মণিকাররা দোকানেতে বেচে॥
ছবিটি খুব ছোট্ট, দেখ কাচ মধ্যে দিয়ে।
দিব্য একটি সুন্দররূপ রয়েছে বসিয়ে॥
তেম্নি ধরা রাধা তারা জগতের ছবি ধরে।
যা হচ্চে যা হয়ে গেছে যাহা হবে পরে॥
রাধা আমার হরের আঁখি, বুঝতে পাল্লি কি?
কৃষ্ণরূপ ধরে আমি উহাই সম্ভোগী॥
শুনতে পেলি আকাশেতে বম্ শব্দ ওই।
মহাদেব ডাকিলেন আমি কৈলাসেতে যাই॥

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

অবিদ্যা বৃত্তি।

প্রলয় কালে জীব সকল উপাধি রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। তাহাদিগের বৃত্তি প্রলয় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে অবশিষ্ট হয়। এক ব্রহ্ম জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান তখন থাকেনা। জীব সকল তখন ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করেনা। তখন তাহাদিগের মধ্যে উপাধিগত পার্থক্য থাকেনা। সৃষ্টির অর্থ উপাধিগত ভেদের পুনঃ অবতরণ। বিচিত্রতা লইয়াই সৃষ্টি। আমি পশু, আমি মনুষ্য, আমি দেব, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ম্লেচ্ছ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, এই "আমিত্বের" নানাবিধ ভেদ লইয়াই সৃষ্টি রচনা। যতক্ষণ এই ভেদমূলক বৃত্তি না হয়, ততক্ষণ সৃষ্টি

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "ক্লেশমূল কর্ম্মাশয়ঃ।" অবিদ্যারূপ ক্লেশ হইতেই আমাদের কর্ম্ম। "সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। যতদিন কর্ম্মের মূল অবিদ্যা থাকিবে, ততদিন জন্ম, আয়ু ও ভোগ রূপ কর্ম্মের বিপাক হইবে।

আমাদের সাধন অবিদ্যাবৃত্তির নাশ। কিন্তু যে কালের কথা আমরা এখন বলিতেছি, সে কালে অবিদ্যা বৃত্তির উপাসনা করিতে হইত। অনুযায়ী জীব অবিদ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই দেহ আদি লাভ করে এবং যথাপ্রাপ্ত উপাধির অভিমানী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

যেমন অবিদ্যাসৃষ্টি সৃষ্টি-মূলক, সেই রূপ কুমারসৃষ্টি স্থিতি-মূলক এবং রুদ্রসৃষ্টি লয়-মূলক। এখন আমরা কুমার সৃষ্টি ও রুদ্র সৃষ্টির কথা বলিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

প্রেমের দেবতা।

—*****—

প্রেম একটি অমূল্য রত্ন। প্রেমই মানবের সংসার বন্ধন, প্রেমই মানবের স্বর্গের সোপান, প্রেমই ভগবত লাভের উপায়, প্রেমই মানুষকে দেবতা করে। যিনি পবিত্র প্রেমসুধার আস্বাদ পাইয়াছেন তিনিই ইহার মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ।

কেবল মাত্র স্ত্রী পুরুষের মিলনের নামই প্রেম নহে, প্রেমের গতি বহু ঊর্দ্ধে। প্রেমিক কোনরূপ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া প্রেমার্পণ করেন না, প্রেমদান প্রেমিকের ধর্ম্ম। যিনি প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত প্রেমিক। প্রেম মুখের কথা নহে, প্রেম হৃদয়েরবস্তু। যদি কিছু পবিত্র থাকে যদি কিছু সুন্দর থাকে যদি কিছু অনশ্বর থাকে তবে তাহা একমাত্র প্রেম।

জন বলিয়াছেন "God is love,and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. (I. John)

বস্তুত প্রেম একটি অভিনব পদার্থ। ভগবানও প্রেমের অধীন।

শোলআনা প্রেম ঢালিয়া যে তাঁহাকে ডাকিতে পারে সেই তাঁহাকে পায়। গীতাতে আছে যিনি ভগবানকে যে ভাবে ভজন করেন তিনিও তাঁহাকে তদনুরূপ প্রতিভজন করেন, কেবল প্রেমিক সাধকের ভজনানুরূপ প্রতি ভজনে তিনি অসমর্থ। সেই জন্যই তিনি ব্রজ গোপীদিগের নিকট ঋণী। প্রেম সাধনার দ্বারা ভগবৎ লাভ সুলভ হয়। "কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস"।

সুতরাং প্রেম ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের জন্যই প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মিবার পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ পূজার বিধি, শক্তি পূজার প্রচলন, দানব্রত প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ছিল, ছিলনা কেবল অমৃতময় প্রেম। প্রেমের স্বরূপ তখন অতি অল্প লোকেই বুঝিত, তাই তিনি জগতকে প্রেম বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন।

আহা প্রভু আমার প্রেমে বিভোর, নয়ন মুদিত করিয়া প্রেম পূর্ণ চিত্তে বলিতেছেন "একবার হরিবল" সেই প্রেম পূর্ণস্বরে বিমুগ্ধ হইয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই হরিনামে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই অমৃতময় প্রেমের বন্যায় জ্ঞানীর জ্ঞান তার্কিকের তর্ক, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল।

জ্ঞানী প্রকাশানন্দ সরস্বতী "কৃষ্ণ" বলিতেছেন আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন, সার্ব্বভৌম বাচস্পতির অতুল গাম্ভীর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে তিনি হরি বলিতেছেন আর নৃত্য করিতেছেন, কি মধুর দৃশ্য !!

প্রেম ব্যতীত এমন বিমুগ্ধ করিতে, হৃদয়ে এরূপ অভিনব ভাবের তুফান বহাইতে আর কাহার ক্ষমতা আছে ?

প্রেম বলে কিনা হয় ? প্রেমের দেবতা শ্রীগৌর সুন্দর প্রেম বলে কিনা করিয়াছিলেন ? তিনি যে অসংখ্য অসংখ্য মানব চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ প্রেম। আবার প্রভুর অমানুষিক প্রেম যে কেবল মানবচিত্ত হরণ করিয়াছিল তাহা নহে, দারুণ হিংস্র জন্তু সকলও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। যথা—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥

* * *

ব্যাঘ্রে মৃগ অন্যান্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যান্যে চুম্বন॥ চৈঃ চঃ

যে ব্যাঘ্র মৃগ দর্শন মাত্রে আহারে উদ্যত হয় সেই ব্যাঘ্রও আজ মৃগের সহিত নৃত্য করিতেছে। প্রেমের দেবতা শ্রীগৌর সুন্দর ব্যতীত এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন সংঘটন করাইতে এতাবৎ আর কেহ পারেন নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ দর্শনে, তাঁহার স্পর্শে, তাঁহার নিকট সুমধুর হরিনাম শ্রবণে কত শত জীব যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম অমানুষিক। তিনি যখন শ্রীমতী ভাবে কৃষ্ণ বিরহে আকুল হইয়া রোদন করিতেন সে রোদন দর্শনে, সে বিলাপ শ্রবনে অতি পাষান চিত্তও বিগলিত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতীব প্রামানিক গ্রন্থ সেই গ্রন্থে প্রভুর প্রেমোন্মাদ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘসিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্ত ধার॥"

বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য স্থল উদ্ধৃত করিতে সাহস করিলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলা রাধিকা কৃষ্ণ ভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিতেন, প্রভু ও তাহা করিয়াছেন। শ্রীমতী নবীন মেঘ দর্শনে কৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতি ভ্রমে উন্মাদিনীর ন্যায় চাহিয়া থাকিতেন প্রভুও এইরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভাবিয়া ছুটিয়া যাইতেন। কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া শ্রীমতী বক্তার পায়ে ধরিতেন, প্রেমের গৌরাঙ্গও সেই আচরণ করিয়াছেন,

"প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়া আলিঙ্গন করেন তাহাকে।"

(গোবিন্দ দাসের কড়চা)

ফল কথা শ্রীরাধার প্রেমের অমৃতময় আস্বাদ বুঝাইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ মরভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রেমের গাঢ়ত্ব বুঝিবার জন্য সিদ্ধ বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল।

গোবিন্দ দাস স্বীয় কড়চায় তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
সন্যাসীর ভারি ভুরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে বসি কত কথা কয়।
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন।
প্রভুরে বুঝিতে করে বহু আয়োজন॥

* * *

কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥

* * *

কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্য বালা পড়ে চরণেতে॥

* * *

হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
ঘাড়ি ভাঙি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাহিক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥
ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥
পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥
বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম।
কৃপা করি মোরে প্রভু দেহ হরি নাম॥"

এমন অমানুষিক প্রেম আর কেহ কোন সময় কোন যুগে কোন সমাজে দেখিয়াছেন কি? বস্তুতঃ এ প্রেমের তুল্য নাই মূল্য নাই। প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ। যদি বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষা করিতে হয়, তবে নির্ম্মল চিত্তে প্রভুর লীলা চরিত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা এমন বিশ্ব প্রেমিকের আদর্শ আর কোথাও নাই। শ্রীগৌর সুন্দর জীবের সর্ব্বস্ব ধন। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রভু কিনা করিয়াছেন। যে মধুর কীর্ত্তন সকল শ্রবণ করিয়া আজ ও কত শত দগ্ধ চিত্তে অমৃত প্রবাহিত হয় দয়াল গৌরাঙ্গই তাহা জীবকে দান করিয়াছেন। জীব যে প্রেমময় শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বরূপগত পরিচয় কিঞ্চিন্মাত্র ও বুঝিতে পারিয়াছে তাহা তাঁহারই অসীম কৃপায়। ভক্তি ধর্ম্ম বিদায় লইলে শ্রীগৌরাঙ্গই তাহা পুনসংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণ মধুর পদ সকল রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবের যাহা চাই প্রেমের সাগর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে তাহাই দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ না হইলে কেহই ভাব রসের আস্বাদ পাইত না, বিশ্ব প্রেমিকের আদর্শ ও খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইত। বঙ্গ সাহিত্য ও অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইত। তাই বলিতে হয় শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করিলে জীবের কিছুই থাকে না, জীব অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে। তাই বলি এমন প্রেমের দেবতাকে ভুলিয়া থাকিওনা।

যদি দলাদলি দূর করিতে চাও, যদি বিশ্ব প্রেমে আত্মহারা হইতে চাও, তবে প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমময় মূর্ত্তিখানি সম্মুখে স্থাপিত কর, এমন প্রেমের আদর্শ আর পাইবেনা। এজীবন ক্ষণ ভঙ্গুর ইহার আবার মূল্য কি? এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া দলাদলির আবশ্যক কি? আইস সকলে সমস্বরে "প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের জয়" বলিয়া প্রেমময়ের চরণে আত্মসমর্পন করি॥

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী। (মুস্তোফী)

স্বপ্নে দীক্ষা।

(চতুর্থ সংখ্যার ১১৮ পৃষ্ঠার পর)

আমি এই অমৃত তুল্য কথা শ্রবণ করিতে করিতে যেন আত্মহারা হইতে লাগিলাম। আর যত শ্রবণ করিতে লাগিলাম তত আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল—আমার মনে যাহা কিছু পার্থিব বিষয় স্ফুরিত বা অঙ্কুরিত অথবা বীজ ভাবে ছিল তাহা যেন সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল। আবার গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, আমরা পথ ও উপায় দেখাইয়া দিব, নিজ চেষ্টায় সমস্ত করিয়া লইতে হইবে। জ্ঞান বিকাশ আবশ্যক অতএব আমি এই হস্ত ধরিলাম, আসন হইতে উঠ, তোমার প্রকৃত দীক্ষা হইবে, এই বলিয়া যিনি আমার মন্ত্রদাতা তিনি আমার হস্ত ধরিয়া আসন হইতে উঠাইলেন, আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম, বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কোন উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিতেছি এরূপ ভাবে কিছু দূর যাইয়া এক পর্ব্বত শিখরদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া আমারা সকলে থামিলাম, একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে পর্ব্বত শিখরদেশ তুষার মণ্ডিত ধবলাকার, কিন্তু পর্ব্বত দেশ তুষারাচ্ছন্ন হইলেও কোন প্রকার শীতানুভব হয় নাই। তাঁহারা উভয়ে উপবেশন করিয়া আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন, আমি উপবেশন করিয়া দেখি যে আমরা সকলেই দিব্য আসনে বসিয়াছি,। বড় আশ্চর্য্য হইলাম আসন কোথা হইতে আসিল। সে যাহা হউক আমি আসিলে পর আমাকে গুরু দেব বলিলেন এখন তোমায় দীক্ষিত করিব, দীক্ষার পরেই যাহা যাহা ঘটিবে তাহাতে বিচলিত হইও না। এই বলিয়া দীক্ষা দান করিলেন, আমার বোধ হইল যেন আমি পূর্ব্বে এক মহা অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম যেন মরিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলাম এবং নবকলেবর ধারণ করিয়া গুরুদেবকে গাঢ় ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পূর্ব্বের মন্ত্র দাতাকে বলিলেন দেখ, তোমার তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া ইহাকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিবে ও যাহাতে জ্ঞান বিকাশ হয়, তদ্

বিষয়ে সহায়তা করিবে, বলিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তঃদৃষ্টি করিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম যে, সমস্ত দিক যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দ্বারা প্রতিভাষিত হইয়াছে, তাহাতে আমি আমাকে দেখিতে পাইলাম পূর্ব্ব জন্মে আমি কি ছিলাম ও কি কি করিয়াছি এবং বর্ত্তমান জন্ম সম্বন্ধে যাহা করিয়াছি ও করিতে হইবে ও অপর জন্মে কি হইবে ও কি করিতে হইবে তাহা যেন নাট্যশালার পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় একে একে দেখা দিয়া চলিয়া যাইল। কি ভয়ানক দৃশ্য, আমি মনে মনে যখন যাহা চিন্তা করিয়াছি তাহারা এক একটি জীবন্ত জীব রূপে পরিগণিত হইয়াছে ও হইবে। বুঝিলাম কিছুতেই নিস্তার নাই, হায়! মনে মনে চিন্তা করিলেও কর্ম্ম সৃষ্টি হয়—একি ভয়ানক কর্ম্মবন্ধন। সহসা আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, মন বড় চঞ্চল হইল, আমায় কে যেন হঠাৎ পর্ব্বত শিখর দেশ হইতে ফেলিয়া দিল আমি বায়ু গতিতে পতিত হইতে লাগিলাম—গতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন, পাতাল পুরীতে নামিতেছি, এমত সময়ে কে যেন আমাকে ধরিয়া আমার পতন গতি রোধ করিল—চাহিয়া দেখি ভয়ানক অন্ধকার, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, এমন সময়ে আমার পূর্ব্ব মন্ত্রদাতার স্বর শ্রুত হইল, বলিতেছেন—"দেখ মনুষ্য মাত্রেই কায়-মনোবাক্যে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছে, ভাল হউক আর মন্দ হউক তাহার ফলভোগ অনিবার্য্য। যাহারা এ পথের পথিক তাহারা বহু জন্মের কর্ম্ম এক বা দুই জন্মে ভোগ করিয়া কর্ম্মের অবসান করিতে পারগ হয়; সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে এই পথে আসিতে হইলে বড় যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়; যে সহ্য করিতে পারে সেই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্বজীবের হিতকারী হয়। তোমাকে তোমার কর্ম্ম ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভোগাবসানে লক্ষ্য স্থানে যাইতে সক্ষম হইবে ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। অতএব বৎসে সাবধানে অগ্রসর হও—স্বার্থপরতা একেবারে ত্যাগ কর; সকল প্রকার স্বার্থপরতাই জীবের বন্ধনের হেতু। যদি সকল প্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে না পার তাহাহইলে অনন্তবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে ও কর্ম্ম ভোগ শেষ হইবে না। পশ্চাৎ ও পার্শ্ব দৃষ্টি না করিয়া অগ্রসর হও। সম্মুখে যাহা দেখিবে তাহাতে ভীত, মোহিত বা স্তম্ভিত হইও না ও দাঁড়াইওনা; তোমার গন্তব্য পথ কেহই রোধ করিতে

পারিবে না। এমন কি তাহারা তোমায় স্পর্শ করে করে বোধ হইবে, কিন্তু তুমি সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে তাহারা তোমার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার গন্তব্য পথ হইতে অপসৃত হইবে। পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমার কোন সাহায্য পাইবে না, তবে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ মাত্র পাইলেও পাইতে পার—এই মাত্র তুমি গুরু পতন হইতে আমাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রক্ষা পাইলে।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি মহান্ধকারে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—ঘোর অন্ধকারে চলিতে লাগিলাম, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পদতলে কিছুই অনুভব হইতেছে না যেন শূন্যে ভর করিয়া চলিতেছি—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন বিষয় উপলব্ধি হইতেছে না; সে এক রকম ভাব যাহা আমি ভাষার কথায় লিখিতে পারিতেছি না। ক্রমে একটি মধুর হুঙ্কার ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আরও কিয়ৎদূর অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে পাইলাম যে ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, ক্রমশঃ অন্ধকার তরল হইতে তরলতর হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে একেবারে দশ দিক আলোকে ভরিয়া যাইল।

তখন আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমি শূন্য ভরে চলিয়াছি, চলিতেছি—চলিবার বিরাম নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে দূরে আকাশরূপ মহাসমুদ্রে দ্বীপবৎ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু ভাসমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটিতে যাইবার বাসনা হইবা মাত্র, সহসা আবার ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইলাম। শূন্য, মহা শূন্য, অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার—কিছুই লক্ষ্য হয় না, অথচ এই শূন্যদেশে ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য প্রদেশে চলিতেছি—কেহ পথ প্রদর্শক নাই। নিজেকেই চলিয়া যাইতে হইবেক, আবার এমন শক্তি প্রভাবে চলিয়াছি যে, চলা বন্ধকরা আমার পক্ষে অসাধ্য। সামান্য অন্ধকারে চলিতে হইলে প্রতি পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এই ঘোর অন্ধকারে শূন্য প্রদেশে যে কি আছে তাহা জানিনা—এখানে পদস্খলন হইলে হয়তো একেবারে অতল জলে ডুবিয়া যাইব, তথাপি চলিতেছি বিরাম নাই। এইরূপ কতক দূর অগ্রসর হইতে হইতে আমার সংজ্ঞা ক্রমশঃ লোপ পাইল; যখন আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল—অনুভব করিবার ক্ষমতা আসিল, তখন চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, চতুর্দ্দিকে দিব্য আলোকে পূর্ণ, ঘোর অন্ধকার দূর হইয়া সহসা দশ দিক

উজ্জ্বলিত। আলোক দর্শনে চক্ষু ঝলসিয়া যাইল—বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল। এমন সময়ে কে যেন বলিল—"বৎসে সাবধান,যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ইহা অতীব প্রলোভনের স্থান, কত নর নারী অকালে ইন্দ্রিয় চালিত এই স্থানে আসিয়া এ স্থলের মায়ায় প্রলোভিত হইয়া, বহু জন্ম পিছাইয়া পড়ে ও বহু কষ্ট ভোগ করে।" আমি চক্ষু মুদিত অবস্থায় থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম ও হৃদয় কন্দরে দেখিলাম যে ইহা গুরুদেবের বচন, আমি বলিলাম "দেব আমি কিছুই জানিনা, যেমন পথ দেখাইবেন, যেমন বলিবেন সেইরূপ করিব, তোমার চরণে আমি, আমার সমস্ত এমন কি আমিত্ব পর্য্যন্ত অর্পন করিয়াছি, যেমন করাইবেন তাহাই হইবে।" "তোমার পথ প্রদর্শক হইলাম আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে গুরুদেব অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ চলিয়াছি।

দেখিলাম, কি দেখিলাম কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিব—এক অপূর্ব্ব প্রদেশে উপস্থিত হইতেছি, কি সুন্দর দৃশ্য তাহা কি করিয়া লিখিব। যে, যে বস্তু দেখে নাই তাহাকে তাহার বিষয় বুঝাইতে হইলে, তাহার জানা তদ্রূপ কোন বস্তুর উপমা দিয়া কথঞ্চিত বুঝান যাইতে পারে; কিন্তু এই অপূর্ব্ব প্রদেশের তুলনা নাই। পূর্ব্বে বা পরে ঐ বস্তুর সদৃশ কোন বস্তু দেখি নাই,তখন কেমন করিয়া তাহার উপমা দিব। তবে এই বৃহৎ বস্তুর সহিত একটী ক্ষুদ্র বস্তুর তুলনা দিয়া উহার আকারের কথঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করিব, মাথায় দিবার সামলা পাগড়ী দুইটার মধ্যে একটি গোল বস্তু রাখিয়া দুই দিক দিয়া চাপিয়া ধরিলে সামলার বেড় দুইটা যখন একত্র হইয়া যায়, তখন ঐ গোলকে ও সামলা দুইটির বেড় লইয়া যে আকার হয়, পূর্ব্বোক্ত স্থানের আকারটি তদ্রূপ। উহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়।

উক্ত গোলকের বর্ণ যে কিরূপ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। রামধনুর ন্যায় ইহা নানা বর্ণে চিত্রিত কিন্তু ঐ সকল বর্ণ এত উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধকর যে, রামধনুর বর্ণের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। এক কথায় আমরা বহির্দৃষ্টিতে যে যে বর্ণ দেখিতে পাই উহা সে বর্ণ নহে। ক্রমশ যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই আমার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া গোলকের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে

গোলকের অতি নিকটবর্ত্তী হইলাম, এখন গোলকটী স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ঐ গোলকটিকে যেন একটি বৃহদাকার সর্প বেষ্টন করিয়া আছে। আরও দেখিতে পাইলাম যে,উহার বেশ গতি আছে ও সেই জন্য একটি মধুর হুঙ্কার ধ্বনি বেশ স্পষ্ট শ্রুত হইতেছে। এই সুমধুর হুঙ্কার-ধ্বনি মন আকৃষ্ট করিতে লাগিল। সম্মুখবর্ত্তী গুরুদেব ও আমি ঐ গোলকের বেড়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

উত্তরা খণ্ডে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(চতুর্থ সংখ্যার ১২৯ পৃষ্ঠার পর)

চিন্তামণি পদব্রজে ব্রাহ্মণের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া একটা গহ্বরের মধ্য দিয়া গমন পূর্ব্বক পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইলেন। অদূরে সেই পাহাড়ের পাদদেশে একটা গ্রাম এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি বিটপ-শ্রেণীর অন্তরালে একটি মন্দির; তথা হইতে একটা গোলমাল ও মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতির উচ্চরব আসিতেছিল। তাঁহারা সমধিক সন্নিহিত হইলে, তাহার সহিত নৃত্যও হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পথিকদ্বয় আরও নিকটস্থ হইলে, তন্মধ্য হইতে একজন পক্বকেশী শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ পুরঃসর চিন্তামণির সহচরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে চিন্তামণি ভাবিলেন—"আমার সমভি-ব্যাহারী একজন পরম জ্ঞানী! ইঁহাদের প্রকৃতি কি সরল! পরিচ্ছদ সামান্য দেখিয়া সামান্য লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এক একজন জ্ঞানের ভাণ্ডার, গুপ্ত বিদ্যার আকর! আশ্চর্য্য দেশ—লোকেরাও আরও আশ্চর্য্য!"

তিনি সমভিব্যাহারীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণদর্শীতা ও সহৃদয়তা ব্যতীত বিশেষ কোন লক্ষণ তাঁহাতে লক্ষিত হইল না।

চিন্তামণি এক্ষণে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন—প্রায় শতাধিক নরনারী চক্রাকারে উপবেশন করিল, তাঁহাদের পুরোভাগে একটা বৃহৎ প্রস্তর-স্তূপোপরি একটা অগ্নি জ্বলিতে ছিল।

সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ অগ্নির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—"এটি হিমালয়স্থ যজ্ঞীয় হুতাশন—এই সকল যাযক ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এই উপত্যকায় সর্জ্জরস * জাতীয় আটার ন্যায় এক প্রকার তৈলের একটা উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করেন। তিথি নক্ষত্রানুসারে তৈলবৎ পদার্থ তথা হইতে নির্গত হয়। তিনি মনে করিলেন যে, উহা দাক্ষিণাত্যের গন্দোয়ানা প্রদেশস্থ মহাদেব পাহাড়জাত ভূতৈল জাতীয় হইবে। ঐ তৈল নুব্জ (concave) কাচ পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিলে ভট্টদর্পন নামক প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক দর্পন প্রস্তুত হয়।"

চিন্তা। "আমি সে দর্পনের কথা শুনিয়াছি—কিন্তু তাহার গুণের কথা কিছু মাত্র বিশ্বাস করি না।"

সমভিব্যাহারী কোন অভিপ্রায়ব্যাঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"সে কথা থাকুক যে কথা কহিতেছিলাম—তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে হিমাদ্রির দুরারোহ প্রদেশে গরুনা নামক স্থান হইতে, ভারতবর্ষের প্রাচীন-কালের স্থাপিত যজ্ঞাগ্নি আনয়ন করত এই স্তূপে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং এটি সেই পবিত্র অগ্নির অংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উত্তাপে সেই তৈল পরিশোধিত করিয়া ঐন্দ্রজালিক মুকুর প্রস্তুত হইয়া থাকে।"

এই কথা শুনিয়া চিন্তামণি বিদ্রূপসূচক স্মিতমুখে কহিলেন,—"আপনিও ঐ মুকুরের ঐন্দ্রজালিক গুণ বিশ্বাস করেন? আমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ কাচখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইব না। তখন লোকে 'তোমার চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তোমার দর্শনোপযোগী আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই' ইত্যাদি বলিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি।"

সম। "সম্ভবতঃ আপনাকে দর্পনের শক্তি পরীক্ষা করিতে দেওয়া হইবে। তাহাতে আপনি যদি কিছু না দেখিতে পান, তখন তাহাতে অবিশ্বাস করিলেই ভাল হয়।"

* দ্রবীভূত ধুনার ন্যায় আটা তৈল—গর্জ্জন তৈল।

এই সময়ে বাদ্য যন্ত্র সমূহ তুমুল শব্দে ধ্বনিত হওয়ায় তাঁহাদের কথা বার্ত্তা বন্ধ হইয়া আসিল। পুরোহিত দুইটি অষ্টম বর্ষীয় বালক বালিকার হস্তে দুইটি হাঁড়ি দিলে, তাহারা অগ্রসর হইল; পশ্চাতে পুরোহিত বাদ্য করগণসহ সমপাদবিক্ষেপে পাহাড়ের পাদদেশে গমন পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে একখানি ত্রিকোন প্রস্তর উত্তোলন করিলেন—একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত বাহির হইল ও এক প্রকার বিস্ময়কর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। বালক বালিকাদ্বয় মৃন্ময় হাতা দিয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ তৈলবৎ পদার্থ গর্ত্ত হইতে নিঃশেষে তুলিয়া হাঁড়ি দুটি পূর্ণ করিল। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে প্রস্তরখানি দিয়া গর্ত্তটি আবৃত করিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি একটি হাড়ি, অগ্নির উপরিস্থ একটা লম্বমান ত্রিপদীতে স্থাপন করিয়া জনতার মধ্য হইতে এক যুবযুগলকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

চিন্তামণিকে সমভিব্যাহারী কহিলেন,—"অদ্য রজনীতে এই যুব-যুগলের উদ্বাহ সংস্কার হইবে। ইহারা নিষ্কলঙ্ক—এই পবিত্র স্থানে কাহারও চরিত্র দুষিত হইতে পায়না। উহারা ঐ তৈলের সংস্কার ক্রিয়া সমাধান করিয়া মুকুরের উপযোগী করিবে।"

এই সময়ে বাদ্যযন্ত্র সমূহ মৃদুস্বরে বাজিতে আরম্ভ করিল, প্রথিত যুবক-যুবতী ত্রিপদীস্থ হাড়ীতে অর্দ্ধেক তৈল ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহারা ব্যায়ামের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিল এবং হাঁড়ি দুইটি কখন মস্তকে কখন স্কন্ধে করিতে লাগিল। এই অঙ্গচালনা বা নৃত্য অতীব মনোহর; তাহাতে নীচতা বা কুৎসিত ভাব ভঙ্গী বিন্দুমাত্রও ছিলনা। নৃত্যকালীন সময়ে সময়ে তাহারা একটু একটু করিয়া সমুদয় তৈল ঢালিয়া দিল ও মধ্যে মধ্যে আলোড়িত করিতে লাগিল।

চিন্তামণির মনে কি একপ্রকার অব্যক্ত অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন সমভিব্যাহারী কহিলেন,—"আপনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন?"

চিন্তা। "আজ্ঞা হা!"

সম। "একার্য্য অর্থপূর্ণ—গুরুতর বৈজ্ঞানিক সূত্র বিজড়িত।"

চিন্তা। "আমিত কিছুই বুঝিলাম না।"

সম। "ভূগর্ভস্থ বিবিধ পদার্থ গলিত হইয়া বিশুদ্ধাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে উঠিয়া থাকে। উহা মানব দেহ বিনিস্থত ওজঃ * (aura) নামক পদার্থকে সহসা আকর্ষণ করিতে পারে। অদুষ্ট ওজঃ (Neutral aura) সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাব শিশুদ্বারা সংগৃহীত হইলে, উহার শক্তির হীনতা জন্মে না। উহাতে কোন দুষিত পদার্থ থাকিলে, তাহা অগ্নিতে গলিত হইয়া নিচে পড়িয়া যায়। যে যুবযুগল উহা প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদিগের নৃত্য বা ব্যায়ামের অর্থ এই যে, এই উগ্র পরিশ্রমে তাহাদিগের পবিত্র শরীর হইতে যথা সম্ভব জীবনীশক্তি, মানবীয় আকর্ষণী শক্তি ও তেজঃ শক্তি নির্গত ও উহাতে মিলিত হইয়া, উহাতে এক প্রকার মানবধর্ম্ম সঞ্চারিত করে। বিবাহের দিবস মানবের মন স্বভাবতঃ প্রফুল্ল থাকে এবং পরস্পরের প্রণয়াকর্ষণ ও পবিত্র ভাব সঞ্চারে উহাতে একপ্রকার চৈতন্য ভাব উৎপন্ন হয়। অবিশুদ্ধ শক্তি সঞ্চারিত হইলে উহার সম্যক বিকাশ হয়না এবং উহাকে দ্রষ্টব্য বিষয়ে নির্ভর করা যায় না বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা ॥'

চিন্তামণি অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এরূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা আমি পূর্ব্বে কখন শুনিনাই। জড় বিজ্ঞানালোচনা কালে এ সকল কথা শুনিলে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম।" (ক্রমশঃ)

---

* "ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে।
বীরবিভৎস রৌদ্রেষু ক্রমেণাধিক্যমস্যতুঃ॥"
সাহিত্য দর্পণ।

২য় ভাগ। } আশ্বিন, ও কার্ত্তিক ১৩০৫। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

বিশ্বের হৃদয়যন্ত্র।

প্রথম বহিছে আজি হেমন্ত সমীর।
ধীরে, আত্মীয়ের মত ফিরে চারিপাশ।
স্পর্শে তার কণ্টকিয়া উঠিছে শরীর;
হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলে বিষাদ, উদাস।

অতি ক্ষীণ ক্রন্দনের সুর যেন কাণে
পশিছে সমীরস্বরে; প্রতিধ্বনি তার
ধ্বনিছে পরাণে যেন; কোথা, কোন্ খানে
কাঁদিছে কে? কি ব্যথা বেজেছে বুকে কার?

আমারি হৃদয় একা সে স্বর-বিকল
নহে; হের, দেখ চেয়ে সমস্ত প্রকৃতি
শ্রীহীনা, মলিনমুখী, বিয়ন্ন, বিহ্বল।

মনে পড়ে যেন দূর অতীতের স্মৃতি ;
চোখে আসে জল, প্রাণে বল আসে টুটে'।
মিটে নাই যে পিপাসা তারি হাহাকার
মথিয়া জীবন মন উঠে যেন ফুটে'।
শূন্যতা ভরিয়া যেন উঠে চারি ধার।

জড় প্রকৃতির সনে মানবের মন
চির যুগ জন্ম ধরি এক ডোরে বাঁধা।
কেহ পর নয়, দোঁহে নিতান্ত আপন।
দোঁহার হৃদয় এক রাগিণীতে সাধা।

সুখে দুঃখে দুজনার নিত্য পাশাপাশি।
এক (ই) ব্যথা দুজনার বেজে ওঠে প্রাণে।
এক (ই) হর্ষে দুজনার ফুটে ওঠে হাসি।
চিরদিন চেয়ে দোঁহে দুজনার পানে।

কেগো সে, অলক্ষ্যে বসি' দুজনার প্রাণ
বাঁধি দিল এক সূত্রে মায়ামন্ত্র পড়ি ?
কোথা সে অমর যন্ত্রে রাগিণী মহান্
ধ্বনিয়া তুলিছে কেগো চিরকাল ধরি
নব নব সুরে ?

প্রাণে, তালে তালে তার,
নব নব জেগে ওঠে ভাব দুজনার।
কখনো গৌরবদৃপ্ত সুর, সে বীণার ;
উদ্বেলিত করুণার, কখনো আবার ;
কখনো আনন্দধ্বনি ; কখনো বিলাপ ;
বাজিছে সে মহা যন্ত্রে নিত্য নিশিদিন।

নহে ইহা কল্পনার অসার প্রলাপ ;
ওই বীণাস্বর স্তব্ধ হইবে যে দিন,

বাদনে হইয়া শ্রান্ত, (লক্ষ যুগ ধ'রে)
যেক্ষণ হ'বেন ক্ষান্ত বিশ্রামের লাগি'
বাদক ইহার, হ'বে নিমেষ ভিতরে
মুদ্রিত, মৃত্যুর কোলে ব্রহ্মাণ্ডের আঁখি !

শ্রীমতী মৃনালিনী।

—*:():*—

মোহ-মুদ্গর।

(শঙ্করাচার্য্য-কৃত)

(১)

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥

অর্থ হেতু হাহাকার ছাড় মূঢ়মতি !
হাহাকার ছেড়ে দিলে মনে সুখ অতি।
কর্ম্মফলে যাহা কিছু কর উপার্জ্জন,
তাহাতেই তুষ্ট হয়ে থাক সর্ব্বক্ষণ।

(২)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ ॥

অর্থই অনর্থমূল জানিও নিশ্চয়,
কভু কোন কিছু সুখ নাহি তায় রয়।
পুত্র হইতেও ভয় রাখে ধনী জন,
ইহার অন্যথা কোথা না হয় কখন।

(৩)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

প্রেয়সী তোমার কেবা, পুত্র কে তোমার,
দেখিছ না মনে ভেবে বিচিত্র সংসার!
তুমি কার কোথা হতে এসেছ হেথায়,
একবার মনে ভাই! ভাবিলে না তায়!

(৪)

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন-জন-যৌবনের গর্ব্ব কি কারণ,
দেখিতে দেখিতে কাল করিবে নিধন।
মায়াময় এ সংসার করিয়া বর্জ্জন,
একবার ব্রহ্মপদে সঁপে দাও মন!

(৫)

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং লোকং শোকহতং চ সমস্তম্॥

পদ্মপত্রে বারি যথা করে ঢল ঢল,
সেরূপ জীবন জেনো সদাই চঞ্চল।
এ সংসারে হেন জন না রয় কখন,
রোগশোকে দগ্ধ নয় যার দেহ মন!

(৬)

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

বারেক লইতে তত্ত্ব করহ ভাবনা;
দুদিনের তরে ধনে না কর কামনা।
সাধুসঙ্গে সহবাস ক্ষণকাল ধরি,
সংসার-সাগর পার করিবার তরী।

(৭)

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রা ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

কিবা অষ্ট কুলাচল, কি সপ্ত সাগর,
কিবা ইন্দ্র, কিবা সূর্য্য, কিবা মহেশ্বর,
কিবা তুমি, কিবা আমি, কিবা এসংসার,
কিছু না রহিবে, তবে শোক কেন আর!

(৮)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

যতদিন শক্তি রয় অর্থ আনিবার,
ততদিন ভাল বাসে নিজ পরিবার;
তার পর জরাজীর্ণ হলে পরে দেহ,
কোন কথা একবার জিজ্ঞাসে না কেহ!

(৯)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করিয়া বর্জ্জন,
"কে আমি" তাহার তত্ত্ব কর অন্বেষণ!
আত্মবোধ নাই যার সেই মূঢ়মতি
নরকে পচিয়া মরে;—নাহি তার গতি।

(১০)

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥

দেবালয়-তরুমূল সমাশ্রয় করি,
ভূতলে রচিয়া শয্যা, চর্ম্ম বস্ত্র পরি,
সর্ব্বদ্রব্যে লোভ ছাড়ি বৈরাগ্য যে লয়,
বল কোথা তার সুখ কভু নাহি রয়!

(১১)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণ স্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

বালক লইয়া খেলা সঁপে দেয় মন,
যুবা লয়ে যুবতীরে মত্ত অনুক্ষণ,
বৃদ্ধও লইয়া রয় চিন্তা শত শত,
হায় রে! পরম ব্রহ্মে কেহ নয় রত!

(১২)

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥

শত্রু মিত্র পুত্র কিম্বা আত্মীয় স্বজন,
কারো প্রতি হিংসা স্নেহ না রেখো কখন
সকলে সমান চক্ষে দেখিবে সদাই,
হরিপদ পেতে যদি ইচ্ছা থাকে ভাই!

(১৩)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

জন্ম হইলেই রয় নিশ্চয় মরণ,
জননী-জঠরে পুনঃ করিবে শয়ন!
সংসারে আসিতে হলে এই সব দুখ,
হায় রে মানব! তোর কিসে হবে সুখ!

(১৪)

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥

কিবা দিন, কিবা রাত্রি, সন্ধ্যা, কি প্রভাত
শিশির বসন্ত আদি করে যাতায়াত;
কাল সদা খেলা করে, আয়ু চলে যায়,
হায় তবু আশা রোগ ছাড়িতে না চায়!

(১৫)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥

শরীর গলিল, চুল পাকিল মাথায়,
মুখেরো একটী দাঁত না রাখিল তায়,
হাতেরো কাঁপিছে যষ্টি দেখরে সদাই,
আশাভাণ্ড তবু খালি হলো না রে ভাই!

(১৬)

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥

কিবা তুমি, আমি, কিবা অন্যভূতগণে,
এক বিষ্ণু রন্, তবে ক্রোধ কি কারণে!
দেখহ সবার আত্মা নিজের আত্মায়,
ভেদজ্ঞান মনে যেন স্থান নাহি পায়!

(১৭)

ষোড়শপদ্যঝটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষঃ করোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্॥

ষোলটী কবিতা লিখি দিনু শিষ্যগণে,
পাইবে অশেষ জ্ঞান বুঝে যদি মনে,
ইহাতেও না হইলে বৈরাগ্য সঞ্চার,
কিসে বা হইবে তবে, বুঝে উঠা ভার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

—*:():*—

অনন্ত।

সাধক যুবক এক নিদাঘ নিশায়,
নির্জ্জনে বসিয়া একা সৈকত-বেলায়;

প্রকৃতির মহাগানে, অনন্তের মহাধ্যানে
নিমগ্ন বিভোর প্রাণ স্তম্ভিত চিন্তায়,
দৃষ্টি ঊর্দ্ধে—অন্তরীক্ষে, না আছে ধরায়। ১

নিরব নিস্তব্ধ নিশি, নিরব অবনি,
নিরব জীব-কল্লোল, স্তব্ধ কল্লোলিনী,
ত্রিদিব-আলোক-দ্যুতি স্তিমিত নক্ষত্র-পাঁতি,
ভাতি তার যেন শ্বেত অস্ফুট নলিনী,
পুলক স্ফুরিত-বক্ষে ধরেছে তটিনী! ২

বাহ্য-দৃশ্যে প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যে মহান্,
নহেক আকৃষ্ট সেই মানব-সন্তান;
এ বাহ্য-জগৎ ত্যজি, অন্তর-জগতে মজি,
হয়েছে তন্ময় প্রাণ—নাহি আত্মজ্ঞান,
নাহি জ্ঞান স্থান-কাল—করে কিবা ধ্যান! ৩

সহসা সে শুদ্ধ হৃদে হইল বিকাশ—
বিদূরিয়া কুহেলিকা—আলোক উচ্ছ্বাস!
অনন্তের কি রহস্য, সুমহান্ সেই দৃশ্য,—
ক্ষণিক প্রভায় ক্ষণপ্রভার প্রকাশ—
অন্তরের অন্তঃস্থলে হ'ল সুবিকাশ! ৪

ব্যোম্ ব্যোম্ মহাশব্দে হইল বিদার,
দিক্ শূন্য মহাব্যোম শূন্য পারাবার;
হেরে যুবা শুদ্ধ-মতি, সৃষ্টির নিগূঢ় গতি,
সেই মহাকাশ-গর্ভে অনন্ত অপার,
পুরুষ-প্রকৃতি-লীলা অদ্ভুত ব্যাপার! ৫

কোটি কোটি শশী-সূর্য্য লাঞ্ছিত-কিরণে,
হেরিল জ্যোতি-মণ্ডল ভাতিছে কম্পনে;

সে আলো-গোলক-মাঝে, কি 'কারণ-সিন্ধু'রাজে!
নিদ্রিত সে মহাজলে অনন্ত-শয়নে,
চিন্ময়-পুরুষ মহা মহা-কালাসনে। ৬

সে পুরুষ নাভি-সরে ফুটেছে বিমল,
অযুত-অরুণ-দীপ্ত লীলা-শতদল;
পরমা প্রকৃতি-মাতা, সৃষ্টি-লয়-লীলা-যুতা,
বসি সে কমল'পরে লীলায় চঞ্চল,
জগৎ-জননী-রূপে স্নেহে সুকোমল। ৭

তেজ-জ্ঞান-প্রেম নেত্রে—দেবী' ত্রিনয়নী,
শক্তি-ভাতি শোভে ভালে, শান্তি-স্বরূপিনী;
লীলা-বিলাসিনী সৌম্যা, কভু সংহারিনী ভীমা,
মমতা-স্নেহ-করুণা- মহিমা-শালিনী,
আনন্দ-বিহ্বলা, সৌর জগত-মালিনী। ৮

অপরূপ সে রূপের লাবণ্য-প্রভায়,
প্রভাসিত-শশী সূর্য্য—জ্যোতি তারকায়;
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ময়ী, কালময়ী জগন্ময়ী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ-লীলায়,
ফুটায়—ডুবায় সৌর-জগৎ হেলায়। ৯

ছুটিয়াছে মুক্ত-কেশ কাল-কলয়িত
অনন্ত অম্বরে শূন্য করি আবরিত;
কেশে কেশে শক্তি-মুখে, জ্বলিছে আনন্দে সুখে,
সূর্য্য, মহা সূর্য্য কত, তারা অগণিত,—
বাঁধা কিবা প্রেম-সূত্রে ঘুরে অবিরত! ১০

সেই প্রেম-শক্তি-কেন্দ্র করিয়া বেষ্টন,
ঘুরিছে পরিধিচক্রে অনন্ত ভুবন।

অনন্ত অনন্ত কোটি, জ্বলন্ত জগৎ ছুটি,
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড গর্ভ করি আন্দোলন,
ধায় মহাবেগে—পলে সহস্র যোজন ১১

হেরে যুবা কিবা দীপ্ত ভাস্কর-ভুবন!—
বেষ্টি সূর্য্যে—ব্যবধান অর্ব্বুদ যোজন—
ঘুরে বুধ-ভূমণ্ডল, হর্শেল, শুক্র, মঙ্গল,
বৃহস্পতি, নেপচুন, শনি গ্রহগণ,
সহ চন্দ্র ধূমকেতু বিচিত্র-দর্শন।১২

হেন লক্ষ- কোটি-সৌর-জগৎ অদ্ভুত,
জলদগ্নি মহাসূর্য্যে কতই অযুত,
করে নিত্য প্রদক্ষিণ, ভ্রমি কক্ষে অন্তহীন,—
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি যোজন-বিস্তৃত,
অনন্তের অংশমাত্র করিয়া আবৃত। ১৩

জগতের পর পর কতই জগৎ,
কত চন্দ্র, কত গ্রহ সূর্য্য সুবৃহৎ,
মহা-কেন্দ্র বেড়ি ঘুরে, অনন্তেতে ক্রীড়া করে!
ছুটে কত উল্কা দীপ্ত! ছায়াপথ কত—
দীপ্ত-অণু মরু কোটি-যোজন-বিস্তৃত! ১৪

কত দীপ্ত ধূমকেতু অনল-উচ্ছ্বাস,
দিগন্ত-প্রসারী পুচ্ছে ব্যাপি মহাকাশ,
ছুটিছে অনন্ত কাল, অনন্ত-বক্ষে বিশাল,—
তড়িতের গতি সেই গতির আভাস,
কভু কোন গ্রহ-রাজ্যে কল্পান্তে প্রকাশ! ১৫

হেরিল—স্তম্ভিত যুবা বিস্ময়-বিহ্বল,
কোটি কোটি মহা-সৌর-জগৎ-মণ্ডল,

ফুটিয়া অনন্ত বক্ষে, নিবিছে কভু অলক্ষে,
মহাকাল সিন্ধু গর্ভে তরঙ্গ চঞ্চল;
সৃজন লয়-রহস্য বিধান মঙ্গল। ১৬

পলকে পলকে সৃষ্টি, পলকে বিলয়,
এ 'অনন্ত' মহাঘোর রহস্য-নিলয়!
পলকে অণু-সমষ্টি, করিছে জগৎ সৃষ্টি;—
পলকে পলকে রঙ্গে অনন্তে খেলায়,
পলকে নিয়তি চক্রে অনন্তে মিলায়! ১৭

মহাকাল-পারাবার অনন্ত ব্যাপিয়া,
অতীতের নাহি আদি—দেখায় হাসিয়া!
কাল-বক্ষে উর্ম্মি-মালা— কল্প-কল্পান্তের খেলা,
ধরিতে ভবিষ্য-অন্ত চলেছে ছুটিয়া;—
কোথা অন্ত? হাসে কাল বিশ্ব আঁধারিয়া! ১৮

সে অনন্ত কাল-স্রোতে বুদ্বুদের মত,
ভাসি যায় কত সৌর-জগৎ নিয়ত!
অবিরাম সেই গতি, অদ্ভুত নিয়তি-নীতি,
ইচ্ছাময়ী প্রকৃতির লীলা-নিয়ন্ত্রিত!
বিরাট 'অনন্ত' মহা মহিমা-মণ্ডিত! ১৯

আদি-হীন অন্ত-হীন 'অনন্ত' মহান্,
কল্পনা অতীত, জ্ঞানে নাহি পরিমাণ;
অনন্ত-লীলা তরঙ্গে, অনন্ত প্রেমের রঙ্গে,
'অনন্ত' দাঁড়ায়ে গায় "অনন্তের" গান,—
জগতে জগতে ছুটে প্রতিধ্বনি-তান। ২০

সহসা সচল বিশ্ব হইল অচল,
নিভিল সম্ভ্রমে যত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল!

আবর্ত্তিত অন্ধকার, গ্রাসিল বিশ্ব-সংসার,
পরিণত সে আঁধার অতি নিরমল,
পরমেশ হৃষিকেশে—কি প্রেম-বিহ্বল! ২১

কোটি-রবি-জ্যোতি-ভাতি জলদ-বরণ,
প্রকটিত কি বিরাট-পুরুষ ভীষণ!!
ভীষণ অতি সুন্দর, অনন্ত হৃদি-কন্দর,
রঙ্গভূমি প্রকৃতির লীলা-নিকেতন,
জগন্মাতা বসি সৃষ্টি-স্বপন-মগন! ২২

সে বিরাট-পুরুষের অনন্ত উদর—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ অতি ঘোরতর!
সে সৌর-জগৎ যত, গ্রহ-তারা অগণিত,
আবর্ত্তিত সে উদরে—ঘুরে চরাচর!
হেরিয়া যুবক স্তব্ধ ত্রাসিত অন্তর! ২৩

জলধি-কল্লোলে একি জয়-জয়-ধ্বনি
উথলিল সর্ব্বলোকে—কাঁপিল ধরণী!
গাহিলা অমর-গণ— "তুমি ব্রহ্ম নারায়ণ,
তুমি পিতা বিশ্বপতি, তুমিই জননী,
প্রণমি অনন্তদেব! তোমায় প্রণমি।" ২৪

বিশ্ব-রূপে সে মহত্ত্ব হেরি প্রকটিত,
আপন ক্ষুদ্রত্বে যুবা হল সম্মোহিত;
প্রণমিয়া মনে মনে, জগন্ময় নারায়ণে,
চিৎকারি—"অনন্তদেব!!" হল জ্ঞানহত;
নদী-বক্ষে কি সুন্দর 'অনন্ত' বিম্বিত! ২৫

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

গুপ্তবিদ্যালোচনী সভা।

ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে ভগবানের বিচিত্র লীলা বোঝা ভার! তিনি কখন কাহার দ্বারায় কি অবস্থায় কি কার্য্য সাধন করেন, তাহা তিনিই জানেন তাহার রহস্য ভেদ করে, তুচ্ছ মনুষ্যবুদ্ধির কি সাধ্য?

সে বহু দিনের কথা। আত্মারাম স্বামী নামক খ্যাতনামা জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পরিভ্রমনকালে হিমালয়কন্দরে দৈবযোগে একদা একজন মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করেন। প্রাগুক্ত স্বামিজী গভীর মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হইয়া দীর্ঘোচ্ছাস সহকারে আক্ষেপ করিয়া এই মর্ম্মে বলিতে লাগিলেন "আহা; হতভাগিনী ভারত মাতার ভাগ্য বড়ই মন্দ! সনাতন ভগবদ্ধর্ম্মের ও হিন্দু জাতির অদৃষ্ট ততোধিক মন্দ!! কালের কুটিল গতিতে ক্রমশঃ দিন দিন ধর্ম্মের অধঃপতন ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হওতঃ পাশ্চাত্য জগতের অনিবার্য্য পার্থিবসভ্যতা ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়া জড়বাদ ও নাস্তিকতার সংঘর্ষণে সোনার ভূমি ছারে খারে যাইতেছে; সনাতন ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ ঘোর অমানিশার ঘনান্ধকারে মলিন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী শুদ্ধ নরনারী পরকাল ভুলিয়া ভগবানের প্রেম ভুলিয়া কেবল ঐহিক, ক্ষণভঙ্গুর ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখের মোহমরীচিকায় পতিত হইয়া অহঃরহঃ অবিশ্রান্তভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, কেবলই ক্লেশ—কেবলই অশান্তি! অশান্তি!!অশান্তি!!!" জীব-দুঃখে-কাতর স্বামীজিকে আশ্বাসিত করিয়া মহাত্মা বলিলেন, "কাল চক্র নেমি ভগবানের এক অলঙ্ঘ্য ও দুর্ভেদ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবিরত ঘুরিতেছে, সেই নিয়মের বশে ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত, রাজ্যগত ও ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন অনবরত ঘটিতেছে; সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি, অভ্যুত্থানের পর অধোগতি, অধোগতির পর অভ্যুত্থান, বিপ্লবের পর শান্তি এবং শান্তির পর বিপ্লব ও অশান্তি ইত্যাকার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের দুঃখনিশা অবসানপ্রায়, অচিরেই সুখসূর্য্য পূর্ব্বাকাশকে নবরাগে রঞ্জিত করিয়া সমুদিত হইবেন। জগতের নরনারীর

দুঃখ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া হিমাদ্রি কন্দর স্থিত সিদ্ধাশ্রমবাসী বিশ্বপ্রেমিক সিদ্ধ মহাপুরুষমণ্ডলির আসন টলিয়াছে, জীবের নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ আর তাঁহাদের সহ্য হইতেছে না। উক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে দুইজন যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে ইউরোপীয় একজন রমণী ও একজন পুরুষের দ্বারা পাশ্চাত্য জড়বাদের করাল কবল হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া সনাতন ভগদ্ধর্ম্ম ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ মহাত্মাদের বাক্যের কখনই স্খলন হয়না, অবিলম্বেই সেই ব্যাপারের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে"। তৎপরে আত্মারাম স্বামিজী প্রসিদ্ধ জয়পুর রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া এই সংবাদ জনসমাজে প্রচার করেন।

রুষিয়া দেশ পুরাতন মহাদ্বীপের এবং মার্কিন মুলুক নূতন মহাদ্বীপের অন্তর্গত ; উভয়ের মধ্যে অপার ও দুর্লঙ্ঘ্য মহাসাগর প্রশান্ত বক্ষ বিস্ফারিত স্ফীত করিয়া গম্ভীর ভাবে শায়িত আছেন। কি জানি কাঁহার খেলায় রুষিয়া দেশীয় একজনা রমণী মার্কিন দেশবাসী একজন পুরুষের সঙ্গে যুগপৎ মিলিত হন এবং সেই সময় হইতে তাহারা চিরদিনের মত পরস্পর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে আবদ্ধ হন। এই রমণী সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি এবং পুরুষ তাঁহার সুহৃৎ মহোদয় কর্ণেল অল্‌কট্। ইঁহারা প্রথমে নিউইয়র্ক নগরে একটি সভাস্থাপন করেন। যাবতীয় ধর্ম্ম সকলের গূঢ় রহস্য অনুসন্ধান ও প্রচার করাই উক্ত সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাঁরা ঐ সভার নাম দেন থিওসফিক্যাল সোসাইটি।

আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"

শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি বুঝাইলেন যে যাবতীয় ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য হিমালয়ের গুহাতে মহাপুরুষগণের কাছে নিহিত রহিয়াছে ; ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য মহাপুরুষগণের পরমা প্রিয়তমা গুপ্তবিদ্যা এবং এই বিদ্যালাভ ব্যতীত ধর্ম্মের মূল রহস্য কেহ বুঝিতে সক্ষম হন না। সকল ধর্ম্মের অভ্যন্তরে এক মহান্ সত্য কুজ্ঝটিকায় আবৃত সূর্য্যের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। কুজ্ঝটিকার স্তরের পর পারে না যাইলে ঐ জ্যোতিঃ সন্দর্শন হয় না। শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি বুঝাইলেন যে প্রাপ্তক্ত গুপ্তবিদ্যাই জীবগণকে ঐ কুজ্ঝটিকার পারে লইবার এক মাত্র সোপান। এই গুপ্তবিদ্যা কি তাহারই আলোচনা থিওসফিক্যাল সোসাইটির

প্রধান লক্ষ্য। আমরা সেই জন্য বাঙ্গালা ভাষাতে থিওসফিক্যাল সোসাইটিকে গুপ্তবিদ্যালোচনী সভা বলিলাম। এই সভা নিউইয়র্কে স্থাপিত হইবার পর শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি ও কর্ণেল অল্‌কট্ গুরুআদেশে আদিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। উঁহারা প্রথমে বোম্বাই নগরে পরে মান্দ্রাজের সন্নিকটস্থ আদিয়ার নগরে সভার কেন্দ্রস্থল করিয়া ভারতের ও ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থলে উহার শাখা বিস্তার করেন। এই দুই জনে মিলিয়া গুপ্তবিদ্যার যে জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিয়া মানব ক্ষেত্রে পাতিত করিয়াছেন, সেই আলোক পাইয়া হিন্দু এখন বুঝিতেছেন তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম কি গভীর তত্ত্ব, পূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান বুঝিতেছেন তাঁহার ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়াছে এবং মুসলমান দেখিতেছেন তাঁহার করীম, কলীম ও রহিম তন্ত্রের ক্রীঁ ক্লীঁ ও হ্রীঁ ও তাঁহার অল্লার নূর আর ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর উপাস্য বরনীয় ভর্গ একই কথা। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিদ্বেষভাব এই আলোকের প্রভাবে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইহাই গুপ্ত বিদ্যালোচনী সভার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এক্ষণে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত গুটিকত কথা বলিব। ইহাঁর পূরা নাম হেলেনা পেট্রবনা ব্ল্যাভাট্স্কি। ইনি রুষিয়া নিবাসী কর্ণেল পিটার হানের দুহিতা এবং লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারল এলেক্‌সিস্ হানের পৌত্রী। এই হানদের বংশ জার্ম্মানি দেশের একটী সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল ; ঘটনাচক্রে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রুষিয়া দেশে আসিয়া স্থায়ীরূপে বসতি করিতে লাগিলেন। মাতৃ মাতামহ পক্ষে তিনি হেলেন কেডির কন্যা,ও রুষিয়ার সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি ত্রওরু কেডি ও রাজকন্যা হেলেনা ডল্‌গোরোকীর দৌহিত্রী। এবং রুষিয়ার অন্তর্গত ত্রিভান্ বিভাগেব ভূতপূর্ব্ব সহকারী গবর্ণর এবং ষ্টেটসেক্রেটারি নাইছপোর ব্ল্যাভাট্স্কীর সহধর্ম্মিনী ছিলেন। স্বামী গোত্রে গোত্রিতা হইয়াই তিনি আমাদের নিকট মেডাম ব্ল্যাভাট্স্কী নামে পরিচিতা। বাল্যকাল হইতেই সময় সময় তাঁহাতে দৈবশক্তির আবেশ হইত। এক দিবস তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধ দেহে তাঁহাকে দর্শন দিয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হন ; তদবধি তিনি ঐহিক আমোদ প্রমোদে,সুখ স্বচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, পরিবার পরিজনের, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া স্বদেশের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া বহু পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত

গুরু দেবের অন্বেষণে অনেক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন; এখানে হিমালয় প্রান্তে গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ গুপ্তবিদ্যা উপাসনায় দীক্ষিতা হন এবং সাধনমার্গের প্রধান অঙ্গ সাধন অর্থাৎ গুরু পদে আত্মনিবেদন করিয়া গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। তৎপর গুরু দেবের আদেশানুসারে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে মার্কিন মুলুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নিউইয়র্ক নগরে উপস্থিত হন। তথায় কর্ণেল অল্‌কটের সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়।

এই অল্‌কট্ সাহেব মার্কিন মুলুকে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সৈনিক বিভাগে কর্ণেলের কার্য্য করিয়া পরে ব্যবহারজীবির কার্য্য আরম্ভ করিয়া এক জনা খ্যাতনামা বারিষ্টার ও গ্রন্থকর্ত্তা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মেডামের সহিত মিলিত হওয়ার পর হইতেই অল্‌কট সাহেব তাঁহার যোগবলের অসীম ও অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাহাতে মুগ্ধ হন, এবং তদবধি উভয়ে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হন। কর্ণেল অল্‌কট্ সাহেব ও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলের বলে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া জীবের কল্যাণ কামনায় কেবল সত্যের অনুরোধে মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধবের মমতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাকরিয়া প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এবং শ্রীগুরুর আদেশে উভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ ক্রমে সন ১৮৭৯ সালে প্রকৃতির নন্দনকানন, ভগবান বাসুদেবের ক্রীড়াক্ষেত্র, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে প্রথমে রাজপুরুষ ও ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানারূপ বিঘ্ন বাধা প্রাপ্ত হইয়াও, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কঠোর ত্যাগ স্বীকার, অসীম উৎসাহ ও অটল বিশ্বাসের সহিত কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতেবদ্ধপরিকর হইলেন, হইয়া সর্ব্ব প্রথমে রাজপুরুষদিগের মুখপত্র ইংরাজি পাইওনিয়ার সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সিনেট সাহেবকে স্বমতে আনয়ন করতঃ তাঁহাকে ভারতবাসীদের শত্রু হইতে মিত্ররূপে পরিণত করিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের বিভাগ-নিচয়ের অন্যতম সেক্রেটরী বিখ্যাত হিউম সাহেবকে স্বদলে আনয়ন করিয়া ভারতবাসিদের উপকার সাধনে নিযুক্ত করিলেন; সেই হিউম সাহেবই আজ স্বদেশীয় মহাসমিতির মুখপাত্র মান্দ্রাজকে গুপ্তবিদ্যালোচনী

সভার কেন্দ্র স্থান করিয়া বিবিধ গ্রন্থাদি প্রনয়ন করাতে তাঁহার অসীম ধীশক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমীচীন সমন্বয় ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া দলে দলে বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু, সত্যান্বেষী সম্ভ্রান্ত ও সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়, অদ্বৈতবাদী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এবং শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু সন্তানেরা সনাতন ভগদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থানের এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া ক্রমশঃই তাহাতে যোগদিয়া তত্ত্বসমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন এবং ইউরোপবাসী খ্যাতনামা উচ্চবংশীয় এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন নরনারীগণ দলে দলে আসিয়া সম্মিলিত হইয়া নানা দেশে বহুতর শাখা সমিতির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যাযকেরা দ্বি শতাব্দী যাবৎ অজস্র অর্থব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রম করিয়া যাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সামান্য একজনা রুষ রমণীর প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে, শিক্ষিত, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও নিষ্ঠাবান উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণতনয়েরা যোগদান করিতেছেন দেখিয়া ক্ষুদ্রচেতা কতকগুলি পাদ্রির ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল! এই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মা-ন্দোলন তাহাদের স্বার্থের ঘোর অন্তরায় হইয়া উঠিল দেখিয়া তাহারা নানারূপ কৌশল ও চক্রান্ত করিয়া শ্রীমতী ব্লেভেট্‌স্‌কীর বিরুদ্ধে অযথা কুৎসাও দুর্নাম রটাইতে প্রয়াস পাইয়া শেষে বিফলমনোরথ হইলেন। প্রত্যুত তত্ত্বসন্ধিৎসু, উদারচেতা অনেক জন পাদ্রী তত্ত্বসভায় যোগদান করাতে অন্যান্য পাদ্রীগণ অনন্যোপায় হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। সত্যের দ্বার রোধ করিয়া রাখে কাহার সাধ্য? দ্বিতীয়তঃ তিনি অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সভ্য জগতের নানা দেশে প্রচলিত বিবিধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মৌলিকত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এইরূপ অতি মহৎ ও অতি দুরূহ ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে আর কাহার ও দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রামাণ্য ও মূল গ্রন্থাদি হইতে আবশ্যকীয় অংশ সমুদয় উদ্ধৃত করতঃ বিশেষ ক্ষমতা ও নিপুণতার সহিত তাহার ব্যাখ্যা এবং মন্তব্যপ্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সনাতন পুরাতন ঋষিদিগের ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রাচীন ও বিশুদ্ধ। উক্ত ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিম আসিয়ার অন্তর্গত কেল্‌ডিয়া দেশে, তথা

হইতে মিশরে, মিশর দেশ হইতে পেলেষ্টাইনে ইয়ুদীদের দেশে তৎপরে কাল সহকারে ক্রমে পারস্য ও আরব, চিন, তাতার, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম এই একই ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশে নানা সমাজে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন নানা ধর্ম্মে যে নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল অবিদ্যাপ্রসূত, সমাজ হইতে আধ্যাত্মিক ভাব বিলুপ্ত হওয়াতে তৎসহকারে ধর্ম্মের সার ভাগটী চলিয়া গিয়া এখন ধর্ম্মের খোসা মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই খোসা লইয়াই সম্প্রতি ধর্ম্মে ধর্ম্মে পরস্পর যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে।

গভীর চিন্তা ও আশ্চর্য্য যুক্তি দ্বারা তিনি এই সমস্ত বিষয়ের এরূপ সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এক একটী করিয়া ধর্ম্ম ধরিয়াছেন, সেই ধর্ম্মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রামাণ্য যে সমস্ত দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থাদি আছে, তাহা হইতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বগুলি গ্রহণ করতঃ তাহাদের মুখ্যার্থ এমনই প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা ও তাহাদের ভ্রম প্রমাদ গুলি দর্শাইয়া দিয়া এমনই যুক্তি কৌশলে ও ধীশক্তি বলে মৌলিক ধর্ম্মের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন যে দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়! প্রত্যেক ধর্ম্ম তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন বলিয়া বোধ হয়। প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়সম্পাদন অধুনাতন সময়ে এই প্রথম ব্যাপার।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, শক্তি সামর্থ্যে পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জাতিয়েরা এখন সমগ্র পৃথিবীর অগ্রগণ্য, কেবল তাহারাই যেন চঞ্চলা লক্ষ্মীর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া তাহার ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রাজ্য শাসন এবং ব্যবসায়বাণিজ্য তাহাদের এক চেটিয়া হইয়া আছে, সমস্ত জগত যেন আজ তাহাদের পার্থিব সভ্যতার মোহে মোহিত এবং তাহাদের শক্তির নিকট পরাজিত। কিন্তু হইলে কি হয়? তাহারা যে পরিমাণে এই ভৌতিক সভ্যতা, ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও মানসম্ভ্রম বিষয়ে উন্নত তেম্নি আবার জড়বাদ ও নাস্তিকতার অতল জলে নিমজ্জিত। বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মস্তিস্কপ্রসূত অপূর্ব্ব বিচারশক্তির বলে স্থির করিলেন, জগতে জড় ও জড়ের শক্তি ছাড়া পৃথক চেতন কিছু নাই, পরকাল নাই, ইহকালে

শারীরিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিচয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করাই সুখের চরম সীমা। স্থূলজগৎ ও স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত অপর কোন সূক্ষ্ম পদার্থ নাই, কাজেই আত্মা, মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ; মানেন কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থ মাত্র তাহাকেও বলেন আবার নির্জ্জীব! এই নির্জ্জীব জড় পদার্থ ঘটনা বশতঃ কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও মাত্রায় মিলিত হওয়াতে তাহাতে আপ্না হইতেই শক্তির উদ্ভব হয় এবং সেই শক্তির প্রভাবে জড় পদার্থের আকস্মিক রসায়নিক সম্মিলনে ভৌতিক জগতের সৃষ্টি হইয়া পরে ক্রমোন্নতিতে তাহা স্থাবর জঙ্গমে, জঙ্গমাদি পশুতে, পশু বানরে এবং বানর মানুষে পরিণত হইয়াছে। তবে যে, কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দীন, কেহ বুদ্ধিমান কেহ নির্ব্বোধ ইত্যাকার বিসদৃশ লক্ষণ ও অবস্থা দৃষ্ট হয় তাহার কতক কারণ উপাদান সমিষ্টির অর্থাৎ যে উপদানের সমষ্টিতে দেহ গঠিত হয় তাহার পরিমাণের ব্যতিক্রম এবং অপর কতক কারণ জন্মদাতা পিতা মাতার দোষ। ধর্ম্ম আবার কি? পাপপুণ্য স্বর্গনরক ইত্যাদি করিব কল্পনা মাত্র। নির্জ্জীব পরমাণু সমষ্টির দৈবসংযোগে যেরূপ জীবন তাহাদের আকস্মিক বিয়োগে ও সেইরূপ মরণ। মরিলে পর পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশিয়া যায় কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাকেই বলে জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ। ইহা নাস্তিকতা অপেক্ষা ও ভীষণ!

যে সমাজের এইরূপ বিশ্বাস তাহার পরিণাম যে কি ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ইউরোপ ও আমেরিকা আজ সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরী; কাজেই এই জড়বাদ ও নাস্তিকতা জগদ্ব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার ফলে ধর্ম্মে অনাস্থা, অধর্ম্মে আস্থা হওত পাপের প্রবলবেগ বৃদ্ধি হওয়াতে তদানুষঙ্গিক দুঃখ দুর্দ্দশার দারুণকসাঘাতে আপামর নরনারী যন্ত্রনায় সকরুণ চীৎকার করিতেছে; বিকট মুখব্যাদানকারী এই সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ রাক্ষস জড়বাদের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করার জন্যই শ্রীমতী ব্লেভেট্স্কীর গুরুদেব তাঁহাতে বিশেষ শক্তির সঞ্চারণ করিয়া ধর্ম্ম জগতে নিয়োজিত করেন। পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায়, গণিত, রসায়ন, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ববিদ্যা উদ্ভিদ-বিদ্যা ইত্যাদি যাবতীয় দুরূহ বিদ্যায় অপরিসীম পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া তিনি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তি বলে ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফরাশি রুষিয়া

আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতদের মত গুলি একে একে খণ্ডন করিয়া জড়বাদের ভ্রম ও অসরতা সপ্রমাণ করিলেন।

কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, জগতে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, বুদ্ধিবিদ্যাভিমানী ও কপটধর্ম্মাভিমানীদের দর্পচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সতেজ ও সুতীক্ষ্ণ লেখনী প্রসূত বাক্যবাণের সন্ধানে এবং অসাধারণ ও খরধার তর্ককরবালের দারুণ প্রহারে তাহাদের বহ্বায়াসলব্ধ সিদ্ধান্ত গুলি শতধা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, বৃথাভিমান ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় মোহ নিদ্রায় অভিভূত জগতের নরনারীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে।

গুপ্তবিদ্যার আন্দোলনে পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যজগতের ভীমনাদী নাস্তিকতার স্রোতবেগ প্রতিহত হইয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ উশৃঙ্খলতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। জীর্ণশীর্ণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার হারাধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন; বলিতে কি, ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর ধর্ম্মজগতে পাপের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতকে প্রশমিত করিয়া পূণ্যপ্রেমের এরূপ সুমন্দ মলয়সমীরণ আর প্রবাহিত হয় নাই, হয় নাই! এখন তত্ত্বসভার প্রতিষ্ঠাতাদের প্রণিত গ্রন্থাদিপাঠে যে সমস্ত তত্ত্ব ও উপদেশাদি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সংক্ষেপে তাহার কয়েকটী মাত্র বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) "সত্যাৎ নাস্তি পরোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ সত্য হইতে আর ধর্ম্ম নাই, ইহাই গুপ্তবিদ্যার মূলমন্ত্র।

(২) গুপ্তবিদ্যা শ্রুতি, স্মৃতি, ও পুরাণাদিমূলক ধর্ম্মকে অভ্রান্ত বলিয়া এবং ওঁকারপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনিই একমাত্র সত্য তাহার সত্তা উপলব্ধি করাই জীবের পরমার্থ তবে লোকবিশেষে ও অধিকারীভেদে সাধনপ্রণালির ইতর বিশেষ আছে।

(৩) গুপ্তবিদ্যা বলেন "ইংরোজি, বাঙ্গালা, আরবি, পারশি প্রভৃতি স্থূলশব্দাত্মক ভাষা সমূহ স্থূলজগতের জিনিস। স্থূলজগত আমাদের দশেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ইহা ব্যতীত আমাদের দশেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম লোকাদি রহিয়াছে। সূক্ষ্মরাজ্যে নানাবর্ণাত্মক ভাষা, চিন্তার রাজ্যে চিন্তার ভাষা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিরাজ্যে ভাবের ভাষা রহিয়াছে; অধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভাবরাজ্যের জিনিস, ভগবৎপ্রেমের ভাবতরঙ্গে ও ভাবমদে মাতোয়ারা হও তখন স্থূলজগতের ভাষাপরস্পরের ইতরবিশেষত্ব নিয়া আর বেগ পাইতে হইবে না।

(৪) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "সাধনা স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক বহিরঙ্গা অপর অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা সাধন ব্যতীত অতি গুহ্য অন্তরঙ্গা সাধনে অধিকারী হওয়া যায় না। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশবিধ ধর্ম্ম বহিরঙ্গা সাধনার জিনিস। অন্তরঙ্গা সাধনার উপযোগী হওয়ার পূর্ব্বে স্বার্থ ও অভিমান জন্মেরমত বিসর্জ্জন দিতে হয়। প্রচলিত গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত উপদেশ পাওয়া যায় তাহাও বহিরঙ্গা সাধনার বস্তু, অন্তরঙ্গা সাধন গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

(৫) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রীয়পুরাণেতিহাসাদিতে রূপক ও উপন্যাস ব্যপদেশে সুগভীর, নিগূঢ় তত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে, তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করার সাতটী ক্রম আছে, তদ্বারা এক একটী তত্ত্বের সাত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায়, প্রত্যেক ব্যাখ্যাটীই প্রকৃত। ধর্ম্ম শাস্ত্রগুলি যেন সাততালা বাড়ী সব তালাই চাবি বন্ধ। চিন্ময়ী দেবী গুপ্তবিদ্যার হাতে সাতটি চাবি একটি রিং (Ring) এ ঝুলান আছে, এক একটি চাবি লইয়া যথা ক্রমে প্রথম হইতে সপ্তম তল পর্য্যন্তর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে হয়। এখন এই চাবি গুলি পুনরুদ্ধৃত ও হস্তগত করিয়া শাস্ত্রভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করার সময় আসিয়া, উপস্থিত হইয়াছে।"

(৬) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "ধর্ম্মপিপাসু শিষ্যের অধিকার ভেদে তদনুরূপ গুরুলাভ হইয়া থাকে; গুহ্যতত্ত্ব গুলি গুরুপরম্পরাগত। ধর্ম্মজগতে অধিরোহন করিবার জন্য স্তরে স্তরে উপর্য্যোপরি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি সোপনাবলি সজ্জিত রহিয়াছে। একে একে সেই সোপানশ্রেণী উত্তীর্ণ হইলে পর জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমপদলাভের অধিকারী হওয়া যায়, প্রত্যেক সোপানের গোড়ায় তদুপযোগী একজনা গুরু রহিয়াছেন, যিনি

যদনুরূপ উপযুক্ত হইবেন, তিনিই ক্রমশঃ এক একটী সোপান অতিক্রম করিয়া তদনুরূপ গুরুলাভ করিবেন।

(৭) ধর্ম্ম লইয়া কপটকা ও ভাণ্ডামি করিও না ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া বৃথা আস্ফালন করিয়া লম্ফঝম্ফ দিও না। ঋষিদিগের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসেতু অবলম্বন করিয়া চল নতুবা ভবসমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইবে।

(৮) যে তত্ত্বটী সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে, প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহা নিজের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে তৎপর ও সচেষ্ট হও, শুক্তি সমুদ্রের জীব ; বড় ঝিনুক বিশেষ ; এই শুক্তিতেই মুক্তাফলে ; কথিত আছে স্বাতি নক্ষত্রের বারিবিন্দু লাভের জন্য তাহারা সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়া হাঁ করিয়া থাকে, বারিবিন্দু মুখে পতিত হওয়া মাত্রই মুখ বন্ধ করিয়া গভীর জলে ডুবিয়া যায়, কালে সেই বারিবিন্দু মুক্তারূপে পরিণত হয় ; ঠিক্ সেই রূপ প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি কর।

(৯) গুপ্তবিদ্যা বলেন, আমাদের নিজের ও পরিবারের প্রতি, আত্মীয় বর্গের ও জাতির এবং সমাজের প্রতি দেশের প্রতি, সমগ্র মানবজাতির প্রতি পশু পক্ষী কীট ও পতঙ্গের প্রতি এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণী অপ্রাণী সমস্তের প্রতিই আমাদেয় কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম রহিয়াছে। চিত্ত-শুদ্ধিলাভ জন্য সেই সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন প্রথম প্রয়োজন।

(১০) শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয় ও অনেক আছে মনুষ্য অল্পায়ু, আর জীবনে বাধাবিঘ্নও অনেক তাই হংস যেমন সসলিল দুগ্ধ হইতে সলিল পরত্যাগ করিয়া দুগ্ধ টুকু পান করে, সেইরূপ যে ভাষার সাহায্যেই হউক অপার শাস্ত্রসমুদ্র হইতে সত্যের সারভাগ গ্রহণ করিয়া তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি কর। ভারবাহী বলীবর্দ্দ চন্দন কাষ্ঠের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার সুগন্ধ টের পায় না। তাহার কেবল ভারবহনই সার হয়। তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম প্রাণেপ্রাণে অনুভব না করিয়া কেবল লৌকিক শাস্ত্রে মস্তিষ্ক-ভাণ্ডার পূর্ণ করিলে বলীর্দ্দবৎ ভার বহনই সার হয় মাত্র।

(১১) প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য সেই নিয়মের বশব হইয়া চলার নামইত পুণ্য এবং তাহা লঙ্ঘন করার নামই পাপ। ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করতঃ নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া সেই নিয়মরূপ পুণ্য-ভেলার আশ্রয়ে ভবসমুদ্রের পরপারে যাইবার চেষ্টা কর।

(১২) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "কর্ম্মের গতি অপ্রতিহত, ফল অবশ্যম্ভাবী। যেমন উর্ব্বরা কর্ষিত ক্ষেত্রে ধান্যবীজ বপন করিলে ধান্য, এবং শরিষা বীজ পনে শরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেইরূপ পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মক্ষেত্রে পুণ্যের বীজ রোপন করিলে পরজীবনে সুখভোগ এবং পাপের বীজ রোপন করিলে দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাই ;—

(১৩) অশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত, অটল বিশ্বাসের সাহায্যে দৈবকে নিহত করিয়া পুরুষকার কর। "দৈবে লাভ ও দৈবে অলাভ হয়," অর্ব্বাচীন কাপুরুষেরাই ইত্যাকার উক্তি করিয়া নিরপেক্ষ ভগবানে একদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্ব দোষারোপ করিয়া থাকে।

(১৪) দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই, পরপোকার ব্রত উদ্‌যাপন কর, পরিণামে পরমানন্দ লাভের অধিকারী হইবে।

১৫। প্রকৃতি পুরুষকে ভাল বাসেন, এবং সেই ভালবাসার শক্তি হইতে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে ; গুপ্তবিদ্যা জীবকে সেই ভালবাসা শিখিতে বলেন এবং সেই ভালবাসা সর্ব্বজীবে ন্যাস করিয়া আপনাকে সর্ব্ব ভূতস্থ দেখিতে উপদেশ দেন। এই জন্য গুপ্তবিদ্যালোচনী সভার প্রথম কথা বিশ্বজনীন প্রেম চর্চ্চাকর।

১৬। মানুষের হৃদয় আছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের হৃদয় আছে ইহা আমরা বুঝি কিন্তু গুপ্তবিদ্যা শিখান যে বৃক্ষ প্রস্তর, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ সকলেরেই হৃদয় আছে। বড় বড় গ্রহপিণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুপর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয় আছে এবং সকলেরই স্পন্দন (ধুক্ ধুক্) রহিয়াছে। জগতের যাবতীয় পদার্থের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের আদানপ্রদান অহরহঃ চলিতেছে ; অনন্তব্যাপী এই বিশ্বের অসংখ্য জীবের হৃদয়ভেদ করিয়া এই প্রাণের আদানপ্রদানের স্রোত অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে অনন্তব্যাপী ধ্বনি উঠিতেছে

ওঁ

ভগবান এই ধ্বনির সহিত নিজের অহংজ্ঞান মিলাইয়া দেবী গুপ্তবিদ্যাকে কোলে লইয়া জীবকে বুঝাইতেছেন, যে গুপ্তবিদ্যার জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধরিয়া,

এই অনন্তব্যাপী ধ্বনি হৃদয়ে অনুভব করিয়া, সর্ব্বজীবে আত্মজ্ঞান ন্যস্ত করিয়া, তবে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের কাছে যাইতে হয়। ওঁ

১৭। পরমাপ্রীতিস্বরূপা এই প্রাণের স্রোত জীব যখন হৃদয়ে অনুভব করেন তখনই তিনি ইহার উদ্ভব স্থিতি ও লয়ের রহস্য বুঝিতে পারেন। এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত ; প্রীতির স্রোতের এই সপ্তপদী গমন যিনি বুঝেন তিনিই বুঝেন, তিনিই বুঝেন।

১৮। এই সৌরজগতে ৭টি গোলক অবলম্বনে, প্রাণের তরঙ্গ কেমন কুণ্ডলাকারে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে চলিতেছে, এই স্রোতে ভাসমান জীবগণকে কেমনে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে লইয়া যাইতেছে, গুপ্তবিদ্যা তাঁহার সাধককে ইহাই প্রথমে ধ্যান করিতে শিখান। তার পর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ দেহের মধ্যে এই প্রীতির স্রোত কেমন তালেতালে ৬টি পদ্মভেদ করিয়া সপ্তম পদ্মে গমন করিয়া সাধককে ব্রহ্মানন্দ দান করে তাহা দেখাইয়াদেন।

১৯। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ, ইত্যাদি কত দেবদেবীর কথা হিন্দুশাস্ত্রে আছে ; জড়বিজ্ঞান উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাননা কিন্তু গুপ্তবিদ্যা সাধকের তৃতীয়নেত্র স্ফুরিত করিয়া দিব্যদৃষ্টিদান করিয়া দেখাইয়া দেন যে দেবদেবীরা আছেন ; তাঁহারা মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে গাঁথা। মানবগণ যে সকল ইষ্টভোগসমূহ আস্বাদন করেন দেবগণ সেই সমস্ত ভোগের প্রদাতা। প্রতিদানস্বরূপ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করা, মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

২০। গুপ্তবিদ্যা নূতন বিদ্যা নহে* এই বিদ্যার বীজ মহাপুরুষগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে হৃদয়ে ধরিয়া রহিয়াছেন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই তাঁহারা ঐ বীজ বপন করেন। শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কীর চিত্তক্ষেত্রে তাঁহার গুরু এই বীজ বপন করায় যে সজীব একটি বৃক্ষ জন্মিয়াছে উহাই গুপ্তবিদ্যা-লোচনী সভা। এই বৃক্ষের ফলভোগ যদি কেহ করিতে চান তবে ইহার মূলে জল সেচন করুন।

---

* তন্ত্রের ভাষায় এই গুপ্তবিদ্যার নাম শাম্ভবীবিদ্যা।

"যা পুনঃ শাম্ভবীবিদ্যা গুপ্তাকুলবধূরিব" তন্ত্র। গীতাতে উল্লিখিত রাজ গুহ্যবিদ্যাই এই গুপ্তবিদ্যা। হিন্দুর কাছে, গুপ্তবিদ্যা নূতন পদার্থ নহে। সং

২১। মহাগুরুষমণ্ডলীবেষ্টিত, মহাগুরু মহাযোগী, মহাত্রাণ, মকারাত্মা মহেশ্বরের অঙ্কমধ্যস্থা জ্যোতির্ম্ময়ী রাজবিদ্যাকে মা মা মা বলিয়া ডাক, মার চরণে আত্মনিবেদন কর, দুঃখপীড়িতা পৃথিবী আবার সেই সত্যযুগের ন্যায় আনন্দে ভাসিবে।

মা! কূপের ভেক হইয়া সমুদ্রের চর্চ্চা করা আর আমার পক্ষে তোমার কথা বলিতে যাওয়া সমান কথা ; তবে যে সময়টুকু তোমার উদ্দেশে কার্য্য করি কেবল মাত্র সেই সময় টুকু হৃদয়ে শান্তিলাভ করি, তাই খানিক ক্ষণ তোমার জ্যোতিঃ সমক্ষে ধ্যান করিয়া তোমার সম্বন্ধে যাহা মনে আসিল বলিলাম। যদি কিছু ভুল বলিয়া থাকি অপরাধ ক্ষমা করিও। ওঁ

শ্রীসুদর্শন দাস।

কর্ম্ম।

(পঞ্চম সংখ্যার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

সন্ধ্যার পর স্বামীজির বৃক্ষমূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুইটী অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে একটি দীপ জ্বলিতেছে এবং স্বামীজি একখানি মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা জপ করিতেছেন। বৃক্ষ দুইটির মূল ও আসনের মধ্যস্থল যোগ করিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ হয় ; দীপটি এই ত্রিভুজের ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে। স্বামীজি জপ করিতেছেন এবং অর্দ্ধস্তিমিত নয়ন দিয়া দরদর ধারা বহিতেছে ; পাছে তাঁহার জপের বিঘ্ন হয় সেই জন্য আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে একটু দূরে গিয়া উপবেশন করিলাম। প্রায় আধঘণ্টা বাদে স্বামীজি ভূমিতে সষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পুনরায় আসনে উঠিয়া বসিলেন। আমি তখন নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবা মাত্রই "আরে অনন্ত তোকে অনেক দিন দেখি নাই, বসো" এই বলিয়া একখানি কুশাসনে বসিতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এত ক্ষণ কি হচ্ছিল স্বামীজি ?

স্বামীজি। আরে ভাই ঘর পরিষ্কার করিতেছিলাম আমার দুঃখের কথা আর তোরে কি বলিব বড় মানুষের মেয়ে কেহ যেন বিবাহ না করে বড় জ্বালা বড় জ্বালা ; তোর শ্বশুর কি বড় বড়মানুষ ?

স্বামীজি যেন বহুরূপী। এতক্ষণ তাঁহার যে প্রসান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে ছিলাম এখন মুখের সে ভাব আর নাই; মুখে তখন রহস্য স্থিরতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন স্বামীজি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে নাকি?

স্বামীজি। আরে ভাই স্ত্রীর সঙ্গে নয়; শ্বশুরের সঙ্গে। আমি আমার স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু শ্বশুর বলেন যে তোমার ঘর বড় অপরিষ্কার আমি সেখানে মেয়ে পাঠাইতে পারিবনা; শ্বশুর বলেন যে আগে ঘর পরিষ্কার কর তবে মেয়ে পাঠাইব। বড় মানুষের মেয়ে বিবাহ করা বড় যন্ত্রণা রে ভাই বড় যন্ত্রণা।

আমি। তোমার শ্বশুর কে তা'ত শুনি নাই; তিনি কি বড় বড়লোক?

স্বামীজি। বড় বলে বড়; খুব বড় খুব বড়; তাঁর চেয়ে বড় আর নাই বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম গীয়তে। আমার শ্বশুরের নাম পূর্ণব্রহ্ম। শাশুড়ির নাম হৃদয় কুসুম। পূর্ণ ব্রহ্মের তেজ হৃদয় কুসুমে পতিত হইয়া ভক্তিনীরদা ভক্তি দেবীর জন্ম হয়। এই দেবীই আমার সহধর্ম্মিনী। আমার ঘর ও পরিষ্কার হবে না, শ্বশুর ও তাঁরে পাঠাবেন না। এই বারে শ্বশুরের কাছে গিয়া আত্মহত্যা হব দেখি তিনি কি করেন?

আমি। স্বামীজি তোমার শ্বশুরের কাছে আমাকে পাঠাইতে পার? তাহলে আমি না হয় গিয়া তোমার জন্য কিছু সুপারিশ করি? না আমাকে পাঠাতে ভয় করে পাছে তোমার স্ত্রীর রূপ দেখে ভুলে যাই।

স্বামীজি। না সে ভয় নাই; আমার শ্বশুরের একটি মেয়ত নয় তাঁহার সকল মেয়েরই নাম ভক্তি। তুমি যদি বড় ঘরে বিবাহ করিতে রাজী হও তবে আমি না হয় ঘটকালী করিতে পারি।

আমি। মেয়ের রূপ আগে দেখাও পছন্দ যদি হয় তবেত বিবাহর প্রস্তাব।

স্বামীজি। রূপের কথা আর কি বলিব; জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী! সে শরীর রক্তমাংসের শরীর নহে সৌর জ্যোতিতে গঠিত সে শরীর। কিন্তু চন্দ্রকোটিসুশীতল। দেখ এখনও ঘটকালী করিব কিনা?

আমি। তুমি যে জ্বালার কথা বলিতেছ ঐ শুনেই যে ভয় পায়। আমার

ও বাড়ী বড় অপরিষ্কার কেমন করে যে পরিষ্কার করিতে হয় তাহাও জানিনা তবে আর বিবাহ করে কি করিব; স্ত্রীকে ত আর পাঠাইবেনা; স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে পাইব না তবে আর বিবাহ করে কি হবে?

স্বামীজি। ঘর কি করে পরিষ্কার করিতে হয় তাহা শাশুড়ী বলে দেবেন এখন।

আমি। ঘর পরিষ্কারের পন্থাটা কি তুমি জেনেছ বল না।

স্বামীজি। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মা বলে ডেকে সন্তুষ্ট কর, তিনি তোমায় হৃদকুম্ভ বিষ্ণুপাদক্ষরিত পবিত্র বারিতে পূর্ণ করিয়া দিবেন তুমি সেই জলে মানসভবন ধৌত করিলেই সকল মলা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আমি। স্বামীজি তুমিত এই পন্থা জান তবে কেন ঘর পরিষ্কার করিয়া স্ত্রীকে আননা। তবে কেন বলিতেছ যে বড় জ্বালা বড় যন্ত্রণা?

স্বামীজি। ঐ 'মা' বলে ডাকিতে যে এখন ও শিখি নাই; স্ত্রীলোক রমণী নহে স্ত্রীলোক মাত্রেই জননী এই জ্ঞান যখন হবে তখম 'মা' বলা কথার মর্ম্ম বুঝিতে পায়িব, 'মা' মন্ত্র তখন চৈতন্যলাভ করিবে, তখন 'মা' বলে যাহাকেই ডাকিব তাঁহাতেই হৃদয়ের দেবীর আবির্ভাব দেখিতে পাইব; তখন হৃদ্‌পদ্মাধিষ্ঠিতা দেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিব; তার পূর্ব্বে যে 'মা' আমার দেখা দেন না। তাই ভাই 'মা' বলি আর কাঁদি। তোমরা মা বল পার কাঁদ। অনন্ত, আমার বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল; আমি একটু শুই তুমি আমার বুকে হাত দিয়া বোস।

স্বামীজি তাহার আসনে শুইলেন আমি তাঁহার বুকে হাত দিয়া রহিলাম; স্বামীজি গান ধরিলেন।

হৃদয় চাহিছে তোমারে জননী
এযাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি তোরে মা মা বলিয়ে
নাশিবে না কিগো দুঃখেরি ভার।

স্বামীজির গাণের 'মা' 'মা, ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সে দিনের মত, আমার হৃদয় হইতে একটি তড়িৎস্রোত বাহির হইয়া হাতের ভিতর দিয়া স্বামীজির হৃদয়ে প্রবেশ করিল; সেই সেই দিনকার মত রাঙ্গা টুক্ টুকে ছোট একখানি পা স্বামীজির হৃদয় মধ্যে দেখিলাম; আমিও গাহিলাম

হৃদয় চাহিছে তোমারে জননী
এযাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি তোরে মা মা বলিয়ে
নাশিবে না কিগো দুঃখেরি ভার।

স্বামীজি উঠিয়া বসিলেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন বড় সুন্দর বড় সুন্দর ফের গাহ। উভয়ে সমস্বরে খানিক ক্ষণ গানটি গাহার পর, উভয়েরই হৃদয় মধ্যে ঐ রাঙ্গা পা দেখিতে পাইলাম; এবারে আরও দেখিলাম যে একটি চক্রের মধ্যে ত্রিকোণ এবং উহার মধ্যে ঐ পাদ। ঐ পাদ হইতে একটি মধুর ধ্বনি উঠিতেছে; প্রথমে বোধ হইল যেমন ভ্রমর গুঞ্জন কিন্তু তারপর স্বরে বুঝিতে পারিলাম যে মধুর প্রণব ধ্বনি ঐ গানের ভিতর থেকে উঠিতেছে। আনন্দে বিভোর হইয়া কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম; মিনিট পাঁচসাত বাদে চেতনা হইল তখন দেখিলাম স্বামীজি তাঁহার কমণ্ডলুর জল আমার মুখে দিতেছেন আমি স্বামীজির কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছি। তখনও যেন একটা কি ঘোর রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যে স্বামীজির দেহে আমার মা আসিয়া আমাকে দুধ খাওয়াইতেছেন। এমন বিমল আনন্দ জীবনে কখনও ভোগ করি নাই। স্বামীজি বলিলেন ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ আমি উঠিয়া বসিলাম।

আমি বলিলাম স্বামীজি তুমি আমার গুরু। তোমার ও আমার হৃদয় মধ্যে যে দুইখানি পা দেখিয়াছি উহা তোমারই প্রসাদে, ঐ চরণের ভিতর হইতে যে মধুর প্রণব ধ্বনি শুনিয়াছি উহা আমার কর্ণে এখন ও বাজিতেছে, স্বামীজি তোমাকে নমস্কার।

স্বামীজি। দূর মূর্খ আমি তোমার গুরু কেন হব; তোমার গুরু কে তবে শুন; তোমার ও যে গুরু আমার ও সেই গুরু এবং তোমার স্ত্রীরও সেই গুরু। এই গুরুর শক্তি ত্রিপাদ; তাঁহারই কৃপাতে তুমি আমাদের উভয়ের হৃদয় মধ্যে দেবীর দুইখানি চরণ দেখিয়াছ আর একখানি চরণ তোমার স্ত্রীর হৃদয়ে পড়িয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারে আমরা তিনজনই গুরুর একটি চক্রমধ্যস্থ হইয়া আছি। আমাদের গুরুর নাম ওঁ। ওঁকারের খেলা যখন যা হয় সমস্তই তিনটি হৃদয়ের ভিতর দিয়া

হইয়া থাকে। তিনটি হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে প্রীতির স্রোত বহে উহাই ওঁকারের স্রোত। এই ওঁকারের রহস্য যিনি বুঝেন তিনি পুরুষ, তিনিই গুরু। আমরা তিনজন তিনজনের মধ্যে শক্তির ত্রিপাদ এই ছয় এবং এই উভয়ের স্বামী যিনি গুরু এই সাতের রহস্য বুঝিলেই কর্ম্ম ও কারকের রহস্য বুঝিতে পরিবে।

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি ভেদে গুরুর শক্তি ত্রিবিধ। আমি তুমি তোমার স্ত্রী এই তিন জনে আমাদের গুরুর একটি চক্রে বেষ্টিত আছি। এই তিন জনের মধ্যে আমার হৃদয়ে শক্তির যে পদ দেখিয়াছ উহা জ্ঞানময়ী, তোমাতে যে পদ পড়িয়াছে উহা ইচ্ছাময়ী এবং তোমার স্ত্রীতে যে পদ পড়িয়াছে উহা প্রাণময়ী বা প্রেমময়ী অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিময়ী। বিশ্বপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বজননীর উদ্দেশে আমি যখন 'মা' মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলাম তোমার হৃদয় হইতে একটি প্রীতির স্রোত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ইহা তুমি অনুভব কয়িয়াছ; এই যে ছোট একটী ঘটনা ইহাই অবলম্বনে শক্তি রহস্য চিন্তা কর শক্তির উদ্ভব স্থিতি ও লয় বুঝিয়া পরমা প্রীতি স্বরূপা ওঁকারময়ী দেবী প্রকৃতিকে জানিতে পারিবে; তখন এই প্রকৃতির স্বামী পুরুষকে বুঝিতে পারিবে; এই পুরুষই আমাদের গুরু। জ্ঞানপ্রার্থী হইয়া যে পুরুষ ইহার শরণাগত হন, ইনি তাঁহাকে একটী স্ত্রী ও একটী সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাঁধিয়া একটি চক্রদ্বারা ঘেরিয়া চক্রটি ঘুরাইয়া দেন এবং ঐ চক্রের কেন্দ্র স্থলে নিজে বিন্দুরূপধারী হইয়া আসীন হন। প্রকৃতির স্বামী ভগবান জগৎ গুরুকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে সমীপে আসীন চিন্তা করাই উপাসনা। উপ উপসর্গের অর্থ সমীপে, এবং উপাসনা কথার অর্থ সমীপে আসীন হওয়া।

আমি আজি জগজ্জননীর উদ্দেশে 'মা মা' বলিয়া ডাকাতে একটী প্রীতি স্রোত তোমার হৃদয় হইতে নিসৃত হইয়া আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর হৃদয় হইতে সতীতেজরূপ যে প্রীতি পদার্থ গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত রাখিয়াছিলে উহাই আজি আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছে। গুরুদেব এই তিনটী হৃদয়ের মধ্য দিয়া একটী শক্তি প্রবাহিত করিয়াছেন। আমার অন্তরে জ্ঞানবীজ বিদ্যমান আছে উহারই স্ফুরণ এই ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইবে।

আজি যে তেজ আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছে দেখিয়াছ উহাই আমার হৃদয়ের গর্ভসঞ্চার করিয়াছে; আমি এখন যাহা প্রসব করিতেছি অর্থাৎ যে বাক্য গুলি বাহিরে প্রকাশ করিতেছি উহা আমাদের সন্তান। এই বাক্যগুলির শক্তি যেখান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আবার সেই খানেই লয় হইবে। 'মা' এইকথার মধ্যে যে ভাবটী আছে উহাই আমার কথা গুলির শক্তি। আমার উচ্চারিত 'মা' শব্দ তোমার স্ত্রীর হৃদয় যখন গ্রহণ করিবেন তখন, তিনি ও তুমি ও আমি তিন জনেই বুঝিতে পারিব যে সেই হৃদয় জগজ্জননীর হৃদয়; সেই হৃদয়ের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায়। অনন্ত আকাশের ন্যায় সেই হৃদয়কে তুমি তখন সর্ব্বজীবের হৃদয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে; আমার হৃদয় তোমার হৃদয় এবং তাঁহার হৃদয় এই যে ভেদজ্ঞান এখন তোমার রহিয়াছে তখন সেই ভেদজ্ঞান তোমার ঘুচিয়া যাইবে। এই অনন্ত বিস্তৃত হৃদয় ক্ষেত্রের নাম ব্রহ্মযোনি বা প্রকৃতি। এই ব্রহ্মযোনিজ্ঞান যখন তুমি লাভ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে এই জগতে যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ক্রিয়া চলিতেছে, এই ব্রহ্মযোনিই উহার মূল; ইনিই সমস্ত জগদাধার, ইনিই জগৎ প্রসবিতা; তুমি কিছু নহ তুমি কিছু নহ। ওঁ শব্দের যে স্রোত অনন্তশান্ত সমুদ্রে লয় হইতেছে উহাই সৎ উহাই সৎ ওঁ তৎসৎ। এই ব্রহ্মযোনির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যই আমাদের গুরু; ইহাঁরই নাম শিব। ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়। এই শিব বেদান্ত প্রতিপাদ্য তুরীয় ব্রহ্ম। তুরীয় কথাটির অর্থ চতুর্থ। এখন শিবকে চতুর্থ বলা হয় কেন বোঝ। তুমি, আমি ও তোমার স্ত্রীর হৃদয় দিয়া একটি প্রাণের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় এই তিনটি মিলিয়া একটি দেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; ইহা আমাদের গুরুর প্রথমপাদ; যে শক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া, ও জ্ঞান শক্তিভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া এই তিন জনের হৃদয়ের দেবী স্বরূপে রহিয়াছেন সেই শক্তি আমাদের গুরুর দ্বিতীয় পাদ; কারণস্বরূপা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা রূপা শান্তানন্দরূপা যাঁহাতে এই শক্তি লয় হয় সেই অব্যক্ত ভাব, আমাদের গুরুর তৃতীয় পাদ এবং ইহা ছাড়া আর এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত ভাব যাহা নিত্য সর্ব্বগত, চৈতন্যস্বরূপ তিনি গুরুর চতুর্থপাদ বা পরমপাদ। গুরুর এই চতুর্থ পাদই শিবশব্দবাচ্য।

এই শিবকে 'আমাদের গুরু' 'আমাদের গুরু' বলিতেছি তিনি কি অন্যের গুরু নহেন? তিনি জগতের গুরু, কিন্তু ভাই তুমি জান না কিন্তু আমি জানি যে গুরুদেব আমাদের তিন জনকে একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের তিন কোণে বসাইয়া একটি বৃত্তের গণ্ডি দিয়া বলিয়া দিয়াছেন এই গণ্ডির বাহিরে যাইবে না। অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া গুরুর এই বাক্য যাহা শুনিয়াছি উহার অর্থ এই বুঝি যে এখন আমাদের চিন্তা এই তিনেতেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। এখন তুরীয় শিবকে আমাদেরই তিন জনের গুরু বলিয়া বুঝি এস তাহার পর প্রকৃতিসন্দর্শন লাভ হইলে তিনি যে জগতগুরু উহা বুঝিতে পারিব।

আমাদের তিন জনের যে একটি দেহ হইয়াছে উহার ভিতর দিয়া বেদান্তদর্শন বুঝি এস। আমাদের তিন জনের এই যে একটী দেহ ইহা আমাদের গুরুর স্থূল শরীর, ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তি মিলিত শরীর তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর এবং ত্রিকোণরূপা প্রকৃতি দেবী তাঁহার কারণশরীর আর তিনিই আমি, তুমি ও তিনি। ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ। জগতে আমি ছাড়া যে আর কিছুই নাই ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ।

বেদান্তের পঞ্চকোষের কথা এইবারে বলি শুন; স্থূল দেহের নাম অন্নময় কোষ; ক্রিয়া শক্তির আধারের নাম প্রাণময় কোষ, ইচ্ছা শক্তির আধারের নাম মনোময় কোষ, জ্ঞান শক্তির আধারের নাম বিজ্ঞানময় কোষ, এবং কারণ শরীর বা আত্মযোনির নাম আনন্দময় কোষ।

বেদান্তদর্শনে বিজ্ঞানময় কোষকে কর্ত্তা, প্রাণময়কোষকে কর্ম্ম এবং মনোময় কোষকে করণ বলিয়াছেন। এই তিন জন কোন্ ক্রিয়ার কর্ত্তা কর্ম্ম ও করণ তাহা বুঝ। দেহে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় কোষ, পরিস্ফুট হইবার জন্য প্রাণ চাহে মনোময় কোষ উহা সংগ্রহ করিয়া দেয়। ঠিক যেমন স্ত্রী গর্ভস্থ অণ্ড, পরিস্ফুট হইবার জন্য প্রাণ চাহে এবং কাম উহা সংগ্রহ করিয়া দেয়। আমার ভিতর শক্তির জ্ঞানময়ী পাদ পড়িয়াছে; আমি বিজ্ঞানময় কোষাধিষ্ঠিত হইয়াছি। এই দেহের মধ্য আমি যেন একটী অণ্ড স্বরূপ; আমি ফুটীতে চাই। আমি একটী ছোট অণ্ডস্বরূপ এই ভাবটী যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন আমার এই স্থূল দেহের ভাব আর মনে থাকে না; তখন আমি দেখি যে

আমি একটী গর্ত্তের মধ্যে সুনীল গর্ত্তোদকবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি এবং 'মা মা মা' বলিয়া ডাকিতেছি এবং ঐ মা শব্দের প্রতিধ্বনি ওঁ ওঁ ওঁ শব্দ শুনিতেছি। আমি যখন আপনাকে মাতৃগর্ত্তস্থ মনে করি তখন মার হৃদয় মধ্যে সূর্য্যস্বরূপ তেজ একটী দেখিতে পাই এবং সূর্য্যের মধ্যে একটী শান্ত সুশীতল নবনীরদ-শ্যাম দীপশিখা দেখিতে পাই। এই দীপশিখা অচেতন দীপশিখার ন্যায় নহে, উহা চিন্ময়ী; আমি যে মা বলে ডাকি তিনি উহা শুনেন। অনন্ত তোমার স্ত্রী আমার মা; আমি তাঁহারই হৃদয় মধ্যে ঐ শান্ত সুশীতল শ্যাম বর্ণাভা দেবীকে দেখিতে পাই আমি তাঁহারই গর্ত্তস্থ অণ্ড। এই অণ্ড আপনার পোষণ জন্য প্রাণ চাহে; এই অণ্ড এই প্রাণগ্রহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা কারক; প্রাণ কর্ম্মকারক। এই বিন্দুরূপী বিজ্ঞানময়কোষ কি প্রণালীতে কোথা হইতে প্রাণ গ্রহণ করে তাহা বুঝিবার জন্য মৈথুনতত্ত্ব চিন্তা কর। স্ত্রী গর্ত্তে অণ্ড যে প্রণালীতে পুষ্ট হয় ঠিক সেই প্রণালীতে এই বিন্দুর পোষণ হইয়া থাকে। স্ত্রী গর্ত্তস্থ অণ্ডের হৃদয়, পিতার হৃদয় ও মাতার হৃদয় এই তিন হৃদয়ের ভিতর দিয়া ওঁকারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গর্ত্তস্থ অণ্ডের পোষণ হয় (গর্ত্তাবস্থার সংস্কৃত একটি নাম আছে দৌহৃদাবস্থা, মাতার দেহে তখন নিজের এবং গর্ত্তস্থ সন্তানের এই দুই জনের হৃদয় থাকে বলিয়া উহার নাম দৌহৃদাবস্থা।) গর্ত্তে অণ্ডের সঞ্চার হইলে মাতার হৃদয়ে প্রাণের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। গর্ত্তস্থ অণ্ড যে গর্ত্তের ভিতর বসিয়া মা মা বলিয়া মার নিকট প্রাণ চাহিতেছেন মায়ের হৃদয়ে যে প্রাণ পদার্থ রহিয়াছে উহা কিন্তু অণ্ডের পোষনোপযোগী নহে। ঐ প্রাণশক্তির মধ্যে এক ভাগ অণ্ডের পোষণের অনুকূল, আর দুই ভাগ অণ্ডের পোষণের প্রতিকুল। মায়ের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া পিতার হৃদয় ও চঞ্চল হয়। উভয়ে মিলিত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হন। প্রাণ শক্তির যে দুই ভাগ অণ্ডের পোষণের প্রতিকুল সেই দুই ভাগকে তৃতীয় ভাগ হইতে পৃথক করাই এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। পিতার হৃদয়স্থা, প্রাণ গ্রহণেচ্ছু, ইচ্ছাশক্তিমতী কামাখ্যা দেবী পিতার হৃদয়স্থ তেজ দ্বারা উহা গ্রহণ করিয়া উহাকে ত্রিধারাতে ভাগ করিয়া ফেলেন, একধারা স্বয়ং পান করেন একধারা মাতা পান করেন এবং অণ্ড পোষণের অনুকূল ধারাটী শুক্ররূপে পরিণত হইয়া গর্ভে নিষিক্ত হয়। অণ্ড উহা পান করেন। অণ্ড উহা পান করিয়া আবার

ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন। অণ্ডের দুই অংশ পরিত্যক্ত হয় এক অংশ গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অণ্ডের ত্রিভাগে বিভক্ত হওনটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু অণ্ড যে কেন ত্রিভাগহয় তাহা বুঝেন নাই। তিন খেয়া সূতা পাকাইয়া যে এক এক খেয়া সূতা হয়, এইরূপ তিন খেয়া সূতা পাকাইলে যে এক খেয়া সূতা হয়, মাতৃ হৃদয়স্থ প্রাণ সেইরূপ স্থূল এক খেয়া সূতা, উহা যখন ত্রিধা বিভক্ত হয় তখন প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তখনও প্রত্যেক ভাগটী ত্রিতয়ী। অণ্ডের পোষণ জন্য কিন্তু অতি সূক্ষ্ম প্রাণ প্রয়োজন। অণ্ড তাই সূক্ষ্ম প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজে তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং উহারই এক অংশে অতি সূক্ষ্ম একটী ধারা ধরিয়া, ঐ ধারা দ্বারা চেতন পুরুষের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন এবং অপর দুইটী ধারা অন্য দুইটি অংশে মিলিত করিয়া ত্যাগ করেন।

মৈথুনক্রিয়াটা তাহা হইলে কি হইল বুঝ। উহা অণ্ডের প্রাণভোজন ক্রিয়া। অণ্ড অত্তা প্রাণ অন্ন।

এই ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় তাহা দেখ। অণ্ডের প্রেরণায় প্রেরিত কামাখ্যা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়। যে কাম অণ্ডের প্রেরণায় প্রেরিত নহে, উহা দৈবীশক্তি নহে, উহা আসুরীশক্তি উহাকে নিকটে আসিতে দিও না।

সুনীল সন্ধ্যাগগনে একটি মাত্র নক্ষত্রের রূপ দেখিয়া আকুল প্রাণে কখনও কি তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অনন্তের মহিমা ধ্যান করিয়াছ? এই ধ্যান করিতে করিতে কখনও কি এরূপ মনে হইয়াছে যে, এখন আমি যে দেহকে আমি বলিয়া মনে করি, সেটা বাস্তবিক আমি নহি! আমি ঐরূপ একটী আকাশের নক্ষত্র, আর কোথায় আছি? এই কোথায় কোথায় কোথায়—ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত জগৎ এক আনন্দময় আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই ভাবে কি কখনও মগ্ন হইয়াছ? তা যদি হইয়া থাক তবেই তুমি জগজ্জননীর অব্যক্ত আনন্দময় রূপ অনুভব করিতে পারিবে। এই যে সুনীল শান্ত গগনের একটি নক্ষত্রের রূপ উহাই হৃদয়াকাশস্থ বিজ্ঞানময় কোষের রূপ। বেদান্ত দর্শনের মতে ইনিই কর্ত্তা ও ভোক্তা। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় ইনিই কল্পান্ত স্থায়ী লিঙ্গ। ইঁহারই সংসার চক্রে ভ্রমণ হইয়া থাকে। ইনিই পরিস্ফুট হইলে

বিদ্যারূপ ধারণ করেন। আমার হৃদয়নিহিত জ্ঞানের বীজ যখন সম্যক্ ফুটিবে তখন তোমার হৃদয়স্থ ইচ্ছাশক্তি অন্তর্মুখী হইবেন এবং তোমার স্ত্রীর হৃদয়স্থ প্রাণ আবরণশূন্য হইয়া বিশ্বপ্রাণ বিশ্বজননীর রূপধারণ করিবেন। তোমার স্ত্রীর হৃদয় হইতে যে তেজ আকর্ষণ করিয়া অণ্ডরূপী আমার বিজ্ঞানময় কোষে নিহিত করিয়াছ, অন্তর্মুখী ইচ্ছা শক্তি দ্বারা উহা আবার আমার হৃদয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিশ্বজননীর আধারে ন্যস্ত করিও; প্রাণ যেখান হইতে আসিয়াছে সেই খানে ফিরিয়া যাইবে, চক্র পূর্ণ হইবে; তখন আমরা তিনই এক ইহা বুঝিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিব।

বিজ্ঞানময় কোষের প্রাণগ্রহণ সময়ে তোমার স্ত্রীর হৃদয় অপাদান কারক ছিল এবং আমার হৃদয় অধিকরণ কারক এবং তোমার হৃদয় করণ কারক ছিল, বিজ্ঞানময় কোষের প্রাণত্যাগের সময় আমার হৃদয় অপাদান কারক, তোমার হৃদয় করণকারক এবং বিশ্বজননীর হৃদয় অধিকরণ কারক হইবে। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ এবং সন্ন্যাসীর উভয়াত্মক লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া প্রাণের এই যে চক্র ঘুরে, ইহা বুঝিতে পারিলে নিজেরই দেহের উর্দ্ধ মধ্য ও অধঃ এই তিন খণ্ডে উক্ত ত্রিবিধ লিঙ্গের দর্শন হইবে এবং উহাদের ভিতর দিয়া শক্তির যে খেলা হয় তাহা দেখিতে পাইবে। এই লিঙ্গ, যোনি, বেদির রহস্য যিনি জানেন তিনিই শিব। তিনিই ধন্য তিনিই ধন্য।

স্বামীজি গান ধরিলেন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন,

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার ধাম,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিছে নাম,
উঠিয়ে তরঙ্গ হের মাতাল নরনারী
ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী *

ওঁ তৎ সৎ

স্বামীজি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন আমার সব মনে নাই। যাহা লিখিলাম তাহাও ঠিক তাঁহার কথা লিখিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না।

শ্রীঅনন্তরাম।

* ইহা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত কিছু পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।
পং সং

অদৃশ্য সহায়।

অনেকের বিশ্বাস এই যে মানব অনাথ অসহায়ভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে। তাহার শোকের সময় সান্ত্বনা করিবার, বিপদের সময় উদ্ধার করিবার, মানসিক দুর্ব্বলতার সময় হৃদয়ে বলাধান করিবার কেহই নাই। মানুষ যেন ভগবানের পরিত্যক্ত সন্তান। মানব পিতা পুত্র কন্যার আপদ বিপদে প্রাণপণ করেন, আপনার ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের চরম অবধি উৎসর্গ করেন; কিন্তু বিশ্বপিতা যেন এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর যে, অনন্ত শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি জীবের দুঃখ কষ্টে উপেক্ষা করেন। এ বিশ্বাস নাস্তিকেরই উপযোগী। যাঁহারা ভগবানে শ্রদ্ধাযুক্ত, যাঁহারা দেবতা ঋষি মহাত্মা প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ এবং তাঁহাদের অনুকম্পা ও পরহিতব্রতের অল্পমাত্রও উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে প্রত্যয় করিবেন যে, মানবের বিপদ মোচনের জন্য, জীবের সহায়তা করিবার জন্য, ইঁহারা সদাই উদ্‌যুক্ত রহিয়াছেন। এই তত্ত্বের প্রতিপাদক কয়েকটি সত্যমূলক ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়া লুসিফার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত ঘটনার বিবরণগুলি কোনরূপে অলীক বা অতিরঞ্জিত নহে। পন্থার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা উক্ত বিবরণ সংগৃহীত করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতে মনস্থ করিয়াছি, এই সংগৃহীত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। 'অনাথের দৈব সহায়' ঘটনাগুলির দ্বারা সেই প্রাচীন সত্যের নূতন প্রামাণ্যতা উপলব্ধি হইবে। পাঠক আরও লক্ষ্য করিবেন যে, নিরাশ্রয় শিশুর উপরই অধিকাংশ স্থলে দৈব কৃপা বর্ষিত হয়। এরূপ হওয়াই সঙ্গত।

(১)

কয়েক বৎসর অতীত হইল লণ্ডন নগরস্থ হলবর্ণ পল্লিতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ অগ্নিকাণ্ডে যে দুইটি গৃহ ভস্মসাৎ হয়, তন্মধ্য হইতে একটি শিশুর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। অগ্নি সংযোগ বার্ত্তা পরিজ্ঞাত হইবার পর ধূম কর্ত্তৃক রুদ্ধশ্বাস একটি বৃদ্ধ

ও একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক ব্যতীত সকলেরই হুতাশনের করাল কবল হইতে উদ্ধার সাধন হইল। সাময়িক গোলোযোগ ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত সকলেই বালকের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল।

শিশুর মাতা বিশেষ কার্য্যানুরোধে সেই গৃহস্বামিনীর হস্তে তাহাকে ন্যস্ত করিয়া সেই রাত্রের জন্য কল্‌চেষ্টার গমন করিয়াছিলেন। সকলের উদ্ধার সাধিত ও গৃহটি সম্পূর্ণ অগ্নি বেষ্টিত হইলে, হস্তন্যস্ত শিশুর কথা গৃহস্বামিনীর মনে পড়িল। তখন গৃহস্বামিনী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—বালকের শয়ন প্রকোষ্ঠ হইতে তাহার উদ্ধারের আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু জনৈক অগ্নি নির্ব্বাপক (Fireman) বালকের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় ধূম ও অগ্নিরাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সম্পূর্ণ অনাহত অবস্থায় তাহাকে বাহির করিয়া আনিয়া তৎসম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করিল।—"আমি প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গৃহের যে অংশে বালক শয়িত ছিল তথাকার বরগা সকল অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু অগ্নিশিখা এরূপ অভূতপূর্ব্ব ও অস্বাভাবিক ভাবে বক্রগতিতে গৃহ বেষ্টনপূর্ব্বক বাতায়ন পথে নির্গত হইতেছে যে, তদ্দ্বারা বালকের শয্যার দিক মাত্রও স্পৃষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ঘটনা আমার চক্ষে পড়ে নাই এবং আমি উহার কারণ নির্দ্দেশে অক্ষম। বালক অতিশয় ভীত হইয়াছিল। আমি অসীম সাহসে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, মহতীশ্রীসম্পন্ন রজতোজ্জ্বল এক মূর্ত্তি আনতাবস্থায় পর্য্যাঙ্কের আবরণ মসৃণ করিতেছেন।"*

এতৎ সম্বন্ধে আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কল্‌চেষ্টারে ঐ শিশুর জননী যেন তাহার বিপদ জানিতে পারিয়াই রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও আশঙ্কিত বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জননীর কাতর প্রার্থনায় ভগবান কর্ণপাত করিলেন।

* এই ধরনের একটি ঘটণার বিষয় আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। ঘটণাটি এইরূপ।

কয়েক বৎসর গত হইল কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া নিবাসী সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব ডেপুটিকলেক্টর শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিশু দৌহিত্র উচ্চ ছাদ হইতে

(২)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেড্‌স্‌হেড্‌ নামক স্থানে শটেরাব্রুক্ নিবাসী তিনটি বালক ধাত্রী সহ গুণটানা নৌকায় টেমস্‌ নদীতে ভ্রমণ করিতেছিল, হঠাৎ নদীরবাঁকে একটা গুণটানা অশ্ব সহসা দৌড়িয়া যাওয়ায় উহাদের মধ্যে দুইটি বালক জলে পড়িয়া যায়। এই দুর্ব্বিপাক দর্শনে নৌকারোহী তাহাদিগের উদ্ধার কামনায় জলে লম্ফ প্রদান করিল, কিন্তু দেখিল তাহারা জলে ভাসিতে ভাসিতে তীরাভিমুখে যাইতেছে, তাহাদের ধাত্রীও সেইরূপ দেখিয়াছিল। পরে বালকগণ বলিল "একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণ পুরুষ তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিই আমাদিগকে তুলিয়া ধরিয়া তীরে আনিয়া দিয়াছেন।" শিশু দুইটি যখন জলে পতিত হয় তখন ধাত্রীর চিৎকারে নৌকারোহীর কন্যা ছৈ হইতে বাহির হইয়াছিল, সে দেখিল যে একটি সুন্দরী রমণী বালকদ্বয়কে তীরে তুলিয়া দিতেছেন।

(৩)

প্রসিদ্ধ পাদরী জন মেসন্‌ নীল এই ধরণের একটি ঘটনার সুন্দর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"একব্যক্তি আপন সদ্যমাতৃহীন শিশু সন্তানগণকে লইয়া এক আত্মীয়ের পল্লীভবনে বাস করেন। গৃহটি পুরাতন, তাহার নিম্নতলে কতকগুলি অন্ধকারময় গলি ছিল, বালকগণ সেই সকল গলিতে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ম্লান মুখে উপরে আসিল এবং তাদের মধ্যে দুইজন বলিল "একটা গলির মধ্যে আমাদের মাতা সহসা দেখা দিয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।" পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বালকেরা আর একটু অগ্রসর হইলেই, একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপে নিপতিত হইত। স্নেহময়ী মাতা স্বর্গে থাকিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে পুত্রগণকে অবলোকন করিতেছিলেন। তাহারা অজ্ঞাতসারে যে বিপদে পড়িতে যাইতেছিল, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার উপায় তিনিই উদ্ভাবন করিলেন।

পৈঠার উপর পড়িয়া যায়,তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিক হইতে লোকজন আসিয়া তাহাকে তুলিল। বালক প্রথমে বড়ই ভীত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণ মধ্যেই বলিয়া উঠিল "আমার একটু ও লাগে নাই, মা কালী আমাকে কোলে করিয়া নামাইয়া দিয়াছেন।"

(৪)

অল্পদিন হইল একজন ইংরাজ বিশপের শিশু কন্যা মাতার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে যেমন অতর্কিত ভাবে পথপার হইবে অমনি মোড় হইতে হটাৎ একখানি গাড়ি ঘুরিয়া আসায় সে অশ্বগণের পদতলে পতিত হইল। সন্তানকে বিষম আহত মনে করিয়া মাতা সসব্যাস্তে তাহাকে তুলিতে যাইতেছিলেন,কিন্তু সে হাসিতে হাসিতে বলিল "মা আমার একটুও লাগেনাই—অশ্বগণ আমার অঙ্গে পা দিতে না দিতে একটা অতি শুভ্র পদার্থ আমাকে বলিল 'ভয় নাই'।"

(৫)

পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইল তাহাতে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই সহায়তা কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণিত ব্যাপারে উপকারকের পরিগৃহীত মূর্ত্তি অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল, এজন্য উহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী।—

বাকিংহাম সায়রস্থ বরহামবিচের জনৈক কৃষক সঙ্গীসহ ধান্য ছেদন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়;তাহাদিগের শিশু সন্তানদ্বয় স্বাধীন ভাবে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে বনভ্রমণে নির্গত হইয়া বহু দূর গমনান্তর পথ হারাইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময়ে কৃষক ও কৃষক পত্নী পরিশ্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিল শিশু দুইটি গৃহে নাই, তখন তাহারা কিয়ৎক্ষণ প্রতিবাসীগণের নিকট অন্বেষণানন্তর অনুসন্ধান না পাইয়া ভৃত্যগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। ভৃত্যগণ অনেক অনুসন্ধান ও ডাকাডাকিতে কোন সম্বাদ না পাইয়া বিষণ্ণ মনে প্রত্যাগত হইল। তখন কিয়দ্দুরে একটি আলোক প্রান্তর প্রদেশ হইতে পথের সন্নিহিত হইতেছে দেখা গেল। আলোকটি সাধারণ আলোক হইতে বিভিন্ন—প্রজ্জলিত সুবর্ণ গোলোকবৎ। আলোকটি নিকটবর্ত্তী হইলে তন্মধ্যে পথভ্রষ্ট বালকদ্বয় দৃঢ় পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাহাদিগের জনক কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে আলোক প্রতি ধাবিত ও নিকটস্থ হইলেও উহা অন্তর্হিত হইলনা; কিন্তু তিনি শিশুদ্বয়কে ধারণ করিবামাত্র উহা পলকমধ্যে অদৃশ্য হইয়া তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া গেল।

পরে শিশুদ্বয় ঘটনাটি এইরূপ বর্ণনা করিল—"নিশাগমে আমরা কিয়ৎক্ষণ

ক্রন্দন করিতে করিতে অরণ্য ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলাম, অবশেষে নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিলাম। ক্ষণকাল পরে একটি সুন্দরী রমণী দীপহস্তে আমাদিগকে উঠাইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে আনিতে লাগিলেন, আমরা কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোন উত্তর না দিয়া একটু মধুর ঈষৎ হাস্য করিলেন।"

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পৌরাণিক কথা।

কুমার, রুদ্র, প্রজাপতি ও সপ্তর্ষি।

অবিদ্যা বৃত্তি জাগরিত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্ম কল্পে কুমার চতুষ্টয়কে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি কল্পে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্ব প্রধান এই কুমারগণ, বিষ্ণুর সহকারী হইয়া প্রতি কল্পে মনুষ্যদিগকে সত্বভাবাপন্ন করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেও, তাঁহারা স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। যখন সৃষ্টির অবনতি হইতে উদ্ধার করিবার কাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করেন।

তান্ বভাধে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব পরায়নাঃ॥ ভাপু ৩—১২—৫

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "হে পুত্রগণ, তোমরা প্রজাসৃষ্টি কর।" কিন্তু বাসুদেব পরায়ণ মোক্ষ ধর্ম্মের অনুগামী কুমারগণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন্ নাই।

তখন ব্রহ্মা কুমার নীল লোহিতকে প্রকাশিত করিলেন, তিনি জন্ম গ্রহণ

করিয়াই উদ্বিগ্ন বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "হে বিধাতঃ আমার নাম ও স্থানের নির্দ্দেশ করুণ।" ব্রহ্মা বলিলেন, যেহেতু তুমি রোদন করিলে, এই জন্য তোমার নাম "রুদ্র" হইল। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য চন্দ্র এবং তপস্যা—এই সকল স্থান তোমার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত এই তোমার একাদশ নাম। ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রানী, এই তোমার একাদশ পত্নী। এই সকল নাম, স্থান ও পত্নী বিশিষ্ট হইয়া, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর। রুদ্র প্রলয় কার্য্যের সহকারী। স্বাধীন ভাবে প্রজা সৃষ্টিকরা তাঁহার কার্য্য নয়। তিনি প্রজা সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট রুদ্রগণ বিশ্বনাশে তৎপর হইল। ব্রহ্মা তখন তাহাদিগকে সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। যদিও রুদ্রদেব প্রলয় কার্য্যের বিশেষ অধিনায়ক, তথাপি ভগবতীর সহিত সংযুক্ত হইয়া তিনি সৃষ্টি ও স্থিতি উভয় কার্য্যেরই সহায়তা করেন। ভগবতী দক্ষকন্যা হইয়া সৃষ্টির কোন কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, পর্ব্বত কন্যা হইয়া কিরূপে তিনি প্রবৃত্তি মার্গের সহায়ক হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে যোগমায়া রূপে নন্দ গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সাধন করিয়াছিলেন, এবং রুদ্রানীরূপে সেই কাল কামিনী আবার কিরূপে প্রলয় কার্য্যের অধিনেত্রী হইবেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। সৃষ্টির আরম্ভে এখন আমরা কুমার ও রুদ্রগণের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করি।

এইবার আমরা প্রজাপতিগণের কথা বলিব। যে সকল ঋষিগণ সৃষ্টির আরম্ভে সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সৃষ্টির এবং প্রবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকে প্রজাপতি বলে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষিই প্রধান প্রজাপতি। এতদ্ভিন্ন ভৃগু, দক্ষ ও কর্দ্দম প্রভৃতি ঋষিকেও প্রজাপতি বলে। বর্ত্তমানকল্পে প্রজাপতিদিগের সহিত নারদ ঋষিরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য প্রজাপতি সৃষ্টির সহিত, তাঁহার সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বাস্তবিক একল্পে নারদ ঋষি প্রজা সৃষ্টি করেন নাই।

প্রভুত শক্তিসম্পন্ন প্রজাপতিগণও সৃষ্টি ব্যাপারে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা এই দম্পতীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি এই তিন কন্যা। আকুতির সহিত রুচির, দেবহূতির সহিত কর্দ্দম ঋষির এবং প্রসূতির সহিত দক্ষ প্রজাপতির বিবাহ হইয়াছিল। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যাগণ মরীচি আদি সপ্ত ঋষির সহধর্ম্মিনী।

অত্রি ঋষির তিন পুত্র—চন্দ্র, দত্রাত্রেয় এবং দুর্ব্বাসাঃ। তাঁহারা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব অংশ সম্ভূত। "অত্রি" শব্দের অর্থ তিন হইয়াও এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন হইয়াও এক। উপনিষদে "অত্রি" "ঋষি" অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে অত্রি ঋষি কেবল প্রলয় কার্য্যের ব্যঞ্জক। প্রতি জীবশরীরে সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কার্য্য নিয়ত, চলিতেছে। এই তিন কার্য্য জীবের আত্ম প্রসূত। অত্রিই জীবের আত্মতত্ত্ব। চন্দ্রের সহিত জীবসৃষ্টির সম্বন্ধ আছে। এই জন্য চন্দ্রকে ব্রহ্মার অংশ বলা হইয়াছে। জীব সকল চন্দ্রের রশ্মি অবলম্বন করিয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

অঙ্গিরাঃ ঋষির চারি কন্যা—সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি। এবং তাঁহার দুই পুত্র উতথ্য ও বৃহস্পতি। সিনীবালী ও কুহূ অমাবস্যা রাত্রির নাম। রাকা ও অনুমতি পূর্ণিমার নাম। অমাবস্যা ও পুর্ণিমা রজনীতে আমাদের শরীরস্থিত রসের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উপনিষদে "অঙ্গিরস" ঋষি অঙ্গের রস বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বৃহতি ছন্দের পতি বৃহস্পতি। ঋগ্বেদে বৃহতী ছন্দে লিখিত অনেক মন্ত্র আছে, যাহার ঋষি "অঙ্গিরস" বৃহস্পতি। "অঙ্গিরস্" শব্দে যে রস বুঝায়, তাহকে প্রাণ বলিয়া বৃহদারাণ্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পুলস্ত্য ঋষির দুই পুত্র—অগস্ত্য বা জঠরাগ্নি এবং বিশ্রবাঃ। বিশ্রবাঃ ঋষির পুত্র কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। যক্ষ ও রাক্ষস দ্বারা আমাদের শরীর মধ্যে তামসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নিদ্রা, কামাচার, ব্যভিচার ও সকলরূপ বিপরীত কর্ম্ম তামসিক ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। শুভ বাসনার সহিত মিলিত হইয়া কামের প্রেরণা আমাদের মঙ্গল বিধায়ক হইতে পারে। বিভীষণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

পুলহ ঋষির তিন পুত্র—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু। এসকল উত্তম মানসিক গুণের পরিচারক।

ক্রতুর পুত্র ষষ্টিসহস্র ক্ষুদ্রকায় বালিখিল্য ঋষি। যখন সূর্য্যদেব রথে আরূঢ় হইয়া পরিক্রমণ করেন, তখন এই সকল ঋষি রথের অগ্রভাগে গমন করেন এবং সূর্য্যদেবের স্তুতি করেন।

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽ ষুষ্টপর্ব্বমাত্রাঃ ষষ্ঠি সহস্রানি পুরতঃ সূর্য্যং মুক্ত-বাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তবন্তি ॥ ভাঃ পুঃ ৫-২২-১৭।

অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব মাত্র এই সকল ঋষি আদিত্য মণ্ডলবর্ত্তী আধিদৈবত পুরুষের অনুগামী।

বশিষ্ট ঋষির চিত্রকেতু আদি সাত পুত্র। স্বয়ং রঘুকুলতিলক এই ঋষির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা মনুষ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করে। অরুন্ধতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ঋষি দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ স্থল।

মরীচি ঋষির পুত্র কশ্যপ। প্রাচেতস দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা বিবাহ করিয়া কশ্যপ ঋষি ভিন্নজাতীয় জীব সকলের সৃষ্টি করেন। দক্ষ প্রজাপতির ক্ষেত্রে মরীচি পুত্র কশ্যপের প্রেরণায় নানা জাতীয় জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। মরীচি ভিন্ন অন্য ঋষি জীবদেহ নিহিত তত্ত্বসমূহের প্রেরক এই সকল ঋষির অনুগ্রহে আমরা ত্রিলোকের মধ্যে সকলরূপ ভোগ ও অপবর্গ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঋষি দিগের সহিত ভৃগু ঋষিরও বর্ণনা পুরাণ মধ্যে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, ভৃগু ঋষি মহর্লোকের অধিকারী। এক তাঁহার অনুগ্রহে আমরা মহর্লোক পর্য্যন্ত লাভকরিতে সমর্থ হই।

ঋষি তর্পণে, দক্ষের পিতা প্রচেতাঃ ঋষির এবং ভক্তি মার্গের অধিনায়ক নারদ ঋষির ও উল্লেখ আছে।

মরীচি আদি সপ্তঋষি সপ্তর্ষি মণ্ডলের অধিনায়ক হইয়া মন্বন্তর মধ্যে আপন অধিকার বিস্তার করেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি যে ঋষির ভাবাপন্ন, তিনি সেই ঋষির অধিকারভুক্ত। দের সকল মন্ত্রের ঋষি আছে। সকল

জাতির, সকল মনুষ্যের ও ঋষি আছে। মন্বন্তর মধ্যে ঋষিদিগের যাহা কার্য্য তাহা মন্বন্তের বিশেষ বিবরণে জানিতে পারিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(পঞ্চম সংখ্যার ১৬১ পৃষ্ঠার পর)

আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, ঐ বেড় ও গোলক যখন এত উজ্জ্বল তখন হয়ত কোন প্রকার সুবর্ণসদৃশ পদার্থে নির্ম্মিত, কিন্তু ঐ গোলক ও উহার বেড় যেন বাতাস দ্বারা গঠিত বলিয়া বোধ হইল, অথচ বাস্তবিক পক্ষে যে উহা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিলামনা। সেই সময় আরও আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে আমার শরীর যেন আর রক্তমাংসের নাই উহা যেন বাতাস অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বোধ হইল। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গুরুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র তিনি সহাস্যবদনে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এই গোলকটি সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টি মাত্র, ইহার নাম পিতৃগ্রহ। সমস্ত খনিজ দ্রব্য হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রথমে এই গ্রহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে আদি বা পিতৃ (পিতৃ শব্দে পিতা মাতা উভয়েই) গ্রহ বলে। ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, এখানে সমস্ত দ্রব্যাদি ও জীব, জন্তু এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্ত বাষ্প অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ভূতে গঠিত। এই গ্রহের মনুষ্যের ভৌতিক ক্ষমতা অতি অদ্ভুত—ইহাদের ভৌতিকদেহ এত সূক্ষ্ম যে, তাহারা দেহসাপেক্ষ কর্ম্ম গুলি ইচ্ছা মাত্র সমাধা করিতে পারে। কিন্তু তাহারা তাহাদের শরীরের দাস, শরীরের উপর প্রভুত্ব নাই। এখানে অনেক প্রকার প্রলোভনের বিষয় আছে, তাহাতে পড়িলে একেবারে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা, কেননা ভৌতিক ক্ষমতাই প্রধান প্রলোভনের

বিষয় ; তাহাতে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। এই ভৌতিক ক্ষমতা বিষধর সর্পের ন্যায়। বিষধর সর্প দেখিতে সুন্দর, বশে রাখিয়া খেলা-ইতে পারিলে বড় প্রীতিকর, কিন্তু অসাবধান হইলেই ঐ বিষধর সর্প দংশন করিয়া মৃত্যু উপস্থিত করে। আরও দেখ—এই গ্রহের একধার হইতে বেড়টী উঠিয়া যেন সর্পাকারে বেষ্টন করিয়া আছে এইজন্য বেড়কে শক্তি,ও গোলককে রুদ্র বলে। এই গ্রহের বিষয়ে অনেক গুহ্য রহস্য আছে,যাহা প্রকাশযোগ্য নহে। তবে এইটি জানিয়া রাখিবে যে যাবতীয় জীব জন্তু ও মনুষ্যের ক্রমপরিণামের চক্র এই গ্রহ হইতে আরম্ভ হইয়া অধঃস্রোতে চলিয়া চতুর্থ গ্রহ পর্য্যন্ত গিয়া সেইখান হইতে উর্দ্ধস্রোতে চলিয়াছে। ইহার বিবরণ পরে বিস্তারে জানিতে পারিবে। এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই গ্রহের মনুষ্যেরা প্রত্যেকেই স্ত্রী শক্তি এবং পুং শক্তি এই উভয়বিধ জননশক্তি একাধারে ধারণ করে।

এই গ্রহের আটটী চন্দ্র আছে তাহা যথাক্রমে দেখিতে পাইবে। এই গ্রহকে নানা শাস্ত্রে নানা নাম দিয়াছে এক কথায় বলিতে গেলে ইহাকে আদি বা মূলগ্রহ বলা যায়।"

এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও যাহা যাহা বলিলেন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ করিলাম। আর আর অনেক বিষয় শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিলাম যাহা বর্ণনাতীত ও প্রকাশ নিষিদ্ধ। এই গ্রহ হইতে সূর্য্য-দেবকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইল। উহা উজ্জ্বল ও আকাশবৎ সূক্ষ্ম পদার্থ প্রতিভাত হইয়া দশদিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার দিবা রাত্র, প্রায় ত্রিশগুণ বড়। আমাদের এক মাস এখানকার এক দিনের সমান। এখানকার মনুষ্যেরা এত উচ্চ যে, আমরা যে সমস্ত বিষয়কে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক বলিয়া গণ্য করি, তাহা তাহাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। আমাদের পৃথিবীর যে সমস্ত লোকেরা কেবল অনিমা লঘিমাদি সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা করেন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে এই গ্রহের মনুষ্যের ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু ইহাঁদের ন্যায় সূক্ষ্মতনুর বশীভূত হইয়া প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া, সিদ্ধির মাদকতায় মত্ত হইয়া, আত্মহারা হইয়া থাকেন। ইহারা আমাকে কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। এই সময়ে সম্মুখবর্ত্তী গুরু-দেবও সহসা অন্তর্ধান হইলেন—তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বড় সমস্যায় পড়ি-লাম ; কিন্তু তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে জাগরূক থাকায় গুরুদেবের ও ইষ্টদেবের চরণ স্মরণ করত অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তাঁহারা আমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত "তোমার যাহা আবশ্যক তাহাই পাইবে, যে সিদ্ধি চাহিবে তাহা, এমন কি, সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি চাও তাহাও পাইবে, ঈশ্বরত্ব করিতে চাও তাহাও পাইবে।" এই প্রকার কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতে দেখাইতে আমার সহিত চলিতে লাগিল। আমি এখন বিষম পরীক্ষায় পড়িয়াছি,—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুরুদেব ও ইষ্টদেব স্মরণ করত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন আমি গুরুদেব ও ইষ্টদেব এক হইয়া তন্ময় হইলাম আমার আর পৃথক সত্বা রহিল না,তখন আর কোন প্রকার দৃশ্যও রহিল না। যখন আবার আমার নিজের সত্বার জ্ঞান আসিল তখন দেখিতে পাইলাম যে. তাহারা আর আমার নিকট কেহই নাই, ও দেখি যে গুরুদেব প্রফুল্ল বদনে আমার সম্মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, আমি ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন রাত্র হইয়াছে, —আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্ত হইতেছে। যথাক্রমে এই গ্রহের সপ্তচন্দ্রের উদয় ও অস্ত দর্শন করিলাম। যদি আর একটি উজ্জ্বল চন্দ্রবৎ নক্ষত্রকে চন্দ্র বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে, এই গ্রহের সর্ব্ব সমেত আটটি চন্দ্র আছে। চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক গূঢ় রহস্য আছে যাহা প্রকাশ নিসিদ্ধ। একটি রহস্য বলিয়া রাখি যে, প্রত্যেক গ্রহ সময় বিশেষে দেহ পরিবর্ত্তন করে ও মৃত দেহ পড়িয়া থাকে, তাহাকে শব বলে ও তাহারই সাহায্যে সাধনার নাম শব সাধনা। প্রথমে এই গ্রহের যে স্থল হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম এইবার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দশদিক নিরীক্ষণ করিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম যে, তাড়িতালোক অপেক্ষা উজ্জ্বল আলোকে দশদিক আলোকিত। সেই আলোক আমার দৃষ্টিশক্তি সহ্য করিতে পারিলনা। আমি বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার সঙ্গা লোপ পাইতে লাগিল ও ক্রমে আমি আলোক হইতে অন্ধকার,অন্ধকার হইতে মহা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। তাহার পর কি হইল বুঝিতে পারিলামনা। আমার যখন চেতনা হইল, উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আসিল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে পূর্ব্ববৎ অন্ধকার ও শূন্য পথে চলিতেছি। এবার এই শূন্যপথ পূর্ব্ববৎ

নিরাপদ নহে—নানা বাধা বিঘ্নপূর্ণ কত প্রকার ভয়ানক ভয়ানক কাম জীবাদি দ্বারা পূর্ণ। এই কাম লোকের কথা পরে বলিব। গুরুদেবের চরণ কৃপায় কামলোকের সপ্তশাখা অতিক্রম করিয়া, কখন গুরুদেবের আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান কখন আলোক, কখন অন্ধকার, পর্য্যায় ক্রমে সন্দর্শন পূর্ব্বক ক্রমাগত শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনেক ক্ষুদ্র গ্রহাদি দর্শন করিয়া অবশেষে একটি বৃহৎ গ্রহের নিকট যাইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া:(অর্থাৎ সঙ্গাদি লোপান্তর) উপস্থিত হইলাম। এই গ্রহের আকার পরিমাণ ও সত্ব সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে এই গ্রহ দূর হইতে একটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায় দেখিতে, ও আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। যখন গ্রহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম,তখন গুরু উপদেশে বুঝিতে পারিলাম যে এই গ্রহের ভৌতিক দেহ পূর্ব্ব গ্রহাপেক্ষা ঘনীভূত অর্থাৎ বাষ্পীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। উজ্জ্বল শ্বেত ইহার বর্ণ, যেন স্থির তাড়িতালোক এখানকার সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ জীব জন্তু ও মনুষ্য পর্য্যন্ত বাষ্পীয় সূক্ষ্ম ভূতে গঠিত। এই স্থলের জীবগণেরাও সূক্ষ্ম শক্তিশালী, কিন্তু পূর্ব্বের কথিত গ্রহবাসীগণ অপেক্ষা ইহাদের দেহের উপর প্রভুত্ব আছে এবং সেই জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী স্থিতি-শীল।

প্রথম গ্রহে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া শক্তির মোহ যাহাদের কথঞ্চিত দূর হইয়াছে এবং আপন দেহ কিছু পরিমাণ আপন আয়ত্বাধীন করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা এই দ্বিতীয় গ্রহে জন্মলাভ করেন।

পূর্ব্ব গ্রহে মনুষ্যমাত্রেই যেমন উভয়বিধ জননশক্তি সম্পন্ন, এখানেও সেই-রূপ স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই।

প্রথম গ্রহটি অতীব সূক্ষ্ম ভূতে গঠিত, উহাতে গুরুত্ব নাই ; এই দ্বিতীয় গ্রহটি প্রথম গুরু দেহ সেই জন্য ইহার নাম গুরু। এবং স্ব শক্তির অধিষ্ঠান বলিয়া ইহার নাম স্বাধিষ্ঠান। এই গ্রহের চারিটি চন্দ্র আছে। এখান হইতে সূর্য্যকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া বোধ হয় ও এখানকার দিবা রাত্র আমাদের অপেক্ষা বারগুণ বড় বলিয়া বোধ হইল। এই গ্রহ সম্বন্ধে আপাততঃ যৎ-কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া হইল, পরে কিছু বলা যাইবে।

এই গ্রহের সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও এখানের ও নানা প্রকার প্রলোভন

হইতে উদ্ধার হইয়া, যে স্থান হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব গ্রহ হইতে এই গ্রহে আসিবার পূর্ব্বে যেমন যেমন ঘটনা হইয়াছিল এইবারে আবার সেইরূপ ঘটনা সকল ঘটিল এবং তৃতীয় গ্রহে উপস্থিত হইলাম।

এখন হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে গ্রহগণের নামোল্লেখ করিব। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহ অনেক পরিমাণে স্থূল ও এই গ্রহের ভৌতিক দেহ ঘনবাষ্পীয়ভূত অর্থাৎ তরল পদার্থের ন্যায়। দেখিতে জবাকুসুমাপেক্ষা উজ্জ্বল রক্ত বর্ণের। আকার অপ্রস্ফুটিত রক্ত পদ্মের ন্যায় ও বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহের প্রাকৃতিক দৃশ্য কোন কোন অংশ আমাদের পৃথিবীর সাদৃশ আছে ও এই গ্রহের মনুষ্যের দেহ তরল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও উল্লিখিত গ্রহদ্বয়ের মনুষ্যের মত ইহারা শরীরের সম্পূর্ণ বশ নহে ; ইহাদের মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রহে থাকিবার সময় আমার দেহও এই গ্রহবাসের উপযোগী পদার্থে পরিণত হইয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা স্থূল দেহধারী মনুষ্যের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যদি এই গ্রহ আমাদের পৃথিবীর ন্যায় স্থূল ভূতে গঠিত হইত তবে এ স্থলের প্রাকৃতিক শক্তি যেরূপ তাহাতে ইহা চিরতুষারাবৃত থাকিত। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রহে সূর্য্যের তাপ যেরূপ এখানে উহা তদপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভব হয় না। এখানে জীব জন্তুর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই ; কোন কোন স্থানে মনুষ্য মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে কিন্তু উভয় জাতিরই জনন শক্তি সমান। পৃথিবীর মানবের পক্ষে যাহা খুব উচ্চ দরের শক্তি তদ্রূপ শক্তিশালী মনুষ্য এখানে বিস্তর ; ইঁহারা সকলেই স্বাধীন ; কেহ কাহারও বশীভূত নহেন ; স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বীর ; ইঁহাদের তরল অগ্নিময় রক্তিম মূর্ত্তি এত সুন্দর যে সকলেই যেন কার্ত্তিকেয়, তবে কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রম ভাব আমাদের পৃথিবীরই মত।

এই গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর কোন কোন বিষয়ের সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক বিভিন্ন। নদ, নদী, সাগর, উপসাগর, দেশ, মহা-দেশ, দ্বীপ উপদ্বীপাদি অনেক বিভাগ আছে ও শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাদি ঋতু সকল ভোগ হয়, কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তবে প্রকৃতপক্ষে

যে কি, তাহা পার্থিব বাক্যে প্রকাশ হয় না। মনুষ্যেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক দলে একজন দলাধিপতি আছে। প্রায়ই একদল অন্য দলের সহিত দ্বন্দ করিয়া থাকে, ইহারা ক্রিয়া সকল অমানুষিক ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত ক্রিয়াকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া থাকি ও যেখানে বিজ্ঞান শাস্ত্র অন্ধ যে সমস্ত এখানে নিত্য সহজ ক্রিয়া, আর এখানকার অলৌকিক ঘটনা দ্বিতীয় গ্রহের মনুষ্যের সহজ সাধ্য ও দ্বিতীয় গ্রহের যাহা অলৌকিক ঘটনা তাহা প্রথম গ্রহের সহজসাধ্য। যথাক্রমে এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গুরুদেব ও অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন। আরও কিয়ৎদ্দুর অগ্রসর হইবার পরে দেখিলাম যে একটি অতি মনোরম পর্ব্বত সম্মুখে রহিয়াছে, ক্রমশঃ আমরা সেই পর্ব্বতে উঠিলাম। পর্ব্বতটি অন্য পদার্থ অপেক্ষা কঠিন দ্রব্যে গঠিত এরূপ বোধ হইল না। সে যাহা হউক উক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিলাম, তথাকার দৃশ্য বর্ণনা করা আমার দ্বারা সম্ভবে না, যেন দেব স্থানে কত শত মহাপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তির জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। গুরুদেবের সহিত তাহাদের বিশেষ পরিচয় বলিয়া বোধ হইল, গুরুদেব এই সময় আমাকে বলিলেন যে, এই পর্ব্বতটি এই গ্রহের মধ্য স্থলে অবস্থিত, পূর্ব্বে দেখিয়াছ যে এই গ্রহটি একটি পদ্ম পুষ্পের ন্যায়। এই পর্ব্বত উহার কর্ণিকা। এই স্থলে যাবতীয় মহাপুরুষেরা অবস্থান করেন। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা মণি, অর্থাৎ রত্ন, তাঁহারা এইখানে বাস করেন। মহামূল্য মণি এইখানে পাওয়া যায় এই কারণে এবং অন্য কারণ ও ইহাকে 'মণিপূর বলে। এই গ্রহের অধীশ্বর রুদ্রকে মণিপুরেশ্বর বলে। এই গ্রহ মঙ্গল নামেও কথিত হইয়া থাকে।

এই তৃতীয় গ্রহের সাধারণ লোকে ক্ষমতার আতিশয্য বশতঃ অত্যন্ত অহংকারী এবং সেই জন্য অনেকেই প্রকৃত পন্থায় অগ্রসর হইতে পারেনা। এই প্রকার ক্ষমতাশীল ও অহঙ্কারী লোক পৃথিবীতে প্রায় ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাস করিতে তাহারা যে সমস্ত পার্থিব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা এই সময়ের লোকদিগের পক্ষে সপ্ন দৃষ্ট অমানুষিক ক্রিয়া বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের অধিকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল কতক কতক আবিষ্কৃত হইতেছে এবং আরও ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা। প্রায় ৯।১০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য কলাপ বিদ্যমান ছিল। তাহাদের অত্যন্ত অহঙ্কার ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ ভুমিকম্পনাদি মহা মহা দুর্ঘটনা হইয়া তাহাদের দেশ মহাসাগরে নিমজ্জিত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের কার্য্য কলাপের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি ও বিদ্যমান আছে; উহা পরে বলিব।

তৃতীয় গ্রহ সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিব না, কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, ইহার অধিবাসীদের পূর্ব্ব ক্ষমতার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই গ্রহের দুইটী উপগ্রহ বা চন্দ্র আছে, যথাক্রমে তাহাদিগের উদয় অস্ত দর্শন করিলাম। এতৎ ব্যতীত প্রথম গ্রহ হইতে এই তৃতীয় গ্রহ পরিভ্রমণকালিন অন্যান্য অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ পরিদর্শন করিলাম, যাহাদের বিষয় লিখিতে হইলে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে যে, তাহার সংলগ্ন রাখা দুরূহ হইবে। উক্ত বিষয় সময়ান্তরে কিছু কিছু লিখিব। যেমন গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে উপস্থিত হইবার সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে ও যে সমস্ত অদ্ভূত দৃশ্য দর্শন হয় এই গ্রহ হইতে চতুর্থ গ্রহে যাইবার কালিন তাদৃশ ঘটনাও দৃশ্য দর্শনাদি করিয়া যথাক্রমে চতুর্থগ্রহে উপস্থিত হইলাম। যতদুর আমার দ্বারা লেখা সম্ভব তাহা লিখিলাম; জানিনা এই স্বপ্নের দ্বারা কি অর্থ বুঝাইতেছে ও কি ফল হইবে। সপ্নাবস্থায় যাহা দেখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ নাই, তবে যতদূর স্মরণ হইতেছে তাহা এই জাগ্রত অবস্থায় কত দূর পরিস্ফুটিত করিয়া লিখিতে সক্ষম হইলাম ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছিনা। তবে আমার দ্বারা যতদুর সম্ভব সে বিষয় ত্রুটি করি নাই।

(ক্রমশঃ।)

গান।

—*:():*—

[illegible]ন্দি, কেমনে ভুলি তাঁরে
কে ভুলে পরম জনে।

অন্তর হয়েছে শ্মশান
জ্বলে চিতা হুহু করে।

হৃদয়ের জ্যোতি সম
জীবনের শক্তি মম,
সতী আমার কোথা আছে
বল যাবো সেই খানে।

শব সম দেহ মোর
বহিতে পারিনে আর,
ভুগিতে পারিনে ভোগ
যায় প্রাণ সতী বিনে।

ছেড়েছিরে সুখ আসা
চাহিনারে ভাল বাসা,
সে শ্যামা রূপ শুধু, নন্দি,
ভাবি সদা মনে মনে।

সতীর প্রতিমা খানি
হৃদি পদ্মে দেরে আনি,
ভক্তি প্রেম অর্ঘ্য দিয়ে
পুজি তাঁরে সযতনে।

শ্রীবন্ধুবিহারী ঘোষ।

টেনিসন দৃষ্ট সমাধি অবস্থা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় টেনিসনের জীবন বৃত্তান্ত হইতে নিম্নলিখিত অংশ টুকু উদ্ধৃত করিয়া আমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে,

"তুমি সে দিন বলিয়াছিলে যে কবি সেলি তাঁহার সূক্ষ্মশরীর দেখিতে পাইয়াছিলেন; কাহার কাহার মতে টেনিসন শেলি অপেক্ষা উচ্চভাবাপন্ন কবি; টেনিসনের চিত্ত কিরূপ উন্নত ছিল তাহা এই উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায়; এই উদ্ধৃত অংশ টুকু তোমার কাজে আসিতে পারে, তাই উহা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইলাম।" প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ চিত্তের যে অবস্থাকে সমাধি অবস্থা বলিয়া গিয়াছেন এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়, সেই জন্য উহা ইংরাজী লেখা হইলেও আমাদের এই বাঙ্গালা পত্রিকাতে প্রকাশ করিলাম।

TENNYSON.

A Memoir by Hallam Lord Tennyson—Voli p. 320.

In some phases of thought and feeling his (Tennyson's) idealism tended more decidedly to mysticism. He wrote "A kind of waking trance I have frequently had, quite up from boyhood when I have been all alone. This has generally come upon me through repeating my own name two or three times to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, the individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state but the clearest of the clearest, the surest of the surest, the weirdest of the weirdest, utterly beyond words, where death was an almost laughable impossibility, the loss of personality (if so it were) seeming no extinction but the only true life." "This might" he said "be the state which, St Paul describes whether in the body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell." He continued 'I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words? but in a moment when I come back to my normal state of 'sanity'

I am ready to fight for *mein liebes* Ich and hold that it will last for *aeons* of *aeons*".

"In the same way" he said "that there might be a more intimate communion than we could dream of between the living and the dead at all events for a time—"

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

উত্তরা খণ্ডে।

সম। "হাঁ,জড় বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই সকল দ্রব্যেই জাড্যগুণ মাত্র বিদ্যমান জানিয়া বুদ্ধিকেও জাড্য দোষে দূষিত করেন। তাঁহারা যাহা বুঝিতে অক্ষম তাহা অঙ্গীকার করিতেও অসম্মত। যাহা হউক, তাঁহারা গুপ্ত বিদ্যার ন্যায় বিবিধ বিষয় সহজে বুঝিতে না পারিয়া অঙ্গীকার না করায়, তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে। তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, এ সমস্তই অজ্ঞের নিকট গূঢ় বিদ্যা—জ্ঞানী ইহা ভিন্ন চক্ষে দেখেন। একজন অশিক্ষিত হিন্দুর চক্ষে ছায়ারোধ যন্ত্র (Photographice camera) একটা উচ্চ অঙ্গের ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। সেইরূপ আপনার সম্মুখে রাসায়নিক শক্তিতে যে যন্ত্র প্রস্তত হইতেছে, উহা জাগতিক ঘটনার প্রতিবিম্ব রোধক যন্ত্র। ছায়ারোধ যন্ত্রের যাবক্ষাররজত (Nitrate of silver) আলোক সংস্পৃষ্ট না হইলে, যেমন প্রতিবিম্বাবরোধক্ষম থাকে; তেমনি দুইটি অপরিচালক বস্তু অর্থাৎ এক পৃষ্ঠে কাচ ও অপর পৃষ্ঠে একপ্রকার বৃক্ষ নির্য্যাসদ্বারা অবরুদ্ধ হইলে ঐ তৈল সর্ব্ব প্রকার ওজঃপুঞ্জ কর্ত্তৃক অব্যাহত থাকিয়া চিন্তিত পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রদর্শন ক্ষম থাকে। কেমন এখন এসকল সম্ভব বোধ হইতেছে কি ?'

চিন্তামণি বিস্মিত মুখে বলিলেন—"ছায়ারোধ যন্ত্রের কথাটি বেশ লাগিল, কিন্তু উপমাটি মিলিল কৈ ? যাহার প্রতিবিম্ব রক্ষা প্রয়োজন তাহা ছায়ারোধ

যন্ত্রের ঠিক সম্মুখে থাকে। কিন্তু যত অন্তরায় থাকুক না কেন, বহুদূরের বস্তু কিপ্রকারে উহাতে প্রতিবিম্বিত হয় ?'

সম। "আপনি চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছা শক্তির কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, সুতরাং মিমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না। ছায়ারোধ যন্ত্র ও ঐন্দ্রজালিক দর্পনের শক্তির প্রভেদ বিস্তর। যখন কেহ দর্শনীয় পদার্থ দর্শনার্থ আদর্শ সন্দর্শন করেন, তখন তাঁহার মন দর্শনীয় পদার্থের উপর একাগ্র হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে উহাতে এক প্রকার ভুবর্জ্জোতিঃ (ray of astral light) পতিত হয়, ঐ জ্যোতিঃ দর্পন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দর্শনীয় বস্তুর সাদৃশ্য এবং ক্রমে তাহার তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু স্থায়ী হয়না। এই গেল দর্পনে স্থায়ী চৈতন্য সঞ্চারের কথা ; নখদর্পনে অস্থায়ী চেতনা সঞ্চার দ্বারা সেই সময়ে মাত্র দ্রষ্টব্য বিষয় দেখা যায়॥"

তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে পুরোহিত মহাশয় অগ্রসর হইয়া চিন্তামণির হস্তে একখানি কুব্জ পৃষ্ঠ বাদামী গঠনের কাচ দিয়া—"আমার সহিত আসুন" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অগ্নির নিকট লইয়া গেলেন। তখনও অগ্নিতে তৈল পাক হইতেছিল। তিনি তাহাকে একখানি হাতা দ্বারা সেই কৃষ্ণবর্ণ উত্তপ্ত তৈল ঐ কাচের কুব্জপৃষ্ঠে মাখাইয়া, অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া পুরোবর্ত্তী নিভৃত নিকুঞ্জে গমন পূর্ব্বক কাচখানির মুব্জপৃষ্ঠ সম্মুখে ধরিয়া একমনে কোন দূরবর্ত্তী বন্ধুকে ভাবিতে বলিলেন।

চিন্তামণি তাঁহার আদেশানুযায়ী তাহাই করিলেন। খৃষ্টান মত বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যুক্ত বলিয়া প্রথমে তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু সহজেই প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে করিলেন—"কাহাকে চিন্তা করিব ? মা, না আর মনে করা উচিত নহে, তাহাতে ক্ষতিইবা কি ? মনোরমে, তুমি বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী কিনা জানিতে মন অতিশয় ব্যগ্র—আমাকে মার্জ্জনা করিবে॥"

ব্রাহ্মণদ্বয় দূরে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ লক্ষ করিতে লাগিলেন। চিন্তামণির হস্ত সত্বরই দর্পন গ্রহণ করিল, তিনি দেখিলেন দর্পন মধ্যে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহার প্রকোষ্ঠ দ্বারা সুচারু কারুকার্য্য শোভিত যবনিকা, ক্রমে যবনিকা অপসৃত হইল, গৃহাভ্যন্তরে তিনটি পুরুষ ও তিনটি সুন্দরী রমণী, তিনটিকে দেখিলেই গণিকা বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা কয়েকখানি চেয়ারের উপর নানা ভঙ্গী করিয়া উপবিষ্ট, সম্মুখে মক্‌মল মণ্ডিত টেবিলের উপর মদ্য ভাণ্ড ও অন্যান্য আহারীয় কতক রজত পাত্রে কতক ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন। "বাঙ্গালা দেশে এমন সৌখিন রাজা আর কে?" এই বলিয়া একজন গণিকা অর্দ্ধোন্মত্তাবস্থায় মদ্য ভাণ্ড হইতে পান পাত্রে যেমন মদ্য ঢালিল অমনি হস্ত হইতে পাত্র চ্যুত হইয়া পাত্রস্থ মদ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, এই বিভৎস ব্যাপার দর্শনে চিন্তামণি মুখ ফিরাইলেন। পুনর্ব্বার দেখেন সে দৃশ্য অন্তর্হৃত ও আর একটি গৃহের দৃশ্য মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী রমনী সাশ্রুনয়নে করজোরে কাতর স্বরে কহিল "মা জগদম্বে! মা রক্ষা কর। মা আদ্যাশক্তি তোমার দাসীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর মা—এই মনোবেদনা সহ্য করিবার ক্ষমতা দেও মা।"

চিন্তামণির হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি কহিলেন—"মনোরমে—তোমার এ অবস্থা!"

তন্মূহুর্ত্তে আর একটি নারী মূর্ত্তি শনৈঃ শনৈঃ শূন্যপথে আবির্ভূত হইল। সে মূর্ত্তি অতি সুন্দর, সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও দৃঢ়কায়, কেবল নাসিকাদেশ ঈষৎ চাপা। সে ঘৃণা উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে কহিল—"রাণি! তুমি আমার প্রিয় বস্তু হরণ করিয়াছ—আমার পুত্রের জনককে বিবাহ করিয়াছ, তোমাকে মরিতে হইবে।" "এই কথা বলিয়া সে যেমন চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিতে গেল, অমনি তিনি এক হস্ত বক্ষে স্থাপন ও অপর হস্তে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্পর্শ করিলেন—টুন্‌টুন করিয়া ঘণ্টা ধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ আর একটি মহিলা সহসা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ক্রোড়ে করিলেন—দ্বিতীয়া মূর্ত্তি অন্তর্হৃত হইল এবং পরক্ষণেই দর্পনস্থ সমুদয় দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। চিন্তামণি দর্পনের কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

আদর্শ সন্দর্শনকালে সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ আবিষ্ট মনে তাঁহার ভাব ভঙ্গী লক্ষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দর্শনীয় বিষয় প্রশ্ন করিয়া জানিবার উপযুক্ত নহে। তিনি মৃদুস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া, চিন্তামণির নিকট গিয়া দেখিলেন—তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে একটি কাঠের বাক্স দিয়া বলিলেন—দর্পনখানি ইহাতে রাখুন; উহা কাহাকেও

স্পর্শ করিতে দিবেন না, তাহা হইলে উহাতে আপনার ওজঃ শক্তিই রক্ষিত হইবে—বাক্‌স অন্যে স্পর্শ করিলে অধিক ক্ষতি নাই—তবে না করিলেই ভাল হয়। আত্মান্নোতিলাভেচ্ছা বা কাহাকেও বিপন্নাবস্থা ব্যতীত উহা সচরাচর ব্যবহার করিবেননা। উহা আপনার পথদর্শক স্বরূপ হউক—ভগবান্ বুদ্ধদেব আপনার উদ্বেগ দূর করুণ।"

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে চিন্তামনি পুনর্ব্বার গমনার্থ প্রস্তুত হইলে, সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ সস্নেহে অভিবাদন পূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই পথে পর্ব্বতারোহন করুণ—ভগবান আপনার উপর প্রসন্ন হউন।"

"মনোরমার শেষে এই অবস্থা হইল" এই কথা ভাবিয়া চিন্তামণি অশ্বের রশ্মি শিথিল করিলেন, সঙ্কেত মাত্র অশ্ব বেগে ধাবিত হইল। ক্রমে সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে, প্রকৃতি দেবী তিমির বসন পরিধান করিতে লাগিলেন। চিন্তামণি একটি প্রস্তরস্তূপ সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন পথ শেষ হইয়াছে বামে দুরারোহ পর্ব্বত মালা প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান দক্ষিণে দুর্গ পরিখাকার ন্যায় গভীর খড়, পুরোভাগে পূর্ব্বোক্ত স্তূপে পন্থাবরুদ্ধ। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "এক্ষণে কি করা যায় ক্রমেইতো অন্ধকার বৃদ্ধি হইতেছে। "সহসা পুরোবর্ত্তী প্রস্তরস্তূপ হইতে একখানি বৃহৎ প্রস্তর, কব্জাস্থিত গুরুভায় কপাটের ন্যায় ঘর ঘর শব্দে ঘুরিয়া গেল একটি গহ্বর বাহির হইলে—দূরে অলোক রশ্মি দৃষ্ট হইল। তিনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আলোকভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাঁহার প্রবেশমাত্র পাষাণ কপাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

একজন ব্রাহ্মণ সম্মুখীন হইয়া অভিবাদনান্তর গৃহ প্রবেশ করিতে বলিলেন। চিন্তামণি একটি বিশাল কৃষ্ণ প্রস্তর গৃহে উপনীত হইলেন। তথা হইতে পার্ব্বতী ধারার * কলনাদ শ্রুত হইতে ছিল। ক্ষণেক বিশ্রামান্তে ব্রাহ্মণ দুইখানি দেবদারু কাষ্ঠ মশালের ন্যায় প্রজ্জলিত করিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অনুগমন করিতে সঙ্কেত করিলাম। গমণ করিতে করিতে জল কল্লোল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে লাগিল, অনুমান শতহস্ত পরিমিত অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ বামদিকে ফিরিলেন, চিন্তামণি সহসা একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। দশহস্ত পরিমিত স্ফটিক

বিনিন্দিত একটি নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে কতগুলি শ্বেত প্রস্তরের উপর পড়িতেছে, উপরিভাগে বিবিধ গঠন ও বিবিধ বর্ণের মন্দিরাকৃতি প্রস্তর মালা লম্বিত, তাহার কোন কোনটি নিম্নস্থ বারি বেগ সংগৃহীত মৃত্তিকা স্তূপে সংলগ্ন, সেই সকল প্রকৃতির তুষার ধবল স্থপতি কার্য্যের উপর মশান-প্রেরিত জ্যোতিঃ পতিত হওয়ায় তাহার পশ্চাৎ ভাগ তিমিরাবৃত, সেই সমগ্র দৃশ্য অস্থির স্বচ্ছ জল ধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া কুহক সংগঠিতবৎ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ একটী প্রস্তর গর্ত্তে মশাল প্রোথিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাঁহাকে নির্ঝরিণী প্রদর্শন করিয়া গৃহাভ্যান্তরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

চিন্তামণি নয়নযুগল চরিতার্থ করণার্থ একখানি প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট হইয়া বিস্মিত নেত্রে অবলোকন করিতে করিতে ভাবিলেন "এটা বাস্তবিকই মন্ত্র মায়া মোহিত প্রদেশ। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড অদৃশ্য কব্জায় অদৃশ্য হস্তদ্বারা চালিত হইয়া দ্বারের কার্য্য সাধন করে। গহ্বর সকল অদৃষ্ট পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিদান! আহা! আমার যাত্রার প্রতি পদে পদে জগতের নূতন নূতন বিস্ময়কর পদার্থ দৃষ্টি পথারূঢ় হইতেছে।"

তিনি সেই পার্ব্বতীয় ধারায় তুষার শীতল জলে অবগাহন পূর্ব্বক গৃহাভ্যান্তরে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় সেই দর্পনদৃষ্ট বিষয়ক চিন্তায় অবগাহন করিলেন। ভাবিলেন—সত্যই কি মনোরমা এত দীনভাবাপন্ন? বিবাহের পূর্ব্বে রাজা যেমন দোষান্বিত ছিলেন এখনও সেইরূপ! সেই রাজোদ্যান সেই রাজ প্রাসাদ, সেই সমস্তই পূর্ব্ব দৃষ্ট সমস্তই সত্য—অবশিষ্টাংশ কিরূপে মিথ্যা বলিব?"

মনোরমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি চিন্তামণি সৎ সাহসে, দৃঢ়তা সহকারে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপ জায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভি জায়তে॥
ক্রোধাৎভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

---

* পার্ব্বতীয় প্রদেশে নির্ঝর সমূহ সম্মিলনে ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হয়। পার্ব্বতীয়গণ তাহাকে "ধার" বা "ধারা" কহে।

তিনি কোন সময়ে কোন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার এই অমূল্য উপদেশ বাক্য শ্রবণাবধি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মনোরমার কথা মনে হইলেই সযত্নে তাহা পরিহার করিতেন। এক্ষণে কি কারণে তাঁহার মন তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল তাহা তিনি নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। যদি মুকুরে তাঁহাকে সুখী দেখিতেন তাহা হইলে হয়তো তদ্বিষয়ক চিন্তা তাঁহার মনে পুনরাবর্ত্তিত হইত না। কিন্তু যে মুর্ত্তি তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতেছিল সে কে?

এই ভাবনার মধ্যে একটি জ্যোতি তাঁহার সম্মুখে পড়িল—তিনি ভিত্তি গাত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে দেখিয়া পাঠ করিলেন—"সকল অবস্থাতেই মনকে সুস্থির রাখিবে, সকলই দেখিতে পার—কিছুতেই লিপ্ত হইও না। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। দুঃখ ভোগরূপ আত্মিশুদ্ধি দ্বারা অনন্ত দেবের সমীপস্থ হওয়া যায়। দুঃখে উদ্বিগ্নমনা বা সুখে স্পৃহান্বিত হইও না। অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলে, অগ্রে আপনার প্রভু হওয়া আবশ্যক।" পাঠ সমাপ্ত হইলে জ্বলন্ত অক্ষর পংক্তি অদৃশ্য হইল। চিন্তামণি ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তিনি স্থিরভাবে চিন্তামগ্ন। কিয়ৎ পরে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে তাঁহাকে চিন্তাপনীত দেখিয়া, তিনি মনস্তাপ প্রকাশক স্বরে জিজ্ঞাশিলেন—"আপনি কি ভিত্তিস্থ লেখা দেখিয়াছেন?"

"হাঁ! আমাদিগের মঠাধিকারী মহাত্মাগণ ঐরূপে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। কোনরূপ মনোবিকার হইতে আমাদিগকে নিরস্ত রাখাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়। কারণ উহাতে আমাদিগের ওজঃপুঞ্জ অস্থির হইয়া আমাদিগের কারণ শরীরকেও বিচলিত করে। এই কারণ শরীর দ্বারাই আমরা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে আধ্যাত্মিক জগতে সম্বদ্ধ হইতে পারি—ইহা দ্বারাই আমরা পরিণামে সকল আদিকারণের সংসর্গ লাভে সমর্থ হই। ধৈর্য্য, কারণ শরীর পরিপোষণের প্রধান কারণ। মহাত্মাগণ সেই কথাই দেওয়ালে জ্বলন্তাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন।'

এক্ষণে আপনি দূর ভ্রমণ ও অবস্থা বৈচিত্রে পরিশ্রান্ত—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে আপনার জন্য এক খানি খাট আছে—সুখে নিদ্রা যাউন। এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলেন।

চিন্তামণি শ্রান্তি প্রযুক্ত বিশ্রমাভিলাষী হইলেও নিদ্রা আসিল না। দিবা-ভাগের যাবতীয় ঘটনা কথঞ্চিত অজ্ঞাতসারে তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের নূতন নূতন প্রমাণ তাঁহার মন অধিকার করিল। সম্ভবতঃ এই সকল গূঢ় নিয়মের জ্ঞান লাভের শক্তি, মানবাত্মার গভীরতম প্রদেশে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছে। মনোরমার দুঃখ শান্তি একমাত্র সেই শক্তি বিকাশ দ্বারাই সম্ভব। তাঁহার চিন্তা ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে লাগিল। উচ্চ হইতে উচ্চতর বিষয় তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। তিনি যতই হিমাদ্রিশিখর সন্নিহিত হইতে লাগিলেন ততই মন অবস্থান্তরিত হইতে চলিল। এ সমস্ত তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন বায়ুর লঘুত্বের সহিত তাঁহার মানস ক্ষেত্র ও নির্ম্মল হইতেছে। কেবল মানবের পরিণাম বলিয়া নহে তাঁহার সমগ্র জাগতিক সত্য সম্বন্ধীয় স্থির জ্ঞান লাভেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুখানুভব ও আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরে সম্যক আস্থাবান হইলেন।

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার আপনাকে নববলে বলীয়ান বলিয়া অনুভব হইল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি অশ্বারোহণে পুনর্যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ গুহার বাহিরে আসিয়া সেই পার্ব্বতীয় ধারার পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পন্থাবলম্বনে গমনের উপদেশ দিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

—*:():*—

চতুর্থ অধ্যায়।

গমন করিতে করিতে চিন্তামণির মনে হইল, যেন তাহার ভ্রমণ শেষপ্রায়, কোন কোন লোক যেন তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় থাকিয়া তাহার বিষয় কথোপকথন করিতেছেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত আছেন। এই সকল শুভলক্ষণ সত্ত্বেও তাঁহার ন্যায় সুস্থির অন্তঃকরণে ও কি এক প্রকার ভাব উদয় হইল—যেন এক প্রকার ভীতি সঞ্চার হইল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর সেই উচ্চ ভূভাগেও সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণে, অশ্ব সমেত আরোহীকে অবসন্ন প্রায় করিয়া তুলিলেন। একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিবার জন্য, চিন্তামনি অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন, দেখিলেন অদূর সম্মুখে দুরারোহ পর্ব্বতমালা তাঁহার গতি রোধ করিতেছে। তদ্দর্শনে ভাবিলেন—আমার দেহাবসাদক আপদ সঙ্কুলে ভ্রমনের কি এই পরিণাম ?"

সহসা লতা গুল্মাচ্ছাদিত জল প্রবাহের মৃদু কল্লোল তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; তিনি ঘোটক পৃষ্ঠ হইতে অবরোহানন্তর, তাহাকে পর্য্যান ও বলগা মুক্ত করিয়া শব্দানুসারে কল্লোলিনী সমীপে গমন পূর্ব্বক, তাহার সুশীতল সলিলে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া বিশ্রাম লাভ ও কর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ তরুশ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন। দণ্ডেক পরে গতক্রম হইয়া যেমন উঠিলেন অমনি দেখিলেন—উজ্জল যজ্ঞ সূত্রধারী দীর্ঘাকার সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার কারুণ্যরসাভিষিক্ত স্নিগ্ধ দেহ ও প্রতিভা ব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় দর্শনে চিন্তামণির মস্তক স্বতঃই অবনত হইল। ব্রাহ্মণ প্রতি নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন "ভ্রাতঃ তুমি কথায় নির্ভর করিয়া এখানে আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, এক্ষণে আমার অনুসরণ কর॥"

তাঁহার আকারোপযোগী বাক্য মাধুর্য্যে আপ্যায়িত হইয়া, চিন্তামণি কোন উন্নত হৃদয় উচ্চ প্রকৃতি মহাত্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করিলেন। যে দুরারোহ পর্ব্বত গতিরোধ করিবে ভাবিয়া, তিনি বিমনা হইয়াছিলেন, তাহারই পাদদেশে প্রকাণ্ড মহীরুহ আচ্ছাদিত একখানি গৃহে তিনি ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহটির চতুর্দ্দিকে ফল পুষ্পান্বিত দ্রাক্ষালতা বেষ্টিত। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে একখানি শ্বেতবস্ত্র মণ্ডিত টেবিলের উপর প্রচুর পরিমাণে আহারীয় স্থাপনপূর্ব্বক একজন গৈরিক বসন পরিহিত যুবা পুরুষ অপেক্ষা করিতেছে। সে, দুই জনকেই অভিবাদন করিল॥

উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া গিরিভিৎ পান আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইনি আমার শিষ্য—নাম হরগোবিন্দ, এক্ষণে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া আমার নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। সমুদয় গৃহ কার্য্য ইঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয়।"

চিন্তা। "আমার কিন্তু মৌনব্রতটা কেমন বিসদৃশ বোধ হইতেছে। আমি মনে করি যে, মৌনাপেক্ষা তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিলে অধিক ফল আছে॥"

ব্রাহ্মণ। "না, চিন্তাদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ হওয়ায় সত্বর সত্য মিমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। বাক্যে ওজঃপুঞ্জ অধিক অপব্যয় হয়। আপনি যদি বিশেষ ক্লান্ত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে ওজঃ সম্বন্ধে কিছু কিছু আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে আপনার আনন্দই হইবে; বিশেষতঃ দীক্ষাভিলাষীগণ দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে ওজঃ সম্বন্ধীয় সুন্দর জ্ঞান লাভ করেন এটি মহাত্মাগণের ইচ্ছা। ইহাতে আধ্যাত্মিকবিদ্যার সোপানোরোহণের নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রয়োজন তৎপক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়॥"

চিন্তা। "আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ গতক্লম হইয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করিলে, বিশেষ আপ্যায়িত হইব॥"

ব্রাহ্মণ। "শুনুন,—এই ওজঃ পদার্থ সূর্য্য রশ্মির ন্যায় এক প্রকার জ্যোতি। চিত্রকরগণ দেব মূর্ত্তির মস্তক যে পীতবর্ণ মণ্ডলে বেষ্টিত করে, প্রতিমার পৃষ্ঠদেশে যে ছটা বাঁধিয়া দেয়,সে সমুদয় এই ওজঃপুঞ্জের অনুকল্প। কেবল মস্তকের চতুর্দ্দিকে নহে, উহা বাস্তবিকই সমুদয় দেহকে বেষ্টন করিয়া ন্যূনাধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই দূরত্বের নাম ওজঃ প্রসার (zone of radiation)। প্রত্যেক গভীর ঈশ্বর চিন্তাদ্বারা, পরব্রহ্ম সমীপস্থ হইবার প্রবল ইচ্ছা দ্বারা, পবিত্র জীবন যাপন দ্বারা এবং দয়াদি সদনুষ্ঠান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির ঔদার্য্যসম্ভূত হয়, এবং তাহা হইতে উহার প্রসার প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন কোন শিষ্যের ওজঃ ত্রিশ চাল্লিশ হস্ত হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত। মহাত্মাগণের ওজঃপুঞ্জ দেশ মহাদেশ, সাগর মহাসাগর পার পর্য্যন্ত অবস্থিত।"

"ইহা প্রকর্ষনী ও বিপ্রকর্ষনী দুই ক্রিয়া শক্তি সম্পন্ন। ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে ইহা পরস্পর আকৃষ্ট ও প্রদত্ত হইয়া থাকে। মানব ইহার প্রসারান্তর্ভূত হইলে, চৈতন্যের ন্যূনাতিরেকানুযায়ী ইহার শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। একজন বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক, অন্য কোন হীনবুদ্ধি ইন্দ্রিয় পরায়ণ জাড্য দোষান্বিতের সমীপস্থ হইলে, যখন দুইজনের ওজঃ পরস্পর সংসৃষ্ট হয়, তখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের নিকটস্থ হইতে কথঞ্চিত সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমের ওজঃ শক্তি হইতে সদিচ্ছা ও প্রফুল্লতা লাভ

করেন। এইরূপে পরস্পরের ওজঃ আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের অন্তরে সৎ বা অসৎ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া চৈতন্যের প্রভাবানুযায়ী স্থায়িত্ব লাভ করে।"

চিন্তা। "এ সকল কি বাস্তবিক কথা?"

ব্রা। "কেন আপনি কি কোন তেজস্বী ধার্ম্মিকের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রভাব, তাঁহার ওজঃ শক্তি অনুভব করেন নাই?"

চিন্তা। "আজ্ঞা হাঁ, আমার এই যাত্রাতেই ঘটিয়াছে।"

ব্রা। "যদি কোন আত্মনির্ভরতা বা ইচ্ছা শক্তি শূন্য ব্যক্তির, স্বার্থপর নীতি ও স্বার্থপর ধর্ম্ম পরিপুষ্ট ওজঃ,কোন ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষীর ওজঃপুঞ্জে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির ওজঃ তাদৃশ পুষ্টিলাভ করিতে পায় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি দুষ্কর্ম্মান্বিত ভ্রষ্টাচারী হয়, তাহার ওজঃ উক্ত স্বার্থপর ব্যক্তির ওজোপরি এমত প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে যে, ভ্রষ্টাচারী দুর্নীতি ও দুরভিসন্ধি, শোষ ক্ষতের ন্যায় তাঁহার মনকে আক্রমণ করে।"

ব্রাহ্মণ সরলভাবে ওজঃ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে শ্রোতা তাহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেন। কিন্তু সকল বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ধর্ম্মের আবার স্বার্থপরতা ও নিঃসার্থপরতা কিরূপ অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিউন।"

ব্রাহ্মণ। "একমাত্র স্বীয় ব্যক্তিগত কল্যান সাধনার্থ যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয় তাহাকে স্বার্থপর ধর্ম্ম কহে। নরকে যাইবার ভয়ে কেবল আপন বিপদ পরিহারের জন্য, উপার্জ্জিত ধর্ম্মই স্বার্থপর ধর্ম্ম। এরূপ ব্যক্তির ওজঃ কোন ভ্রষ্টাচারী হিংস্রকের ওজঃ সংযুক্ত হইলে তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হয়। পক্ষান্তরে আত্মদোষানুসন্ধান, প্রেম, সত্য, পবিত্রতা, দয়া দাক্ষিণ্যাদি উদারতা এক কথায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট সামগ্রীর সমাদর হইতে, পরম ও পুরুষ তাঁহার নৈসর্গিক নিয়মের জ্ঞান লাভেচ্ছা ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ ধর্ম্মনামে অভিহিত। এরূপ নীতি সম্পন্ন ব্যক্তির ওজঃ সংসৃষ্ট হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। প্রথমতঃ তাঁহার ওজঃ পুঞ্জ অভীভূতবৎ প্রতীয়মান হইলেও সে ভাব স্থায়ী হয় না সম্মুখে বিষম শত্রুর আবির্ভাব অনুভব করিয়া তিনি সত্বরই সতর্ক হইয়া যান। কিন্তু নিঃস্বার্থ ব্যক্তির ওজঃ কর্ত্তৃক স্বার্থপর ব্যক্তির ওজোপরি এমত প্রবল সংস্কার উৎপন্ন

হয় যে তাহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল থাকিয়া যায়। সৎকার্য্য সাধনোদ্দেশে সুজনের ওজঃ প্রসার যথাসাধ্য বৃদ্ধিকরা যে কত প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় এক্ষণে আপনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?,,

চিন্তা। "আজ্ঞা হাঁ! যে ওজঃ পুঞ্জের সত্বা জর্ম্মন দেশীয় একজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতিমাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, আপনারা এই হিমাচলের নিভৃত প্রদেশে বাস করিয়া কিরূপে তাহার সত্বা এবং গুণ পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন বুঝিতে পারিতেছিনা। যদি অনুমতি হয়, তবে কিপ্রকারে উহা আবিষ্কৃত হইহাছিল বলিতে পারি।,,

ব্রাহ্মণ। "মহাত্মাগণ স্মরণাতীত কাল হইতে উহা গূঢ় বিদ্যায় প্রয়োগ করিতেছেন। তথাপি নবাবিষ্কারের কথা আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়।,,

চিন্তা। উক্ত বৈজ্ঞানিক একজন সূক্ষ্মদর্শী অনুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন। তিনি এক দিবস একখণ্ড বৃহৎ অয়স্কান্তে একখান গুরুভার লৌহ লম্বিত হইতে দেখিয়া, উহার কোন গূঢ় শক্তি আছে বলিয়া স্থির করিলেন ; এবং মনে করিলেন যে, হয়তো ঐ শক্তিদৃষ্টি বিষয়ন্তি ভূত ও হইতে পারে। এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একটা নিবিড় অন্ধকারময় গৃহে একখণ্ড অয়স্কান্ত-মণি যদৃচ্ছা নিক্ষেপ করিলেন ; এবং কয়েকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রমণীকে তথায় লইয়া গিয়া উহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে কহিলেন। একটি রমণী অন্যূন একদণ্ড কাল স্থির নেত্রে লক্ষ করিয়া উহা দেখিতে পাইলেন এবং উক্ত ব্যক্তির হস্ত ধরিয়া লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিলেন তিনি বলিলেন,—"অশ্বের নালের আকারের একটা পীত ও নীলবর্ণ আলোক দেখিতে পাইয়া উহার অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছিল।,, তিনি ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ষাটজন রমণীদ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্বীয়মত দৃঢ়তর করিলেন। স্ফটিক লবণ প্রভৃতি অনেক বস্তুদ্বারাও এরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিগণ সে সমস্ত বস্তুতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক দেখিতে পান। অধিকন্তু ঐ সকল বস্তুর এক দেশ শীতল ও অপর দেশ উষ্ণ এবং তাহার চতুস্পার্শ্ব একটু জ্যোতিবেষ্টিত। উষ্ণ ও শীতল স্থান দ্বয়কে তিনি উত্তর বা উষ্ণ এবং দক্ষিণ বা শীতকেন্দ্র বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি জীবিত উদ্ভিজ্জেও ঐরূপ কেন্দ্রদ্বয়বিশিষ্ট ও বিবিধ বর্ণের বেষ্টিত মৃদু জ্যোতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অবশেষে মানব দেহ বেষ্টিত কেন্দ্রদ্বয়বিশিষ্ট ঐরূপ উজ্জল পদার্থ নয়নগোচর হইয়াছিল। য়ুরোপীয়গণ তাঁহার মত অঙ্গীকার না করিলেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তার নূতন ক্ষেত্র পাইলেন—গোপনে অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল—ফলও পাওয়া গেল।

ব্রাহ্মণ। "যাহা হউক, অবশেষে জড়বাদীগণের মধ্যে একজনও যে জড়াতীত শক্তির বিশ্বাস করেন ইহাও সুখের বিষয়॥,,

চিন্তা। ফ্রান্সের কোন প্রসিদ্ধ উন্মাদ চিকিৎসালয়ে কতকগুলি ধীশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রাধ্যায়ী যুবা অবসরকালে এই শক্তিরপরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন॥"

ব্রাহ্মণ। "কিরূপে পরীক্ষা হইতেছে ?

চিন্তা। "সাধারণতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (কবিরাজী মতে বায়ু প্রকোপতা, হেতু মূর্চ্ছা রোগের উৎপত্তি। প্রথমতঃ তাঁহারা ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা রোগীকে অভিভূত করেন। এরূপ করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। তখন তাহারা সন্নিহিত বস্তুর ওজঃ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় ; সে বস্তু তাহাদের শরীর সংলগ্ন করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহাদের উপাধানের নিচে একটু অহিফেন স্থাপন করিলেই তাহারা গভীর নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এইরূপ ঔষধ যত নিকটে থাকে ততই অধিক কার্য্য করিয়া থাকে ; এবং যতদূরে স্থাপন করা যায় ততই তাহার ক্রিয়ার ন্যূনতা লক্ষিত হয়, অবশেষে কিছুই থাকে না। এইরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তুই বহির্ভাগে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এক প্রকার শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে। এখন বুঝা যাইতেছে যে ঐ সকল বস্তুর ওজঃপুঞ্জ তাহাদিগের ওজঃপুঞ্জে সংলগ্ন হইয়া ঐ শক্তি উৎপন্ন করে। এখন দেখুন, আপনার ওজঃ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য আমি পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ প্রস্তুত হইয়াছি॥"

ব্রাহ্মণ। "পুর্ব্ব হইতে প্রস্তুত জানিয়াই মহাত্মাগণ আপনাকে এখানে আনাইয়াছেন।"

সেই কথোপকথনকালে ভূবলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি হইল, ব্রাহ্মণ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মহাত্মাগণ আপনার অপেক্ষা করিতেছেন—চলুন।"

এতচ্ছ বনে প্রথমে চিন্তামণির হৃদয় স্পন্দিত হইল, মন একবার ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইল। ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অনুগমন করিতে কহিলেন। তাঁহারা সেই পর্ব্বত পার্শ্ব দিয়া একটি গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ একটা স্থান স্পর্শ করিলে একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া একটী সুড়ঙ্গ বাহির হইল। হরগোবিন্দ এক খণ্ড দেবদারু কাষ্ঠ জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমাদের এইরূপ নিভৃত স্থানের বড় আবশ্যক। দেশ আবিষ্কারক গণ সময়ে সময়ে এই সকল স্থানে প্রবেশের চেষ্টা করে, আমাদের তাহা ইচ্ছা নহে; সুতরাং তাহাদিগকে নিবারণ জন্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন হয়॥"

একটি বক্র গামিণী নির্ঝরিণীর পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিয়া সুড়ঙ্গটি অপর এক বৃহৎ গুহা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। প্রায় দণ্ডেক কাল গমনান্তর তাঁহারা আলোক দেখিতে পাইলেন। অনতি বিলম্বে একটি নয়ন তৃপ্তিকর,মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। কোথাও প্রকাণ্ড মহিরুহ শ্রেণী, সুললিত দ্রাক্ষালতা ও বিবিধ গুল্ম বল্লরী, বিবিধ বর্ণের কুসুমোপহারে রজত মুকুট পরিশোভিত, নগাধিরাজের পাদদেশ বন্দনা করিতেছে, কোথাও বা স্ফটিক সজ্জিত ক্ষুদ্রায়তন শৈল তরঙ্গিনী নিচয় শৈলেশ্বরের পদ বিধৌত করিয়াই যেন, তাঁহার প্রসাদে ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। উপত্যকার মধ্যস্থলে একটি প্রসস্ত প্রস্তর প্রাসাদ। প্রধান দ্বারের উপরিভাগে লেখা রহিয়াছে—"জ্ঞান ভাণ্ডার।" হরগোবিন্দ তাঁহাদিগকে সেই বিচিত্র দ্বারদেশে লইয়া গেলে উহা স্বতঃ উন্মুক্ত হইল। হরগোবিন্দ বাহিরে রহিলেন চিন্তামণি ব্রাহ্মণের সহিত প্রবেশ পূর্ব্বক চত্বারিংশ হস্ত পরিমিত একটি চতুরস্র অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। প্রাঙ্গন মধ্যে পক্ষবিশিষ্ট একটা ধবলবর্ণ নরকঙ্কাল দণ্ডায়মান অবস্থায় দক্ষিণ হস্তস্থ কর্ত্তরিকার অগ্রভাগ দ্বারা একটা ঘটিকা যন্ত্রের সময় প্রদর্শন করিতেছে; বাম হস্তে একখানি পিত্তলফলকে লেখা—"বুঝিয়া দেখ"। চত্তর পার হইয়া তাঁহারা একটা প্রকোষ্ঠদ্বারে উপস্থিত হইলেন তাহাতে, "সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর" লেখা আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া উভয়ে শয্যাদি শোভিত একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্টে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন "এখানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন, যথাকালে আহার্য্য উপস্থিত হইবে। অদ্য রাত্রেই আপনি প্রথম পর্য্যায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন; চিন্তামণি দিবাভাগের পরিশ্রমে অবসন্ন প্রায় হইয়াছিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

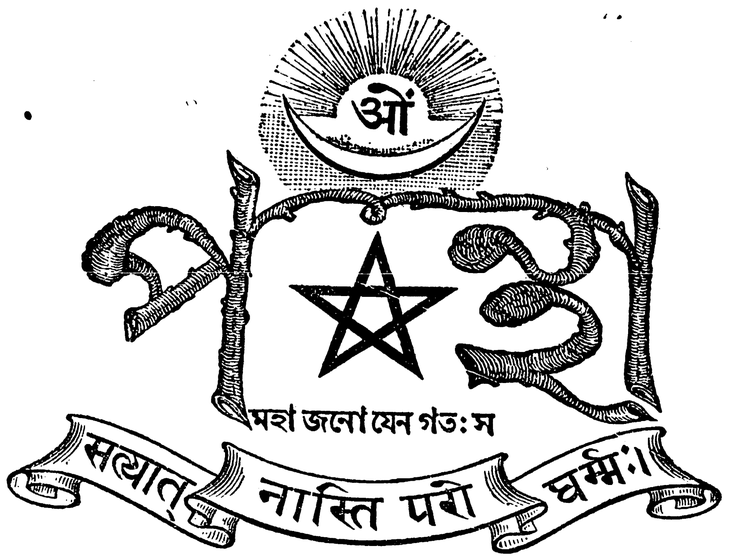

২য় ভাগ। | অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

মৃত্যু।

নহে মৃত্যু দুদণ্ডের অতিথি কেবল,
আমাদের দ্বারে।
নিত্য সঙ্গী। অতুলন প্রভাব তাহার
জগত সংসারে।
এ দেহ বিক্রীত শুধু নয় তার পদে,
যত কিছু সবি।
সহস্তের চিহ্নাঙ্কিত, সবেতে মুদ্রিত
তারি ছায়া ছবি।
ঋণী মোরা কত জন্ম কত কাল যেন
আছি কাছে তার;

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত চলি' যায় জীবনের
শোধিতে সে ধার।
আনন্দ, বিশ্বাস, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, আশা,
উচ্চ বৃত্তি গুলি,
ফুটে' ওঠে পুষ্পসম হৃদয় কাননে,
সৌরভে আকুলি' :—
একে একে ঝরে' পড়ে বৃন্ত হ'তে টুটি',
মরে যায় তারা,
কঠোর পরশে তার ; শুখাইয়া আসে
নির্ঝরের ধারা।
তারপর অবশিষ্ট পড়ে' থাকে যাহা,
তুচ্ছ দেহখান,
তাহার চরণো প্রান্তে সে জন্মের মত
সর্ব্ব শেষ দান।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

—*:():*—

আত্মপ্রতি।

অসার বিষয় জ্বালে রে অবোধ মন,
মগন হইয়া কেন রয়েছ এমন?
অমিয়া বলিয়া যারে পিয়িতেছ বারে বারে,—
সে নহে অমৃত শুধু গরল ভীষণ—
প্রতি চুমুকেতে তার বাড়িছে যাতনা ভার,—
তবুও তবুও কেন মুদিত নয়ন?

রে অবোধ এখনও হও সাবধান।
এখনো ও স্রোত হতে ফিরাও পরাণ।
দলিয়া প্রাণের আশ, ছিঁড়ে ফেলে মায়াপাশ,
প্রেমের গৌরাঙ্গ পদে কর আত্মদান।
দূরে যাবে শোক দুখ, শান্তিতে ডুবিবে বুক
দয়ার দেবতা সেযে করুণা নিধান।

অনিত্য শরীর শুধু মাংস ক্লেদ ভার।
নয়ন মুদিলে সব হবে অন্ধকার।
আত্মীয় বান্ধব যারা এ দেহ লইয়া তারা,
"মড়া" ব'লে ক'রে দিবে গৃহ হতে বার।
তাই বলি এই বেলা, না ফুরাতে ভব খেলা,
প্রাণ ভরে গোরানাম স্মর বারবার।
সে বিনা জীবের কেহ নহে আপনার।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যার, ২১৩ পৃষ্ঠার পর।)

চতুর্থ গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীতে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। অন্যান্য গ্রহে গমনকালীন গ্রহের জ্যোতি ও মধুর হুঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি এখানে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম। অন্য গ্রহগণ যেমন এক এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দ্বারা বেষ্টিত এই গ্রহ সেরূপ নহে। এক স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেরূপ

আলোক বিকীর্ণ হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ এক উজ্জ্বল তাড়িতালোক একস্থান হইতে উত্থিত হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিকীর্ণ করিয়া এই পৃথিবীর অনেক স্থান ব্যাপিয়া আলোকদান করিতেছে। অন্যান্য গ্রহের হুঙ্কার ধ্বনি আকাশে ঘাত প্রতিঘাতে আহত হইয়া শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই সঙ্গে নানা বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এখানে হুঙ্কার ধ্বনি ঘাত প্রতিঘাতে আহত না হইয়া উত্থিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে বর্ণের সূক্ষ্ম বিকাশ মাত্র দেখা যাইতেছে। অন্যান্য গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহ অতীব রহস্যজনক ও এই গ্রহ সম্বন্ধে অনেক অনেক প্রচ্ছন্ন সত্য আছে যাহা প্রকাশ যোগ্য নহে। পৃথিবীর যে স্থান হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হইতেছে সেই জ্যোতির মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলাম যে ঐ স্থানটিতে একটি বৃহৎ গহ্বর রহিয়াছে দেখিতে দেখিতে আমরা ঐ জ্যোতির মধ্যদিয়া গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম—যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকল দর্শন করিতে লাগিলাম, ঐ জ্যোতি দ্বারা গহ্বর দেদীপ্যমান; সমস্তই স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে, গহ্বরটি একটি বিস্তৃত মহাদেশ বিশেষ, স্থানে স্থানে নানা শোভায় সুশোভিত ও সুরম্য হর্ম্ম্য সকল দিব্য নরগণ দ্বারা অধিকৃত—দ্বেষ হিংসাদি বর্জ্জিত। এই মনুষ্যদিগকে দেখিয়া মন মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল—যেদিকে তাকাই সেইদিকে নানা কারু কার্য্য; সে সকল কারুকার্য্য পৃথিবীর বহির্দ্দেশে কখনও দেখি নাই। এখানে বিশেষ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম যে, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা সকলেই পুরুষ, স্ত্রীলোক একটি মাত্র নাই। সকলেই এক এক জন সাধু পুরুষ। পৃথিবীতে যাঁহারা এই স্থান লাভের উপযুক্ত সাধু হন তাঁহারা কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ প্রত্যেকেই একটি একটি মহা কার্য্যের ভার লইয়া এখানে অবস্থান করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য সাধু পুরুষেরা প্রকৃত বিজ্ঞান সকল ও যাবতীয় বিদ্যা, পৃথিবীর আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তা শক্তি প্রভাবে মনুষ্যগণের হৃদয়ে সময়োপযোগী ধর্ম্ম, সৎ কর্ম্ম, বিজ্ঞান শাস্ত্র জ্ঞান, শিল্প বিদ্যা, রাজবিদ্যাদি মহৎ মহৎ বিষয় সকল প্রতিফলিত করিয়া দিয়া মনুষ্য রাজ্যের ও জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। যখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে তখন তাঁহারা স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া বা কখনও কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান হন।

ইঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা, রাজবিদ্যা, কারু বিদ্যা, ও যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রলয়ের অগ্নি বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়া জীবের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।

গুরুদেবের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; সম্মুখে একটি উজ্জ্বল মণিমানিক্য খচিত সুশোভিত হর্ম্ম্য দৃষ্টি গোচর হইল। এরূপ বিচিত্র সুন্দর অট্টালিকা আমি জীবনে দেখি নাই, এমন কি ইহার দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। আমরা উভয়ে ঐ অট্টালিকার তোরণ অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম—প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে এক একজন দিব্য প্রহরী সর্ব্বক্ষণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন—প্রত্যেক গৃহে একজন করিয়া দিব্য মূর্ত্তী বিরাজ করিতেছেন। গৃহমধ্যে স্তূপাকার পুঁথী ও পুস্তক রহিয়াছে, কোন গৃহে নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য সকল সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে। জগতের এতাবৎ কাল যে সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও পরে যে সমস্ত হইবে তদ্‌সমুদায়ের আদর্শ ঐ স্থানে বিদ্যমান রাহয়াছে। গৃহ হইতে গৃহান্তরের সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সংগ্রহ দর্শন করিতে করিতে, ঘনাবরণে আবৃত ও দিব্য সৌম্যমূর্ত্তী মহাপুরুষগণ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্ময়জনক প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। এইখানে আমার প্রকৃত গুরুদেবকে দেখিতে পাইলাম, আমি স্বষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন ও আমাকে যাহা বলিলেন তাহার কতক কতক নিম্নে লিখিত হইতেছে। এই প্রকোষ্ঠের নাম "রাজবিদ্যা" "ব্রহ্মবিদ্যা" "গুপ্তবিদ্যা।" লোক যখন অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতে আরম্ভ হয় প্রকৃত পথভ্রষ্ট হইতে থাকে তখন এই প্রকোষ্ঠ আবরণ পর আবরণদ্বারা আবৃত হইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে জগত সত্বগুণ বর্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ তমগুণে আবৃত হইয়া অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। যে সমস্ত শাস্ত্রে রাজবিদ্যার আভাষ আছে তাহা বুঝিতে সক্ষম না হইয়া বিপরীত অর্থ করিয়া অনর্থ ঘটায়। জগতের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া করুণ হৃদয় দয়ারঅবতার মহাপুরুষগণ কাতরে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে পর সদাশিব জগৎগুরু মহেশ্বর জগতের শিবার্থ ঐ প্রকোষ্ঠের একটী আবরণের একটী কোনমাত্র উত্তোলন করিয়াছেন তাই আজ মহাপুরুষগণ আবরণান্তরালের জ্যোতি বাহিরে পতিত হইয়া জগতের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া নৃত্য

করিতেছেন এবং মহেশ্বরের কার্য্য করিতে পাইবেন বলিয়া স্তব করিতেছেন।

* * * *
* * * *
* * * *

ক্রমশঃ।

বিলাতী সন্ন্যাসী।

কোন একসময়ে আমি বহরমপুরে গিয়া উকিলাবাদের একজন ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। ঐ সময়ে বাসার কতকগুলি সমবয়স্কের সহিত বৈকালে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। একদা দেখি, একজন গৈরিক বসনধারী শ্বেতকায় পুরুষ বাঁধাঘাটে বসিয়া আছেন। আমাদের মধ্যে একজন কহিলেন "দেখিয়াছ সন্ন্যাসী দেখিতে ঠিক ইংরাজের মত।"

আমি উত্তর করিলাম "ইংরাজের মত কেন? ইংরাজই।"

আর একজন কহিলেন। "হাঁ! ইংরাজ আবার সন্ন্যাসী হইতে গিয়াছে।"

---

* এই স্বপ্ন বৃত্তান্তের কিয়দংশ আমরা প্রকাশ করিলাম না। এই জগতে সকলেই আদর চায়; সত্যও প্রকাশ জন্য আদরের অপেক্ষা করে। লেখিকার এই সত্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত সাধারণের কাছে আদৃত হইবে বুঝিয়াই আমরা উহা প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু উহার যদি কোন অংশ অনাদৃত হয় এই আশঙ্কায় এই স্থলের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম না। তবে পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণ জন্য ইহা বলিয়া রাখি যে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি স্থাপিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির স্থাপন মহাদেবের অনুমোদিত ইহাই লেখিকার স্বপ্নলব্ধ গুরুর উপদেশ।

সম্পাদক।

"আচ্ছা, পরিচয় লইলে হানি কি" এই বলিয়া আমি নিকটে আসিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়কে দেখিয়া আমাদের মনে এক ভাবের উদয় হইয়াছে—যদি বলিবার প্রতিবন্ধক না থাকে, জিজ্ঞাসা করি—মহাশয়ের নিবাস ছিল কোথায়?"

সন্ন্যাসী স্মিত মুখে কহিলেন। "আমার সহিত ইংরাজিতে কথা কহিবার অভিপ্রায় কি?"

আমি। "আপনাকে ইংরাজ বলিয়া অনুমান হইতেছে।"

সন্ন্যাসী। "কেন, ভারতবাসীর কি এরূপ গৌরবর্ণ হয় না?"

আমি। "ওরূপ গৌরবর্ণ দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার ন্যায় চক্ষু ভারতবর্ষীয়ের দেখি নাই। তাঁহাদিগের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, তবে কাহারও কাহারও চক্ষুর রং কটা হয় বটে, কিন্তু ওরূপ নীলবর্ণ, ঠিক ঐ ভাবের চক্ষু দেখি নাই।"

সন্ন্যাসী। "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে—আমি স্কটলণ্ডবাসী।"

আমি। "স্কটলণ্ডবাসীগণ খৃষ্টান। আপনিও নিশ্চয় তাহাই ছিলেন। খৃষ্টান যে সন্ন্যাসী হয়, তাহা তো কখন দেখি নাই। যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনি কি নিমিত্ত সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়াছেন, বলিয়া আমাদের কৌতুহল নিবারণ করুণ।"

সন্ন্যাসী। "প্রতিবন্ধক কি, বরং আমার পরিবর্ত্তনের কারণ শুনিয়া যদি এক জনেরও মন পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক মনে করি। আমি বাল্যকালে অবহেলা করিয়া লেখা পড়া শিখি নাই। বৃটনবাসী ভদ্রলোক লেখা পড়া না শিখিলে, এবং বিশিষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকিলে যে গতি হয় আমারও তাহাই হইল। ভারতবর্ষে আসিয়া আমি অনুরোধবলে পশ্চিমের কোন জেলায় পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলাম, একদা তত্রত্য কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুর সহিত মৃগয়ার্থ অশ্বারোহণে বিন্ধ্যাচলে গমন করিলাম। একটা হরিণ দেখিতে পাইয়া,তাহাকে মারিবার জন্য আমরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। আমার ঘোটক অপর গুলাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল,আমি অতি দূর বনে গিয়া পড়িলাম। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পাহাড় উত্তপ্ত হওয়ায় অশ্বটি ও আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি জল না পাইয়া বড়ই

অধীর হইয়া পড়িলাম। এ দিকে শরীর ও অবসন্ন হইতে লাগিল ; সুতরাং এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। কিয়ৎ-ক্ষণ বিশ্রামান্তে শরীর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, নিকটে একটা অস্পষ্ট সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তদ্দর্শনে চিন্তা করিলাম, হয়তো ঐ পথে মনুষ্য যাতায়াত করে। পথটী কোন্ দিকে গিয়াছে দেখিবার জন্য, অশ্বের বলগা ধরিয়া সেই পথ দিয়া চলিলাম—দেখিলাম একটা ঝোপের নিকট আসিয়া শেষ হইয়াছে। ঝোপের মধ্যে দেখি শ্মশ্রুকেশধারী একব্যক্তি নিমীলিত নেত্রে স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাতর স্বরে জল প্রার্থনা করিলাম ; কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না, পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ডাকার পর তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা ?'' আমি উত্তর করিলাম—"আমি অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, একটু জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুণ।" তিনি কহিলেন "এখানে জল নাই।" আমি কহিলাম "যখন আপনি এখানে আছেন, তখন জল অবশ্যই আছে—পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, অনুগ্রহ করিয়া একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচান।"

"এখানে জল বাস্তবিকই নাই—তবে এই লাঠি লইয়া "শিব শিব" বলিয়া এই পাহাড়ে আঘাত করুন। ভগবানের ইচ্ছা হয়তো, জল নির্গত হইবে।" এই বলিয়া আমাকে একগাছা যষ্টি প্রদান করিলেন। আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম "মহাশয়! পিপাসায় আমার প্রাণ যায়—এ সময়ে কেন পরি-হাস করিতেছেন—একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচান।" তিনি যষ্টি দেখাইয়া পূর্ব্ব বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র করিলেন। আমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া, মনে করিলাম একবার কার্য্যটা করাই যাউক পরে আবার জল চাহিলেই হইবে। এই ভাবিয়া "শিব শিব" বলিয়া যষ্টি দ্বারা যেমন পাহাড়ে আঘাত করিলাম, অমনি যেন পার্থ শরাঘাতে ভীষ্মের পিপাসা শান্ত্যর্থ ভীষ্ম জননী ভোগবতী প্রস্রবণ-রূপে পাহাড় ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। আমি বহুল পরিমাণে তাহার স্নিগ্ধ বারি পান করিলাম, অশ্বকেও পান করাইলাম। আমাদের শরীর জুড়াইল শ্রান্তি দূর হইল, অবসাদ তিরোহিত হইল। শরীরে নূতন বল পাইলাম মনে

অতুলানন্দ অনুভব করিলাম। পিপাসা শান্তি হইবামাত্র প্রস্রবণ অন্তর্হিত হইল—জলের চিহ্নমাত্রও রহিল না। আমি "শিব শিব" শব্দ করিয়া পুনরায় পাষাণে আঘাত করিলাম, ঠক্‌ঠক্ শব্দমাত্র হইল, প্রস্রবণ আর উঠিল না। তদ্দর্শনে তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কহিলেন—"তোমার প্রবল পিপাসা শান্তি করিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছিল—তিনিই জল দিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়া-ছেন। জল আছেই বা কোথা, নাইবা কোথা।" উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া আমি পুনঃ পুনঃ নানা কৌশলে কারণ জানিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই একই কথা, একই উত্তর। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সেই শুষ্ক শরীরের জ্যোতি, অঙ্গের সৌগন্ধ প্রভৃতি বিবিধ কারণে, তাহার উপর কেমন একটু ভক্তি সঞ্চার হইল। ক্রমে তাঁহারই ক্ষমতায় প্রস্রবণ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল। তখন আগ্রহাতিশয্যে তদ্রূপ ক্ষমতা লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন—"সে উপায়ের নাম যোগ।"

"ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ইচ্ছায় পরিপুষ্ট হইতেছে এবং ইচ্ছাতে লয় হইবে। ইচ্ছা প্রবল হইলে, অদমনীয় হইলে, কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া আপন বেগে প্রবাহিত হইলে কার্য্যে পরিণত হয়। যে ইচ্ছা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার বেগ লাভ করে নাই, যাহা সহজ-দম্য, লজ্জা ভয়ে যে ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় তাহাকে ইচ্ছাই বলা যায় না। ভৌতিক জগতে ও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকে রাজা হইবার ইচ্ছা করে—কিন্তু কয়জন তজ্জন্য উদ্যম-শীল হয়। প্রকৃষ্ট বল না হইলে ইচ্ছায় উদ্যমশীলতা জন্মে না। সকলেই জানেন যে, উদ্যমশীলতাই কার্য্য সফলতার পক্ষে কারণ। সেই উদ্যমের মূলানুসন্ধান কর দেখিবে ইচ্ছাই বল প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পরিপোষণ করিতেছে। তোমার আমার ইচ্ছার যতটুকু বল কার্য্যও তৎপরিমাণ হইয়া থাকে। ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছায় আপন ইচ্ছা যোগ করিতে পারিলেই মানব পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয়। সেই কার্য্যের নামই তপস্যা—তাহারই নাম যোগ। উহা উপদেশ সাপেক্ষ, ভক্তি সাপেক্ষ, জ্ঞান সাপেক্ষ। ঐ উপদেশ, ভক্তি, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য, ঐ সকলকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিতে হয় এবং দেহ

মনকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। সেই নিয়মগুলির সাধারণ নাম সংযম। এক্ষণে কোন পুণ্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব দিবস অধিকাংশ লোকে হবিষ্যান্ন আহার করিয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র হবিষ্যান্নই যে সংযম, তাহা নহে। হবিষ্যাশন যেমন নিতান্ত প্রয়োজন দেহ ও মনকে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখাও ততোধিক আবশ্যক। অধিক কি যাহাতে মনে অনুমাত্রও পাপ চিন্তা না আইসে তাহাই কর্ত্তব্য। দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিতে পারিলেই প্রায় সকল কার্য্যই শেষ হইয়া আইসে। তখন সত্য জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলে, গুরু অন্বেষণ করিতে হয় না। তিনি স্বয়ংই শিষ্যের নিকট উপস্থিত হয়েন। অনেকে বলিয়া থাকেন সদ্‌গুরু পাওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে সৎশিষ্যই দুর্ল্লভ। গুরু গীতায় আছে "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ। দুর্ল্লভঃ সদ্‌গুরু র্দেবি শিষ্য সন্তাপ হারকঃ।" এ কথা কেবল পার্থিব গুরু দিগের—ব্যবসায়ী গুরুদিগের নিমিত্ত শাসন বাক্য। বাস্তবিকই যিনি শিষ্য সন্তাপ হারক তিনিই যথার্থ গুরুপদ বাচ্য—অপরে গুরু নামধারী প্রবঞ্চক। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উত্তম বুঝিতে পারা যায়—গুরু দুর্ল্লভ নহেন, শিষ্যই দুর্ল্লভ। শিষ্য উপযুক্ত হইবামাত্র গুরু উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন। অধিকন্তু শিষ্য উপযুক্ত হইবার জন্য কায়মন চেষ্টা করিতেছে দেখিলেও গুরু আসিয়াই হউক আর গুরু সমীপে গমন সংঘটন হইয়াই হউক, তিনি বিবিধ রূপে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। সকল কার্য্যই বিপরীত কেবল সুখে গুরু পাওয়া যায় না বলা বিড়ম্বনা মাত্র। এ স্থানে প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক মহাশয়ের লিখিত ও "বামাবোধিনীতে প্রকাশিত "লালা বাবুর দীক্ষা" শীর্ষকের একটি বৃত্তান্ত মনে পড়ায় লেখক মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে এই স্থানে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল।

"ধর্ম্ম জীবনে শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা এই দুইটি বড়ই উপাদেয় সামগ্রী। যাহা অলৌকিক পদার্থ বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তাহার নাম শাস্ত্র। এই শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থাকিলে চিন্তাশীল মনুষ্যজীবন বহুতর দুঃখ ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পায়; সুতরাং সহজেই সুখ ও সন্তোষের উদয় হইয়া জীবনকে সরস করে। শ্রদ্ধার ন্যায় জীবনকে সরস করিবার আরও একটি হেতু আছে, তাহার নাম

দৈন্য, বা নীচতা। এ নীচতা ভক্তি ভূমি, জীবনের নীচত্ব বা অধমত্ব সূচক নহে। এই দৈন্যের সহিত বক্ষমান প্রবন্ধের সম্বন্ধ আছে; এই জন্যই এ স্থলে উহার উল্লেক করিতেছি, মৃন্ময় ভূমির সহিত চিন্ময় জীবনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমির উপর বৃষ্টি পাত হয়, বৃষ্টিবারি উচ্চস্থান ত্যাগ করিয়া নিম্নস্থানে সঞ্চিত হয়। সেইরূপ যিনি অহঙ্কারের উচ্চভাব ত্যাগ করিয়া নীচ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যে কোন অপ্রাকৃত রস সেই জীবনেই সঞ্চিত হয়। অহঙ্কারীর জীবন শুষ্ক। দীক্ষা বা গুরু করণ হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি গুরুতর প্রকরণ হইলেও যতদিন জীবনে দৈন্যভাব না আইসে ততদিন তাহাতে আন্তরিক রুচি হয় না। অধুনাতন শিক্ষিতবর্গ এ প্রথার বিপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুন, প্রকৃত দৈন্যের অভাবই সে ভাবের উত্তেজক।

অধুনাতন শিক্ষিতগণের অনেকেই গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন না যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আপনার উপযুক্ত গুরু খুঁজিয়া পান না। আপনি শিষ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা, এ চিন্তা একবারও মনে উদিত হয় না। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার উপযুক্ত গুরু এ পৃথিবীতে আছেন। উৎকৃষ্ট গুরু লাভের জন্য যদি কাহারও ঐকান্তিক বাসনা হয়, তিনি অবশ্যই উৎকৃষ্ট গুরু লাভ করিবেন, এবং সেই ঐকান্তিক বাসনাবশে আপনিও উৎকৃষ্ট গুরুর শিষ্যযোগ্য হইবেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বারা আমরা ঐ কথার সমর্থন করিব।

পাইক পাড়া রাজ বংশের অন্যতম আদি পুরুষ সুবিখ্যাত বৈরাগী শ্রীল লালাবাবুর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। বৃন্দাবন যাত্রীগণ, পুলিন বা রাসস্থলী নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে যে অপূর্ব্ব দেবালয় ও কৃষ্ণরায়জীর সেবা দেখিতে পান তাহা ঐ লালাবাবুর কীর্ত্তি। তিনি কোন রজকের সন্ধ্যাকালীন একটি মাত্র বাক্য শ্রবণে যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যময় সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে ঘটনা সর্ব্বজন বিদিত। আমরা শুনিতে পাই, লালাবাবুর এই উৎকট বৈরাগ্যের বীজ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। আমাদের ঠিক স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ লালাবাবুর পিতা। এই প্রাণকৃষ্ণ অতিশিশুকালে একটী পড়া শুকপক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহেন,—"ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় পক্ষীটিও তাহা শুনিত। ভাগবত শুনিলে, যখন মনুষ্যের সংসার বন্ধন মোচন হয়, তখন ঐ পাখীটিই বা পিঞ্জরা-বদ্ধ থাকিবে কেন? এই জন্য উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" এই মহাপুরুষই লালাবাবুর পিতা। যাহা হউক লালাবাবু যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন, তখনও তাঁহার দীক্ষা হয় নাই।

যখন লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীহরিনাম সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থ হিন্দী "ভক্তমালের" বঙ্গানুবাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস বাবাজীও বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি কিরূপ সাধু ও ভক্তি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ঐ বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিতান্ত নিঃস্পৃহতা, ঐকান্তিক শরণাপত্তি, অপরিসীম দয়া, উৎকট বৈরাগ্য, অসামান্য দীনতা প্রভৃতি বৈষ্ণব গুণগ্রাম ক্রমশঃ লালাবাবুর শ্রুতি-গোচর হইল। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ও একদা বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী ইতিপূর্ব্বেই লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা, উৎকট বৈরাগ্য, শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তিকলাপাদি সকলই অবগত হইয়াছিলেন লালাবাবুর সদৃশ একটী শিষ্য লাভ করিবার জন্য অধুনাতন অনেক আচার্য্যেরই কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর যথেষ্ট সমাদর ও প্রসংশাবাদ করিয়া সাতিশয় দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষা গ্রহণে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর।—

লালাবাবু, বাবাজীর এই উক্তি শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছি. এবং নিজের ঠাকুর বাড়ীতে একমুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণভাবে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনার অপরাধ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুইচারি দিবস নিরন্তর স্বীয় চরিত্রানুশীলন করিয়া স্থির করিলেন,—

আমার এখনও হৃদয়ের প্রধান মালিন্য ও কৃষ্ণভক্তির সবিশেষ প্রতিবন্ধক

যে অহঙ্কার তাহা যায় নাই। তাহা আমার হৃদয় যুড়িয়া বসিয়া আছে। 'আমার' ঠাকুর বাড়ীতে 'আমার' ব্যয় সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, এখনও আমার এই জ্ঞান রহিয়াছে। এই গুণে আমি কিনা কৃষ্ণদাস বাবাজীর কৃপালাভ করিব! আমাকে ধিক্।"

লালাবাবুর মনে যে দিন এই ভাবের উদয় হয়, সেই দিন হইতেই তিনি মাধুকরী বৃত্তি আশ্রয় করেন। নিজের ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ভোজন এককালে ত্যাগ করেন। পাঁচ সাত কুঞ্জ বা ঠাকুরবাড়ী হইতে এক এক টুকরা রুটি ও কিঞ্চিৎ উপকরণ ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ী ও সেবায় যে মমতা ছিলা তাহা এককালে বিনষ্ট করিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে অন্যান্য উদাসীন সাধু বৈষ্ণবের মাধুকরী ভিক্ষা করিবার যে সম্বন্ধ ছিল, লালা-বাবুও কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে তদতিরিক্ত আর কোন সম্বন্ধই রাখিলেন না। 'ঐ ঠাকুরবাড়ী আমার নহে," এ জ্ঞান পরিপক্ক হইতে অবশ্য লালাবাবুরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। যখন বুঝিলেন, দুশ্ছেদ্য মমতারজ্জু উত্তমরূপে ছিন্ন হইয়াছে, আমার অহঙ্কার বুদ্ধি একেবারেই মরিয়া গিয়াছে, তখন আবার আর একদিবস কৃষ্ণদাসবাবাজীর আশ্রমে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। এবার 'বাবাজী আমাকে কৃপা করিবেন, এ আশায় আর অনুমাত্র সংশয় রহিল না। লালাবাবু বাবাজীর চরণ যুগলে দীন নয়ন অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। লালাবাবু স্বীয় প্রার্থনা জানাইবামাত্র বাবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন,—

"বাবা, তোমার দীক্ষাগ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে!!" লালাবাবু বজ্রাহতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাষিতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ এবং অপরাধীর ন্যায় বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিলেন।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥"

লোকোত্তর প্রভাবশালী মহাপুরুষগণের চিত্ত কুলিশ হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। তাহার পরিজ্ঞানে কেহই সমর্থ নহেন। বঙ্গের একজন প্রধান সামন্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়া পথের ফকির হইয়াছেন,—মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন, দীক্ষামাত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া দীননয়নে

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কৃষ্ণদাস বাবাজীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই !! লালা বাবু এইরূপে অনেকক্ষণ রোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কি দোষে এখনও দীক্ষা পাইতেছেন না, অনেক দিন ভাবিয়াও স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণরায়জীর নিকট মনের দুঃখ জানাইলেন। এই ঘটনার দুই একদিন পরেই তাঁহার মনে হইল,——

"আমি স্ত্রী পুত্র বিষয় ঐশ্বর্য্য সকলই ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি,—মাধুকরীব্রতে জীবন ধারণ করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করিতেছি, সত্য, কিন্তু এখনও ও শেঠবাবুদিগের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে পারি নাই। তবে আমার মন শুদ্ধ হইয়াছে কই? এখনও শত্রুকে ঘৃণা করিতেছি! শত্রু বিদ্বেষ এখনও মনকে ছাড়ে নাই! ধন্য বাবা কৃষ্ণ দাস! তোমায় বলিহারি যাই! তোমার মহিমারও অন্ত নাই। তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"—

এই স্থানে আর একটু ইতিহাস আছে। সে টুকু না জানিলে লালা বাবুর উক্ত ভাব বুঝা যাইবে না। মথুরা জেলার মধ্যেও লালাবাবুর কতক ভূসম্পত্তি আছে। লক্ষাধিক মুদ্রা তাহার আয় হইয়া থাকে। ঐ আয় দ্বারাই কৃষ্ণরায়জীর সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এবং উহার আদায় উসুলের সদর কাছারি ঐ ঠাকুর বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত। জয়পুরের শেঠবাবুরাও মহাভক্ত ও মহাধনী। বৃন্দাবনে তাঁহাদিগেরও ঠাকুর বাড়ী ও ঠাকুর সেবা আছে। ঐ সেবায় সমৃদ্ধির পরিসীমা নাই, অনেকেই তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ও মথুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জমিদারী আছে। বোধ হয় ঐ সকল সূত্রেই বহু-পূর্ব্ব হইতে লালাবাবুর সহিত শেঠবাবুদিগের ভয়ানক শত্রুতা জন্মিয়াছিল। এমন কি, পরস্পরে পরস্পরকে হত্যা করিবারও সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। লালাবাবুর পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থাকালেও দুই ষ্টেটের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিতে-ছিল। তজ্জন্যই লালাবাবু বৃন্দাবনে সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতেন, কেবল শেঠ-বাবুদিগের কুঞ্জে যাইতে পা উঠিত না—শেঠ বাবুদিগের বাড়ী যাইবেন এ কথা মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদিগের বাড়ী ভিক্ষা করিতে হইবে,—কি ভয়ানক কথা!

যে ভক্তকে শ্রীভগবানের কৃপা করিবার ইচ্ছা হয়, গুরু রূপে উপদেশ দিয়া

তাঁহাকে এমনি করিয়া স্বচরণ দানের যোগ্য করিয়া লন। লালাবাবুর যে দিন যেক্ষণে শেঠবাবুদিগের কথা মনে পড়িল, তাহার পরবর্ত্তী মধ্যাহ্নকালেই শ্রী-যমুনায় স্নান করিয়া অতি দীনবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিখারী দেখিয়া কাঁন্দিয়া ফেলিল। কিন্তু আপন প্রভুদিগের ভয়ে ফুকারিতে পারিল না। চক্ষের জল মুছিয়া অন্তরে গুমরিতে লাগিল। অথচ মাধুকরীও দিতে পারে না, পাছে লালাবাবুর পরম শত্রু শেঠবাবুরা রাগি করেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে শেঠবাবু-দিগের কর্ত্তাও ঠাকুরবাড়ীর গৃহান্তরে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে এই অসম্ভব সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই লালাবাবু! লালাবাবুর প্রতি যে শত্রুভাব ছিল, লালাবাবুর দীনভাব দর্শনেই তাহা দূরে গেল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শুনিয়াই তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল। সষ্টাঙ্গে ভুমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু তাঁহাকে উঠাইয়া নির্ভয়ে আলিঙ্গন করিলেন,এবং উভয়েই প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। শেঠবাবু লালাবাবুকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরী ব্রত পণ্ড হইবে বলিয়া স্থূল ভিক্ষা গ্রহণে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। শেঠবাবু অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবু মাধুকরী গ্রহণ করিয়া যেমন ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে আসি-লেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী দণ্ডায়মান! লালাবাবু মূর্চ্ছীত হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাবাজী তাঁহাকে পরম যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।" আমরা এই গুরু শিষ্যের নাম লইবারও যোগ্য নহি।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

ষট্‌চক্র রহস্য।

রাত্রি ১১টা হইয়াছে; গৃহিনী গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে শয়ন গৃহে আসিতে

ছেন এমন সময় তাঁহার পায়ে বৃশ্চিক দংশন করিল; তিনি ঘরে আসিয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন; আমি যন্ত্রণা নিবারণের জন্য কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি এমন সময় স্বামীজি ডাকিলেন 'অনন্ত দোর খোল'। স্বামীজিকে এরূপ অসময়ে আসিতে দেখিয়া বলিলাম "স্বামীজি এত রাত্রে কি মনে করে'; এই বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী স্বামীজিকে দেখিয়াই উঠিয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন "বাবা বড় যন্ত্রণা, আমাকে বিছা কামড়াইয়াছে, আমার যন্ত্রণা দূর কর।"

স্বামীজি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ও আপন মনে বলিতে লাগিলেন "মাগো এইজন্যই কি আমার মন এত অধীর হইয়াছিল?" পরে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'অনন্ত এখন কি উপায় করা যায়, আমি ত কোন ঔষধ জানি না; মায়ের এই বৃশ্চিক দংশন জ্বালা কেমনে নিবারণ হবে? এই বলিতে বলিতে স্বামীজি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিলম্বেই চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি যে, যে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল সেই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল; স্বামীজি তেজব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "মার নাম করিব, দেখি বিছার বিষ কতক্ষণ থাকে;" গৃহিণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'মা, জগদম্বিকে তোমার এই যন্ত্রণা নিবারণ জন্যই আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি একটু স্থির হইয়া শয়ন কর"। আমাকে বলিলেন "অনন্ত তুমি মার মাথাটী কোলে করিয়া বস।" আমি আমার স্ত্রীর মাথা কোলে করিয়া বসিলাম স্বামীজি উহার পায়ের দিকে গিয়া বসিলেন এবং যে পায়ে বিছা কামড়াইয়াছে উহা ধরিলেন। পায়ে হাত দিবামাত্রই গৃহিণী পা সরাইয়া লইলেন। স্বামীজি বলিলেন "মা গো পা ছুঁতে দিবি না তবে ছেলে যন্ত্রণা দূর করিবার শক্তি পাবে কোথা থেকে? দে পা দে; এই বলিয়া পা টানিয়া লইয়া নিজের ক্রোড়ের উপর রাখিলেন এবং ক্ষত স্থানের উপর তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দিয়া একটি পঞ্চকোন যন্ত্র আঁকিতে লাগিলেন এবং বোধ হয় মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন।

৫মিনিট কাল এইরূপ করিতে করিতেই আমার বোধ হইতে লাগিল যেন স্ত্রীর যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইতেছে; কেননা কিছু পূর্ব্বে তিনি যেরূপ যন্ত্রণা

প্রকাশ করিতেছিলেন, উহা ক্রমেই লাঘব হইতেছে দেখিলাম। মিনিট ১৫মধ্যে গৃহিনী আমার অঙ্গে মাথা রাখিয়া এবং স্বামীজির অঙ্গে পা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বামীজি তখন বলিলেন যে আমিও এইবারে একটু শুই; এই বলিয়া গৃহিনীর পা দুখানি ক্রোড় হইতে আস্তে আস্তে নামাইয়া সেই পদ প্রান্তে শুইয়া পড়িলেন; আমি বলিলাম স্বামীজি পায়ের দিকটাতে আর কেন থাক,এইবারে এদিকে এসে শোবে এস। স্বামীজি হাসিলেন; বলিলেন "ভ্রান্ত! এই পদপ্রান্তই শ্রান্ত জনের বিরাম স্থান; আমি এই দেহভার বহিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি তাই সতীর পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার কথা বুঝিলে না এবং এখন বুঝিতেও পারিবে না; যখন যাবতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে পরমা প্রকৃতির অধিষ্ঠান দেখিতে শিখিবে তখন আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। তুমি মনে কর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পদদ্বয় বুঝি বড় নিকৃষ্ট অঙ্গ কিন্তু প্রকৃতি সাধক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ইতর বিশেষ দেখেন না; তবে তাঁহারা স্ত্রীলোকের পদদ্বয়ই সাধনার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বুঝিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি শুনিতে চাও তবে বলি শুন।

সতী স্ত্রীর এবং উর্দ্ধরেতা মহাপুরুষের শক্তি উর্দ্ধস্রোতস্বিনী। উর্দ্ধস্রোত উদ্ভিদগণ মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধদেশে লইয়া যায় সেই জন্য উহাদিগকে পাদপ বলা হইয়া থাকে; অমরা সতীস্ত্রী এবং উর্দ্ধরেতা পুরুষগণকে ও সেই কারণে পাদপ বলিতে পারি। প্রাণময়কোষ নিঃসৃত প্রাণ পদার্থ সতী পদে পতিত হইলে, সতী চরণ নিহিত শক্তি উহা উর্দ্ধদেশে লইয়া যান অর্থাৎ মনোময় জগতে লইয়া যান; উর্দ্ধরেতা মহাপুরুষগণ সেই প্রাণ মনোময় জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিজ্ঞানময় জগতে উঠাইয়া লন এবং ভক্ত সাধকের বিজ্ঞানময়কোষ স্ফূরিত করেন; বিজ্ঞানময়কোষ স্ফুরিত হইলে, সাধক আনন্দ সমুদ্র স্বরূপা দেবী প্রকৃতিকে চিনিতে পারেন এবং তখন তিনিই সে প্রাণ পদার্থ পরমা প্রকৃতিতে লয় করিয়া আত্মজ্ঞান স্বরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন। সতী স্ত্রী এবং উর্দ্ধরেতা মহাপুরুষগণ পাদপ বলিয়াই, সাধক উহাদের চরণ আশ্রয় করিয়া থাকেন। পাদপ দ্বিবিধ; বৃক্ষ ও লতা। মহাপুরুষগণ বৃক্ষ, সতী স্ত্রী লতা। মহাপুরুষরূপ বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতিত সতী স্ত্রী দাঁড়াইতে পারেন

মা। এই জন্য উঁহাদিগকে লতা বলিতেছি। অশ্বত্থরূপ মহাগুরু মহাদেবকে নমস্কার করি এস।

ওঁ মহাদেব মহাত্রাণ মহাগুরু মহেশ্বর
সর্ব্বপাপ হরো দেব মকারায় নমোনমঃ।

আজি সেই মহাগুরুর কৃপাতেই তোমার স্ত্রীর দারুণ যন্ত্রণার এত শীঘ্র উপশম হইয়াছে। আজি তাঁহারই শক্তি এই স্ত্রী দেহে প্রবেশ করিয়াছে, তাই এই পদ প্রান্তে শয়ন করিবার অভিলাষ। এখন আর বেশী কথায় কাজ নাই। মা যতক্ষণ নিদ্রিত আছেন ততক্ষণ আমাকে জাগিয়া থাকিতে হইবে; এস দুই জনে জপ করিতে থাকি। আমরা জপ করিতে লাগিলাম। আমার শরীর কিন্তু ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল; আমি বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এই নিদ্রাবস্থায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের শয়ন গৃহে শয়ন করিয়া আছি এমন সময় পক্ককেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, শ্বেতবর্ণ শান্ত, শুক্লাম্বর পরিধান উজ্জ্বল চক্ষু একজন পুরুষ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরা উঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিলাম, আমার মনে হইল উনি আমার পিতা। (আমি আমার পিতাকে কখনও দেখি নাই; আমার বাল্যাবস্থাতেই তিনি দেশ ভ্রমণে গিয়া আর ফেরেন নাই; কেহ বলিতেন তিনি মারা গিয়াছেন, কেহ বলিতেন যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন) আমরা উভয়েই তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; তিনি স্বস্তি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উহার পর তিনি আমাকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা উভয়ে চলিতে চলিতে একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বনে প্রবেশ করিয়া কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি একা ঐ বনের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। সেখানে নানাবিধ হিংস্র জন্তু সকল বিচরণ করিতেছে দেখিলাম, কিন্তু উহারা কেহই আমাকে কিছু বলিল না। বনের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী দেখিলাম। পুষ্করিণিটী অতি সুন্দর, চারিদিকে ফুল গাছ; জল অতি পরিষ্কার—পুকুরের তল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। আমি পুকুরের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঐ সময় একটি সাপ আমার দিকে আসিতে লাগিল। সর্প দেখিয়া আমি বড় ভীত হইলাম সাপ আমার কাছে আসিতে না আসিতে আমি আকাশে উঠিতে

লাগিলাম, সাপও আমাকে ধরিবার জন্য আকাশে উঠিতে লাগিল। যখন দেখিলাম যে সর্প আমার প্রায় কাছে আসিয়াছে তখন আমি আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম; নামিতে নামিতে পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি পদ্ম ফুল রহিয়াছে দেখিলাম; পদ্মটীর রং কৃষ্ণবর্ণ। মনে হইল ঐ পদ্মের ভিতর লুকাইয়া পড়ি। আমার দেহ সংকুচিত করিয়া পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সর্প ও সেই পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিল; আমি তখন আর কোন দিকে পথ পাইলাম না; সর্প আমার কপালে এক চোবল দিল। ঐ আঘাতে আমার মাথা বম্ শব্দ করিয়া দুইভাগ হইয়া গেল। এই বারে বড় এক নূতন রকমের অস্তিত্ব বোধ করিলাম; এই সময় বোধ হইল যে দুইখণ্ডে বিভক্ত মস্তকের আধখানা আমার মাথা, অপর অর্দ্ধেক সর্পের ফনা। সর্পকে আর কোন ভয় হইতেছে না; সর্পকে জিজ্ঞাসা করিলাম এস্থানের নাম কি? সর্প বলিল মূলাধার। তার পর আমি দেখিলাম যে পদ্মের মৃণালের মধ্যে তিনটী ছিদ্র রহিয়াছে; ইচ্ছা হইল যে মধ্যের ছিদ্রটির মধ্যে প্রবেশ করিব। আমার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া একটি ছোট নক্ষত্রের আকারে পরিণত হইল, এবং আমি এই বিন্দুবৎ দেহ লইয়া মধ্যের ছিদ্রটির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ছিদ্রের মধ্যে যখন প্রবেশ করিলাম তখন আমার অস্তিত্ব জ্ঞান আবার নূতন রকমের হইল। তখন আমার দেহ আর বিন্দুবৎ নহে এবং যেখানে প্রবেশ করিলাম উহা একটি সূক্ষ্ম মৃণাল ছিদ্র নহে; আমি তখন দেখি যে আমি মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী একজন এক নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। একটি সুন্দর পথ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম; সর্প ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে; আমরা উভয়ে সেই পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; কত কত সুন্দর বৃক্ষ লতা কত প্রকার জন্তু, আরও নূতন নূতন কত কি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কতক দূর গিয়া একটি পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম; পর্ব্বতের চারিদিকে লালের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের ফুল সব ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং পর্ব্বতের উপরে একটি গোলাকার পুষ্করিণী রহিয়াছে দেখিলাম। ঐ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি মন্দির। আমরা সাড়ে তিন পাক ঘুরিয়া ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম; মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি যে মন্দিরের ভিতর চারিদিকে ফুল বাগান এবং মধ্যে একটি শিব লিঙ্গ রহিয়াছে। সর্প আমাকে বলিল এই লিঙ্গের পূজা

কর; আমি পূজা করিলাম। পূজা সমাপনান্তে দেখি যে লিঙ্গ ভেদ করিয়া একটি পদ্ম উঠিয়াছে; পদ্মটির বর্ণ লালের আভা যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ; সর্প আমাকে বলিল এই স্থানের নাম স্বাধিষ্ঠান। উহার পর আবার পূর্ব্বের ন্যায় পদ্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিন্দুরূপী হইয়া ঐ পদ্মের মৃণাল ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলাম। এখানেও একটী পথ ধরিয়া দুই জনে চলিলাম এবং নানাবিধ বৃক্ষ লতা ফল ফুল জীব জন্তু দেখিতে দেখিতে এক পর্ব্বতোপরি একটি ত্রিকোণ পুষ্করিণী মধ্যস্থ একটি ত্রিকোণ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আমরা সাত পাক ঘুরিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ঐ মন্দির মধ্যেও একটি শিব লিঙ্গ রহিয়াছে; সর্পের কথামত ঐ লিঙ্গের পূজা করিলাম, পূজা শেষ হইলে ঐ লিঙ্গ ভেদ করিয়া একটি পদ্ম উঠিয়াছে দেখিলাম। এই পদ্মটির রং লোহিত বর্ণ। সর্প বলিল এই স্থানের নাম মণিপুর। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এই পদ্ম মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলাম। কতকদূর সেই রাজ্যে বিচরণ করিয়া নীল পদ্মরাজি শোভিত এক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি ষট্‌কোণ মন্দির মধ্যে সাত পাক ঘুরিয়া প্রবেশ করিয়া একটি শিব মূর্ত্তি দেখিলাম এবং উহার পার্শ্বে আমার আকারের এক-জন মনুষ্য দেখিলাম। আমরা তথায় পূজা করিতে করিতে সেই লোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। পূজা সমাপনান্তে ঐ শিব মূর্ত্তির মধ্যে একটী সুনীল বর্ণের পদ্ম দেখিতে পাইলাম। সর্প বলিল এই স্থানের নাম অনাহত। আমরা ঐ নীল পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। এখানকার পর্ব্বতের উপর পঞ্চ কোন মন্দির; উহার মধ্যে সাড়ে তিন পাক ঘুরিয়া প্রবেশ করিয়া শিব লিঙ্গ পূজা করিলাম। লিঙ্গ ভেদ করিয়া যে পদ্ম ফুটিল উহার রং নীলের আভাযুক্ত শুভ্রবর্ণ। সর্প বলিল এই স্থানের নাম বিশুদ্ধাখ্য। তারপর সেই পদ্মের ভিতর দিয়া যেখানে যাইলাম সেখান-কার পর্ব্বতটি সাদা ফুলে সুশোভিত; পর্ব্বতের উপর একটি ত্রিকোণ মন্দির উহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। সাত পাক ঘুরিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতর অর্দ্ধনীল এবং অর্দ্ধশ্বেত একটি শিবমূর্ত্তি দেখিলাম। ইহাঁর পূজা করিতে করিতে সর্প আমার কপালে চোবল

মারিল; আমার মাথা ও শব্দে ফাটিয়া সহস্রফণা ধারণ করিল এবং ঐ সহস্র ফণার মধ্যে আবার আমার মাথা দেখিতে পাইলাম। পূজা শেষ হইলে ঐ শিবমূর্ত্তি ফাটিয়া দুই ভাগ হইল এক ভাগ নর এক ভাগ নারী এবং মধ্যস্থলে একটি শ্বেত পদ্ম দেখা গেল। সর্প বলিল এই স্থানের নাম আজ্ঞা। এই শ্বেত পদ্মের ভিতর দিয়া আমরা যেখানে উপস্থিত হইলাম সেখানে কিছুই নাই কেবল সুন্দর জ্যোতিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পরে সেই আলোকের মধ্যে মহাদেব ও গৌরীর মূর্ত্তি দেখিলাম; উহাদিগকে পূজা করিয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দেখি যে সহস্র ফণা বেষ্টিত আমার মাথার উপরে সেই দুই মূর্ত্তি রহিয়াছেন। এই খানে আমি সর্পের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম সর্প বলিল আমার নাম অনন্ত। আমি নমস্কার করিলাম। তাহার পর যেন ঘুমাইয়া প'ড়লাম ইহা এক অপূর্ব্ব বিরাম অবস্থা। সেই ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি যে বাড়ীতে আসিয়াছি। উহার পর সত্য সত্য নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ; গৃহিনীর ও নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

আমি গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম মাতু, যন্ত্রণা সারিয়াছে কি?

গৃহিণী বলিলেন কোন যন্ত্রনা নাই আমি বড় আরামে ছিলাম। যখন মৃত্যু যন্ত্রণা আসিবে তখন তুমি আমাকে এই রকম কোলে করে থেকো, আমি তোমার কোলে শুইয়া মরিব। স্বামীজি কোথায় গেলেন? স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন "আবাগীর বেটি, নিজের মরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই চিদানন্দ মরে তোর পেটে জন্মাবে আগে তার ব্যবস্থা কর।"

গৃহিনী সশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া স্বামীজিকে নমস্কার করিলেন, আমি ও নমস্কার করিলাম। তোরা ঘুমো আমি চলিলাম, এই বলিয়া স্বামীজি চলিয়া গেলেন। উহার পরদিন আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বামীজিকে বলিয়া উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করি তিনি বলেন পরে বলিবেন।

শ্রীঅনন্তরাম।

গীত।

উমা নাম সাধন কর,
উমানাথে দেখ্‌তে পাবে ;
প্রকৃতিরে সামনে ধর,
পুরুষ কেমন জ্ঞান হবে।
নামের রূপ প্রাণে এলে,
অবিদ্যারূপ যাবে চলে,
মন উ, ম, আ এই মন্ত্র
তোরে মহামন্ত্রে দীক্ষা দিবে।

শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ।

যমালয়ের ফেরত।

এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন জনসমাজে কোন অসাধারণ অনৈসর্গিক ঘটনা প্রকাশ করা লেখকের একটী কঠিন কর্ম্ম। কালীদহে কমলে কামিনীর প্রমাণ আভবে ধনপতি সদাগর প্রভৃতি বহু বহু ধনপতিকেই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যাহ্নকালে হিন্দু রাজারই বিচারে মিথ্যাবাদী অপরাধে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। অতএব শির্ষোক্ত অনৈসর্গিক ঘটনাটী যে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ক্ষিপ্তের প্রলাপ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু এই ঘটনার অন্যতর প্রমাণ অনাবশ্যক, কারণ ইহা কল্পিত বিষয় নহে। লেখক নিজেই ইহার অধিনায়ক। ইহার প্রচার প্রাচ্য ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইতে পারে বিবেচনা করিয়া যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহাদিগেরই প্রিয় "পন্থা" অবলম্বন করিলাম।

১২৯৬ সালের মাঘ মাসের শেষ ভাগে রাত্রি অনুমান সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় আহারাদি সমাপনান্তে দ্বিতলে আমার শয়ন কক্ষে শয়ন করিলাম, এবং শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলাম। পরে রাত্রি সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় দারুণ পেটের যন্ত্রণায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি নিম্নতলে অবতীর্ণ হইলাম। উপর্য্যুপরি দুইবার দমকা ভেদ হইয়া আমি সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। এবং নিম্নতলস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলাম। এ গৃহটী আগন্তুকগণের আহ্বানের নিমিত্তই সর্ব্বদা পরিস্কৃত ও সজ্জিত থাকিত। তথায় আমার আর নিদ্রা হইল না। দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইলাম। ক্রমশঃ বমন আসিয়া যোগ দিল। পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন হওয়ায় শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। রোগের এত বৃদ্ধি সত্তে ও ইহা যে বিসূচিকা রোগ এবং আমার মৃত্যু যে অতি নিকট তাহা আমি মনেও করিলাম না। ভাবিলাম, অজীর্ণই ইহার কারণ, এবং নিদ্রাই ইহার ঔষধ। তজ্জন্য এ সংবাদ অন্য কাহাকে ও জ্ঞাত করিলাম না, কেবল পার্শ্বগৃহস্থিতা আমাদের পরিচারিকা কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিল মাত্র। আরও তখন নিশা অবসান প্রায় ; সামান্য ক্ষণের জন্য সুপ্ত ব্যক্তির শান্তি ভঙ্গে অনিচ্ছুক হইলাম। কিন্তু ঘটনার অদ্ভুত গতি কে বুঝিতে পারে। আমার রোগের বৃদ্ধি রাখিল, মস্তক ঘূর্ণন, হস্ত ও পদের শীতলতা, অন্তঃদাহ প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার আসন্ন মৃত্যু বিজ্ঞাপিত করিল। আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইলাম। যথাসাধ্য উচ্চৈস্বরে ডাকিলাম—তখন সাহার্য্যের আশায়, কিন্তু তাহা বিফল হইল। আমার ক্ষীণস্বর বোধ হয় গৃহের দ্বার ও অতিক্রম করিল না। আমি হতাশ হইলাম চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল ভয়ানক বিকট মুর্ত্তি সকল আমার চতুপার্শ্বে ঘুরিতেছে। কোন কোনটী বা আমাকে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আমি শশকবৎ ভীত হইয়া লেপ মুড়ি দিলাম। ভাবিলাম, আমার কর্ম্মদোষে আত্মীয় স্বজনপরিবৃত স্থানে থাকিয়াও অসহায় অনাথের ন্যায় আমাকে মরিতে

হইল। পরিবার বর্গের মুখ মনে পড়িয়া তাহাদের সহিত আসন্ন চির বিচ্ছেদের কথা ব্যাকুল চিত্তে ভাবিতেছি এমন সময়ে বোধ হইল যেন কোন আত্মীয় আসিয়া আমার গৃহের দ্বারে করাঘাত করিতেছে আমি সাগ্রহে ও আশা পূর্ণ লোচনে সেই দিক দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু হায়! কি দেখিলাম! মনে হলে এখনও শরীর রোমাঞ্চ হয়। দেখিলাম দুই বিকটাকার মূর্ত্তি আমার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতঃ দুই কোণে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা দীর্ঘে অনুমাণ ছয় হস্ত পরিমিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মনুষ্য অপেক্ষা আয়তনে অনেক বৃহৎ এবং লোমাবৃত। উভয়ের মস্তক দুটি বড় তোল হাড়ির ন্যায় বড় এবং অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত নিবিড় ঘন কেশে সমাচ্ছন্ন, রুক্ষ জটা ভারান্বিত ও তাহাতে নীলবর্ণ উষ্ণীষযুক্ত হইয়া ভয়ানক মূর্ত্তি দুটি আরও ভয়ানক হইয়াছে। জবা কুসুম সদৃশ লোহিত গোলাকার চক্ষুদ্বয় অবিরত ঘূর্ণায়মান। তাহাদিগের ওষ্ঠগুলি যথেষ্ট স্থূল হইলেও সুবৃহত দন্তপাঁতির সম্যক্ আবরণে অসমর্থ; নাসিকা সুলম্বিত বটে কিন্তু সমুন্নত নহে। সুদীর্ঘ কেশরাশি আবৃত থাকায় কর্ণদ্বয়ের পূর্ণ দর্শন হয় নাই। বর্ণ ঘোর কাল, গুম্ফরাশিও তদ্রূপ ও সুনিবিড়। তাহাদিগের সুবিস্তৃত চিবুকে হস্তাধিক পরিমিত দীর্ঘ শ্মশ্রু লম্বিত ছিল; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। রক্তবর্ণ বসন দুখানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয়দিগের ন্যায় পরিধিত। এবং তাহারা উভয়েই মুদ্গরধারী। ইহা দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম ও ভয়ে চক্ষু বুজিলাম। তদ্দর্শনে তাহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক আরক্তলোচন ঘুর্ণিত করিয়া, মুগ্দর উত্তোলন করতঃ আমার প্রতি ধাবিত হইল। আমি সংজ্ঞা হারাইলাম। অথবা আমি মরিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি ভাবিতেছ, কি দেখিতেছ, আমরা কে এখনও কি জানিতে পার নাই? আমরা দুজন যমদূত তোমাকে লইতে আসিয়াছি,তোমায় এখনই সেথায় যেতে হবে চল।" এতচ্ছ্রবণে কোনও বাদ প্রতিবাদ বৃথা বিবেচনায় মৌন রহিলাম। তৎপরে তাহারা উভয়েই আমার উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের দৃঢ় বন্ধনে আমি মুর্চ্ছিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি কোন কঠিন পদার্থে পদস্পর্শ হইয়া আমার মোহ দূর হইল। দেখিলাম,

ইহা একটী অপরিচিত স্থান ঘোর তমসাবৃত। ভাবিলাম, ইহাই বুঝি যমপুরী যে স্থানের কথা দূতেরা পূর্ব্বেই আমাকে, জ্ঞাত করিয়াছিল। তাহারা আমাকে সেই ভাবে কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া একটী অধিকতর অন্ধকার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না কেবল কতক গুলি লোকের কোলাহল শ্রুত হইল। আমি সেই কোলাহলে বিশেষরূপে মন নিবিষ্ট করিলাম। কিয়ৎকাল পরে শুনিলাম, কে যেন বলিতেছে যে ইহাকে ঘৃতপূর্ণ তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ কর। তচ্ছ্রবণে সেই গৃহ মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল, পরক্ষণেই তাহা গৃহের বহির্ভাগে চলিয়া গেল, আর কিছুই শুনা গেল না। পরে দূতেরা আমাকে সেই গৃহের অন্য স্থানে উপস্থিত করিল। পূর্ব্ব হইতেই আমি বিশেষ ভীত ছিলাম, তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির দণ্ডের কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমি ভীতাক্তকরণে আকুল নয়নে দণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম কিন্তু আমার ভাগ্যে বিপরীত ফল ফলিল। আমার নামোচ্চারণপূর্ব্বক আদেশ হইল "ইহাকে কেন লইয়া আসিয়াছ এ সে——নহে, যাও যথাস্থানে ইহাকে পহুঁছিয়া দাও।" কিন্তু কে যে কোথা হইতে বলিতেছে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শুভ আদেশ শুনিয়া আমি কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইলাম। সেই ভীষণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমার ভয়ের কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল বটে কিন্তু সেই ভীষণ দর্শন সমন সদৃশ দূতদ্বয়ের কঠিন বন্ধন হইতে তখনও নিষ্কৃতি পাই নাই। তাহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণের উপর দিয়া আমাকে লইয়া চলিল। আমি কৌতুহলী হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; পূর্ব্বে ভীত থাকায় কিছুই দেখা হয় নাই। এখন দেখিলাম প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে প্রবল তেজে আগুণ জ্বলিতেছে। তাহা হইতে রাশি রাশি ধূমোদ্গীরণ হওয়াতে গগন মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। বোধ হইল যেন অসংখ্য গৃহে এককালে অগ্নি সংযোজিত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে অনলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই অনলের সাহায্যে আমি যমপুরীর কিয়দংশ দেখিয়া লইলাম। পুরীটী প্রাচীর বেষ্টিত কিনা বলিতে পারি না তবে একদিকে একটী উচ্চ বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর দেখিলাম; উহার আদি কিম্বা অন্ত দেখিলাম না অথবা অন্য দিকে উহার অনুরূপ প্রাচীর আছে কি না দেখা গেল না।

প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তাহাতে অট্টালিকা সমূহ পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। সে প্রাঙ্গণে বৃক্ষাদি কিছুই দেখা গেল না বহু দূরে ২ যাহা ২।১টী দৃষ্ট হইল তাহাও পত্র পুষ্প বিহীন বোধ হইল। আমি এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ সেই অনল রাশির সমীপস্থ হইলাম। তথায় অসংখ্য লোকের আর্ত্তনাদ, কোলাহল পরিত্রাহি চীৎকার শ্রুত হইল। বোধ হইল তাহারা সেই ভীষণ হুতাশনেরই মধ্য হইতেই উত্থিত হইতেছে। আমি সেই কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলাম। কিন্তু আমাকে অধিকক্ষণ সে যাতনা ভোগ করিতে হইল না অচিরেই পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এবং সহসা মূর্চ্ছিত হইলাম।

আমি বাল্যকাল হইতে মাতুলালয়েই বাস করি। আমি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া যমালয়ে নীত হইয়াছি তাহা মাতুল মহাশয় কিম্বা বাটীর অন্য কেহই পরিজ্ঞাত হয় নাই। কেবল আমাদের পরিচারিকা কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিল মাত্র এবং প্রভাত হইলে তৎসূত্রে বাটীর সকলেই পরিশেষে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মাতুল মহাশয় আমার মৃত্যু অবস্থাকে সুষুপ্ত অবস্থা মনে করিয়া কোন প্রকার বিঘ্নোৎপাদন করেন নাই বরং যাহাতে অপর কাহার দ্বারা আমার কল্পিত নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সে বিষয়ে মনোযোগী হয়েন। পরে আমার লঘু আহারের বন্দোবস্ত করিয়া যথাসময়ে স্বকার্য্যে গমন করেন।

সাংসারিক নানা কারণে বেলা প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে আমাকে পথ্য দিবার উদ্দেশে মাতুলানী আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে আমার মৃত্যু পরিজ্ঞাত হন এবং অকস্মাৎ শোকাভিভূত হইয়া সকরুণ বিলাপ করিতে থাকিলে বাটীর অন্য লোকের এবং ক্রমে প্রতিবাসীরা আমার অকস্মাৎ মৃত্যু জ্ঞাত হইয়া মাতুলানীর সহিত বিলাপে যোগ দেন। পরে যথাবিধি এই সমবেত বিলাপের নানাবিধ প্রবল উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে যখন আমার মৃত দেহের সৎকারার্থে লইয়া যাইবার অয়োজন হইতেছে তখন আমার মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। আমি চক্ষু উন্মীলন করিলাম। নাসিকাগ্রভাগ ঈষৎ নড়িয়া উঠিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মৃদু শ্বাস বহিতে লাগিল। যদিও অল্পে অল্পে আমার প্রাণ সংজ্ঞা হইতেছিল কিন্তু চৈতন্য ও স্মৃতির উদয় হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম গৃহ মধ্যস্থ শয্যা

হইতে আমি বহির্ভাগে অলিন্দে আনীত হইয়াছি। আমার এতাদৃশ চৈতন্য লাভে সকলেই আমাকে দানো পাইয়াছে মনে করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। আমি তাহাতে বিশেষ মনোযোগী না হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে ক্রন্দন হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তিকে ঈঙ্গিত করিলাম। আমি পুনর্জ্জীবিত হইলাম বটে কিন্তু সেই দূতদ্বয়ের দৃঢ় বন্ধন হইতে তখনও মুক্ত হইতে পারি নাই কারণ আমার উভয় হস্তেই যাতনা অনুভব করিতেছিলাম। কিয়ৎকাল পরে আমার বাক্‌শক্তির পুনরাধিষ্ঠান হইলে আমার হস্তের দৃঢ় বন্ধন মোচন করিতে বলিলাম। একথা শুনিয়া সকলেই অশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমার বাক্যস্ফূরণে সকলের ভয় দূর হইয়া আশ্বস্ত হইলেন সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে আমার হস্তের বন্ধন অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল উভয় হস্তেই এক একটী গোলাকার রেখাদ্বয় হইতে শোনিত ক্ষরণ হইতেছে তাহাতে ঔষধাদি লেপন দ্বারা উপশম হইলে আমি কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হওয়তঃ উপস্থিত পূজনীয় ও কল্যানীয়দিগকে আমার পীড়ার কথা অদ্যোপান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাদের কৌতুহল নিবারণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিলাম। আমি ক্রমে ক্রমে অতি অল্প দিনেই আরোগ্য লাভ করিলাম বটে কিন্তু সেই ক্ষত স্থান আরোগ্য হইতে ২।৩ মাস লাগিল। পরে তাহাতে একটি নীলিমা রেখা পতিত হইল যাহা অদ্যাপী সম্পূর্ণ রূপে মিলাইয়া যায় নাই।

আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়া প্রায় ২।৩ মাস রাত্রিকালে একাকী থাকিতে পারিতাম না। সেই বিকট মূর্ত্তি দুটী মনে পড়িলেই শিহরিয়া উঠিতাম। এখন আর আমার সে ভয় নাই। কিন্তু সে মূর্ত্তি দুটী আমার চিত্রপটে অঙ্কিত আছে। বোধ হয় ইহ জীবনে তাহা বিস্মরণ হইব না।

অলৌকিক ঘটনাবলী।

(১২)

আমাদের পল্লীস্থ কোন সম্পন্ন ভদ্রলোকের স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে তিনি

ত্রিতলস্থ শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বিতলের কোন এক কক্ষে শয়ন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিতলের কক্ষে চাবি বন্ধ থাকিত কারণ তাঁহার সমস্ত আসবাবাদি বহু মূল্যের। কালক্রমে শোকমুক্ত হইয়া তিনি বিষয়কর্ম্মে অধিকতর নিবিষ্ট হইলেন। এক দিবস তৃতীয় প্রহর বেলা তিনটার সময় তাঁহার বাটীর ভৃত্য আফিসে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তার আসিয়াও তাঁহার চেতনা করিতে পারেন নাই। এই সংবাদে তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আফিসের বড় সাহেবকে বলিয়া ভৃত্যের সহিত সত্বর বাটি আসিলেন। আসিয়া কন্যাকে নাম ধরিয়া সস্নেহে ডাকিবামাত্র কন্যা উত্তর দিল যে তুমি কোন অপরাধে আমাকে স্থানচ্যুত করিলে? ভদ্র লোকটি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন যে মা তুমি কি বকিতেছ? তাহাতে কন্যা বলিল যে তুমি আমাকে মাতৃসম্বোধন করিও না কারণ এখন আমি ইহাকে আবিষ্ট করিয়াছি। আমি তোমার মৃতা পত্নী। মৃত্যুর পর হইতে আমি স্নেহ বশতঃ তোমাকে ও এ বাটীকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। উত্তর দিকে যে বৃক্ষ ছিল তাহাতে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি সে বৃক্ষ কাটীয়া ফেলায় আমি শয়ন কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করি। সেই কক্ষে আমি নিরুপদ্রবে বাস করিতেছিলাম কিন্তু সে দিন তোমার দুইজন দাসী আমার কক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়া আমার বিশ্রাম পীড়া দিয়াছে বলিয়া তোমাকে জানাইবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে আশ্রয় করিয়াছি। কন্যার কোনই ভয় নাই কারণ ইনি তোমারও যেমন আমারও তেমনই স্নেহের সামগ্রী। তবে এইমাত্র ব্যক্তব্য যে আমার বিশ্রাম পীড়া দিলেই আমি কন্যাকে আবিষ্ট করিব। ইহা বলিয়া কন্যা চুপ করিল ও ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রকৃতিস্থা হইল।

এই ঘটনার কয়েকমাস পর ভদ্র লোকটি অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গমন করেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়াও অনিদ্রা রোগের কোনই উপশম হইলনা। এক দিবস রাত্রিকালে কোন মতেই নিদ্রা হইতেছে না শয্যায় অস্থির ভাবে এপাশ ও পাশ করিতেছেন দীপটী ঈষৎ জ্বলিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ শয্যার অপর দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিলেন যে তাঁহার মৃতা পত্নী তাঁহার শয্যার

নিকট ধীরপাদবিক্ষেপে আসিতেছেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ অথচ কিরূপে তিনি আসিলেন কিছুই না বুঝিয়া তিনি অস্ফুট চিৎকার করিবামাত্র স্ত্রী বলিল ভয় পাইও না, আমি তোমার বিরহে আর থাকিতে না পারিয়া এখানে তোমাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। তুমি আমার কথা শুন বাটী চল ঔষধ ফেলিয়া দেও আগামী কল্য রেল গাড়িতে চড়িবামাত্র তোমার সুনিদ্রা আসিবে এবং বাটীতে গেলেই তুমি নিরাময় হইবে। আমার কথায় প্রত্যয় কর। আমি তোমার প্রেম বিস্মৃত হইতে পারি নাই। দেখিবে আমার দ্বারা তোমার কত আর্থিক উন্নতি হয়।

এই বলিয়া কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল। বিস্ময়ে ও ভয়ে ভদ্রলোকটী স্থির থাকিতে না পারিয়া ভৃত্যবর্গকে জাগাইলেন ও তাহাদের এক জনকে তাঁহার কক্ষে শয়ন করিতে বলিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি ঘটনা গুলি মনে মনে আন্দোলন করিয়া বাটী যাওয়াই স্থির করিলেন ও ভৃত্যগণকে তদনুযায়ী আদেশ করিয়া রাত্রির গাড়িতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গাড়ি ছাড়িবামাত্র তাঁহার নিদ্রা বেশ হইল ও সত্বর গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত হইলেন। ঔষধ সেবন করিয়াও যিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারেন নাই তিনি বিনা ঔষধে সমস্ত রাত্রি সুনিদ্রায় যাপন করিয়া পরদিন অনেকটা সুস্থ শরীরেও প্রফুল্ল মনে গৃহে আসিলেন। সেই অবধি তাঁহার বর্ষে বর্ষে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল কারণ তিনি মণিকার ব্যাবসায়ে সমধিক খ্যাতি লাভ করিলেন। এক্ষণে সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন।

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরাখণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়।

(ষষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যার ২২৮ পৃষ্ঠার পর)

অনূন দণ্ডদ্বয় কাল গভীর নিদ্রার পর চিন্তামণি সম্পূর্ণ গতক্লম হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। একজন চেলা উপাদেয় ভোজনসামগ্রী তাঁহার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। পার্ব্বতীয় পবিত্র জল বায়ুকৃত তীক্ষ্ণ বুভুক্ষাহেতু তিনি সেই সমস্ত বস্তুর সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিলেন না। দিনমণি, ব্রাহ্মণগণপ্রদত্ত সায়ং-সন্ধ্যাকালীন অর্ঘ্যস্থ রক্তচন্দন সংলিপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করতঃ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতপার্শ্বে আশ্রয় লইলেন উষাদেবী ধীর পদে অগ্রসর হইলেন দুরন্ত তিমিরাসুর তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সুন্দরী পলায়ণ করিলেন দেখিয়া সে জগৎকে আক্রমণ করিয়া চিন্তামণির মানসগগনে একে একে সমস্ত জীবনের ঘটনাবলী উদিত ও অস্তমিত হইতে লাগিল। তাঁহার বাল্যপ্রণয়, যৌবনের উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি নিরস্ত করিতে তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। বালক চিন্তামণি যেন মৃত্যুকে অন্তরায় করিয়া যৌবনপ্রাপ্ত উচ্চতর জীবনে জীবন সঞ্চারিত। তিনি এরূপ অবস্থায় উন্নিত হইবেন তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। বিধাতা ইহারই জন্য পৌঢ়ে তাঁহার অদৃষ্টে ক্লেশ লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারে আঘদাপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন "পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রথম পর্য্যায়ের দীক্ষার্ত্তীগণ একত্রিত হইয়াছেন,আপনাকে ও এখনই মহাত্মাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব কৃপাদানে আপনকে প্রথম সংস্কারের উপযোগী করিবার জন্য পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করা যাউক।"

চিন্তামণি যে সত্যজ্ঞান লাভার্থ এত ব্যগ্র হইয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার হৃদয় পর্ব্বকালীন সাগরবৎ উদ্বেলিত হইতেছে, সেই জ্ঞান তাঁহার নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া একান্ত মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"হে অনন্তদেব! তুমি আমার হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেছ। সম্পূর্ণরূপে তোমার সেবা করিতে সমর্থ হইবার, জাগতিক জীবগণকে তোমার পথে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত আমার প্রবল ও প্রকৃত ইচ্ছা তোমার অবিদিত নাই। সেই কারণেই আমি এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে উপস্থিত। তোমার ইচ্ছা আমাকে অবগত কর, আমাকে তোমার পবিত্রতার অধিকারী কর যে, আমি তোমার কার্য্য সাধন করিতে পারি তোমার মঙ্গল প্রচার করিতে সক্ষম হই। যদি এই হিমাচলবাসী অতীন্দ্রিকার্য্যকারীগণ তোমার সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, যদি ইহাঁরা তোমার নিকটবর্ত্তি হইয়া থাকেন তবে ইহাদিগকে তোমার আশীর্ব্বাদ প্রেরণ কর এবং আমাকেও তাহার অংশ প্রদান কর। আমার বুদ্ধির প্রখরতা সাধন কর তোমার জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযোগী কর।"

ব্রাহ্মণ। "তথাস্তু।"

এই সময়ে দ্বারদেশে তিনবার আঘাতের শব্দ হইল। "এইবার সময় হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তামণির হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বংশদণ্ডধারী দুইজন প্রবর্ত্তকের (১) এক হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গৃহের চতুর্ভিতে গৈরিক বসন পরিহিত অনেক গুলি দীক্ষার্থী উপবিষ্ট। শুক্ল বসনাচ্ছাদিত মহা মহিমান্বিত গম্ভীরাকৃতি তিনব্যক্তি একটী উচ্চ বেদিকায় বসিয়া আছেন; তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ উচ্চতম আসনারূঢ়। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ এবং শরীর কথঞ্চিৎ কৃশ, রজতকান্তি শ্মশ্রুরাজি আবক্ষ বিলম্বিত, গ্রীবাদেশ অতিক্রমকারী পক্ককেশপাশ পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়াছে, দেখিলেই পুরাণ বর্ণিত ঋষি বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রবর্ত্তকদ্বয় সসম্ভ্রম পাদবিক্ষেপে চিন্তামণিকে লইয়া বেদির সম্মুখীন হইলে, তিনজন মহাত্মাই একতালে ভূমিতে বারত্রয় যষ্টি আঘাত করিলেন। তখন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মহাপুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কে আসিতেছে।"

---

(১) প্র নিজন্ত বৃৎ ণক্=প্রবর্ত্তক=

প্রবর্ত্তকদ্বয় উত্তর করিল "প্রাচ্য জ্ঞানীগণের গূঢ় পন্থা ও সর্ব্বজনীয় ভ্রাতৃ-ভাবে দীক্ষার্থী।"

মহাপুরুষ কহিলেন "অগ্রসর হও।"

চিন্তামণি অগ্রসর হইয়া দণ্ডবৎ হইলে, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখানে আগমনের অভিপ্রায় কি ?"

চিন্তা। "সত্যজ্ঞান লাভাভিলাষ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গান।

তবে তুমি হাস্‌ছ কেন, ও ভাই কেউ কার নয়
তাওতো জান।
পরনিন্দা শুনলে পরে, আহ্লাদে কান পেতে শুন,
আবার নিজের বেলা হয়ে কালা আপনারে না
আপনি চেন।
সবাই উপর আমি তুচ্ছ এই কথাটী মনে যেন,
যেমন দর্পনে মুখ দেখলে পরে, ঘার নেড়ে গান
গায় না গেনো।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

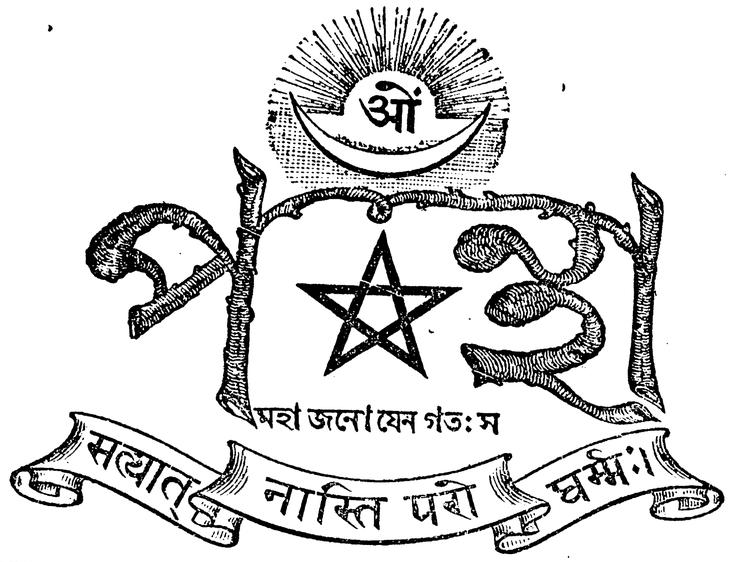

২য় ভাগ। | পৌষ ১৩০৫ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

স্বর্গীয় মহারাজা দ্বার ভাঙ্গা।

(১)

পড়িল ভাঙ্গিয়া এক ওই মহামহীরুহ।
সর্ব্বলোক প্রিয়কারী ছিল সম কামদুহ।
শুভ্র যশঃ পুষ্পরাশি রেখেছিল আলো করি;
উঠিত উথলি যার সুগন্ধ দিগন্ত ভরি।
পৌরুষ, দাক্ষিণ্য, দয়া, রসপূর্ণ ফলগুচ্ছ,
রেখেছিল করি তারে উচ্চ হতে আরো উচ্চ।

সতত উন্মুক্ত কর শত দিকে প্রসারিত।
চির স্নিগ্ধ চির রম্য ছায়াখানি অবারিত।
শতলক্ষ জনাশ্রয় ভাঙিয়া পড়িল আজ।
অকরুণ দেবতার অকালে উদ্যত বাজ!

(২)

এ অত্যাচারের মোরা এস প্রতিশোধ লই!
প্রতিবন্দিতায় মোরা হব সবে মৃত্যুঞ্জয়ী!
মৃত্যু? কার মৃত্যু হয়? দেহেরি কি এত মান?
গুণরাশি চিরোজ্জ্বল, চির রহে বর্ত্তমান।
রোপিব তাহারি বীজ লয়ে মোরা শত স্থলে,
রক্তবীজ বংশ সম বাড়িবে তা' দলে দলে!
নিমেষে একের স্থানে হইবে, সহস্র জন।
মৃত্যু কত অগ্রসর হইবে, করিতে রণ?

(৩)

লইতে এব্রত যদি মোরা সবে নাহি পারি,
কেন তবে বৃথা হায়, বর্ষণ এ অশ্রুবারি?
শোকের উপরে শোক আঘাত আঘাত পরি,
সহুক নীরবে তবে জননী জনম ভরি।
একটী একটী করে হৃদয়ের অস্থি তার
পড়িছে পড়ুক খ'সে, কিবা তায় ক্ষতি কার!
কতকাল জীর্ণ গৃহ প্রকোপেতে ঝটিকার
রহে বাঁচি, সংস্কার কভুনা হইলে তার?

শ্রীমতী মৃণালিনী।

সাধনা।

জয়মাতারা।

"পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবীত্বরবনি শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধাচ গৌরীচ পদ্মাচ বিজয়া জয়া॥
গুরুর্দৈবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুহি পরমং তপঃ।
গুরোঃ পরতং নাস্তিং নাস্তিং তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সাধনা" শব্দটী বিশেষ ক্রিয়া বা কার্য্য বোধক। চিৎস্বরূপ আত্মা ব্রহ্ম নিরবয়বতা প্রযুক্ত স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়,স্থির, ও গম্ভীর; কিন্তু প্রকৃতিসংজ্ঞক-মায়ামূলক অহংকার বশতঃ ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই মায়িক কার্য্য আছে।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽ শোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

(ভগবৎগীতা)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের দুঃখরাহিত্য-হেতু কামনাভাবে সাধনাভাব; কেবল জীবেরই সাধনা আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি অসীম, জীবের ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানশক্তি সসীম; অর্থাৎ ঈশ্বরে ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশ, এবং

জীবে উক্ত শক্তির অল্প বিকাশ আছে। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেণ তাহাই হয়, জীবের সমুদায় ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না। ঈশ্বর অসীম শক্তি, জীব অল্পশক্তি।

"ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি", কি তাহা অগ্রে বিচার্য্য। যাহার ক্রিয়ায় অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও জ্ঞানের উদয় হয়, এবং অন্তঃকরণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হয়, তাহাই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি, অর্থাৎ ইচ্ছা, ক্রিয়া (কার্য্য), ও জ্ঞান শক্তি-মূলক। শক্তির পূর্ণ বিকাশে সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বক্রিয়া, ও সর্ব্বজ্ঞতা; এবং অল্প বিকাশে অল্পেচ্ছা, অল্পক্রিয়া ও অল্পজ্ঞতা।

জীবের অন্তঃকরণে যে কার্য্যের ইচ্ছা হয়, সেই কার্য্য জীবের দেহ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। পাঞ্চভৌতিক জৈবদেহ স্বয়ং ক্রিয়াশীল নহে, ইহা অনায়াসবোধ্য; জৈবদেহ স্বয়ং-ক্রিয়াশীলশক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই কার্য্য তৎপর হয়। এক অদ্বিতীয় অসীম নিরবয়ব চিৎ বা চৈতন্য পদার্থই আত্মা। এই একই আত্মা বা শক্তি দেহাভিমানী ঈশ্বর, এবং পাঞ্চকৌষিক দেহাভিমানী জীব।

"অনঙ্গো সুপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ॥"

(ভগবতী গীতা)

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥
কোষোপাধিবিবক্ষায়াং ব্রহ্মৈব যাতি জীবতাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈব পুত্র পৌত্রৌ যথা প্রতি॥"

(পঞ্চদশী)

জীবের পাঞ্চকৌষিক দেহ কি তাহা দেখা যাউক। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি শরীর আছে; এই দুইটী শরীরের সমষ্টিই পাঞ্চকৌষিক দেহ নামে অভিহিত। স্থূল শরীর পাঞ্চভৌতিক; এবং লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রবেণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়,) পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান,

সমান), এবং মনঃ ও বুদ্ধি, * এই সপ্তদশের সমষ্টি। পঞ্চকোষ, যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, ও আনন্দময় কোষ। আত্মা এই পঞ্চকোষের অতীত নিত্য ও সৎ পদার্থ।

"পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষি বোধাব শেষতঃ।
স্বস্বরূপঃ স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্॥"

(পঞ্চদশী)

আত্মা নিত্য বা অবিনাশী, যেহেতু কেহই আত্মবিনাশ দর্শন করেন না। আত্মা আত্মবিনাশ দর্শন না করিলে, তাঁহার বিনাশ অসম্ভব; এবং অন্য বিনাশ দর্শন করিলেও স্বয়ং থাকিয়া বিনাশ দর্শন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার বিনাশই অসম্ভব।

"শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি নচ শাম্যতি।
স্থাবরে জঙ্গমে বোম্নৌ শৈলেহগ্নৌ পবনে স্থিতম্॥
কেবলং বাতসংরোধাৎ যদা স্পন্দঃ প্রশাম্যতি।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহঃ তদাস্য জড়নামকঃ॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

"আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে নির্লেপঃ নচ দুঃখভাক্॥
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেহপি নাপকারোস্য জায়তে।
যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ কাপি ন ক্ষতিঃ॥
আত্মাচেৎ মন্যতে হন্তা হ্যয়ং চেন্মন্যতে হতম্।
তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

(ভগবতী গীতা)

আত্মা অবিনাশী বলিয়াই নিরবয়ব, যেহেতু সাবয়ব পদার্থের বিনাশ অসম্ভব নহে; এবং নিরবয়বতা হেতু অপরিবর্ত্তনশীল বা নির্ব্বিকার, এজন্যই আত্মা সৎ পদার্থ।

---

* বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈ মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং লিঙ্গং তদুচ্যতে॥" (পঞ্চদশী)

অন্ন হইতে জাত এবং অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত বলিয়াই স্থূলশরীরকে অন্নময় কোষ বলা যায়। এই অন্নময় কোষের সহিত জীবের, জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পর, কোন সংশ্রব থাকে না, এজন্যই অন্নময় কোষ আত্মা নহে। মৃত্যুর পর স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তে আতিবাহিক দেহ উৎপন্ন হয়, পুনর্জ্জন্মে আতিবাহিক দেহের ধ্বংসে নূতন স্থূলদেহ জাত হয়।

"পিতৃ ভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽয়েনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥"

(পঞ্চদশী)

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুই প্রাণময় কোষ। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জড় পদার্থ, এবং ইহাদের চৈতন্য বা জ্ঞানাভাবে, প্রাণময়কোষ আত্মা হইতে পারে না।

"পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং য প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥"

(পঞ্চদশী)

মনঃই মনোময় কোষ। কামক্রোধাদি দ্বারা মনের বিকার জন্মে, এবং মনঃ পরিবর্ত্তনশীল, ও পরিবর্ত্তন হইতেই মনের বিনাশ অনুমেয় এজন্য মনঃ ও আত্মা নহে।

"অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥"

বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ। বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে লীন হয় এবং জাগ্রদবস্থায় সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, এজন্য বিজ্ঞানময় কোষকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না।

"লীনা সুপ্তৌ বপু র্বোধে ব্যাপ্নুয়া দানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্॥"

(পঞ্চদশী)

যে অন্তর্মুখা বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যভোগে আনন্দপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসানে লীন হয়, তাহাই ক্ষণভঙ্গুর আনন্দময়কোষ শব্দবাচ্য। আনন্দময় কোষও অনিত্য বলিয়া আত্মা নহে।

"কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্ব ভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে॥"

(পঞ্চদশী)

মায়াই জীবের কারণ শরীর। নির্ব্বাণ মুক্তিতে এবং মহাপ্রলয়ে মায়া ব্রহ্মে লীন হয় বলিয়া, কারণ শরীরও আত্মা নহে।

এক নিরুপাধি চিৎ বা চৈতন্য পদার্থই ত্রিবিধ ভাব বা অবস্থায় স্থিত; যথা,—মহেশ্বর, ঈশ্বর, ও জীব।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরঃশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ॥"

(ভগবৎ গীতা)

আত্মাই ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

"আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনো প্রগ্রহনেবচ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানহুঃ বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুঃ মনীষিণঃ॥"

(কঠোপনিষৎ)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রই বিষয় শব্দ বাচ্য, যেহেতু ইহারাই সুখ দুঃখের কারণীভূত।

"মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমা পায়িনোঽনিত্য স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥"

(ভগবৎ গীতা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

আনন্দ ভোজন।

মাতঙ্গিনী ডাকিলেন "ওগো আজ কি আর খেতে দেতে হবে না ; রাত্রি, যে দশটা বেজে গেল ; দাঁড়াও টান মেরে আমি বইখানা ফেলে দিই।" এই বলিয়াই গৃহিণী আমার হাত হইতে বই খানা কাড়িয়া লইলেন।

আমি বলিলাম বই যেন কাড়িয়া লইলে আমিত খেতে যাব না।

গৃহি। হড় হড় করে টেনে নিয়ে যাব।

আমি। তা যেন নিয়ে গেলে আমি যদি না খাই ?

গৃহিনী। জোর করে মুখে ভাত গুঁজে দিব।

আমি। তাও যেন দিলে আমি যদি ভাত গলাধঃকরণ না করি ?

গৃহিনী। তা হ'লে আর আমার ক্ষমতা নাই।

আমি। ক্ষমতা যদি নাই তবে বই খানি আস্তে আস্তে ফেরৎ দাও। আর আধঘণ্টা পড়া হইলেই বই খানি শেষ হয় , তার পরই খেতে যাচ্চি। বই খানি বড় ভাল বই গো। আমি আস্তে আস্তে গৃহিণীর হাত হইতে বই খানি লইলাম। বই খানি "Annie Besant's Ancient Wisdom."

গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহাতে কি মাথা মুণ্ডু আছে।

আমি। মহাপুরুষেরা যে জ্ঞান দান করিয়া জীবকে শিবের সহিত যোগ করেন সেই শাম্ভবীবিদ্যার * কথা উহাতে আছে।

গৃহিনী। ওগো ও সব বিদ্যা বই পড়ে হয় না ; চিদানন্দ বাবা আমাকে ঐ কথা এক দিন বলিয়াছিলেন। গুরু যাহাকে ঐ বিদ্যা দেন তিনিই উহা পান।

* শাম্ভবী বিদ্যা অর্থাৎ শিব সম্বন্ধিনী বিদ্যা। শিবঃ শব্দই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে 'থিবঃ' "Theos" "Zeus" হইয়াছে। Theo sophy কথাটির অর্থ শিব সম্বন্ধিনী বিদ্যা সেই জন্য শাম্ভবী বিদ্যা কথাটিই Theosophy কথার ঠিক অনুবাদ।

অনন্তরাম।

গৃহিনীর চিদানন্দ বাবা কে তাহা বোধহয় পাঠকগণ বুঝিয়াছেন। আমাদের স্বামীজি প্রায়ই শবাসনে থাকেন। চিৎ হইয়া স্থির হইয়া থাকার নাম শবাসন। স্বামীজি এইরূপ চিৎ হইয়া থাকেন বলিয়া গৃহিনী এক দিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার নাম দেন "চিদানন্দ বাবা," স্বামীজি ও সেই অবধি নিজেকে চিদানন্দ বলিয়া থাকেন। গৃহিণীর কথার উত্তরে বলিলাম "চিদানন্দ বাবা যাহা বলিয়াছেন সেত ঠিকই কথা। এ সব বিদ্যা গুরুগম্য বিদ্যা। গুরুকে শ্রদ্ধা নমস্কার ও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মনের ভাব সকল শিষ্যের মনে আপনা আপনি উদয় হয়। স্বামীজি আমাদের গুরু ; তিনি এই বই খানি যত্নের সহিত পড়িতে বলিয়াছেন তাইত এত আগ্রহ করিয়া বই খানি পড়িতেছি।"

গৃহিণী। আচ্ছা তুমি শীঘ্র করে বই পড়া শেষ কর আমি তোমার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি।

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার চেয়ারের পার্শ্বে গৃহিণী উপবেশন করিলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম। গৃহিণী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন 'না বাপু কথা না কহিয়া কি থাকা যায়'।

আমি। বেশত, আমাকে যত বকাবে ওদিকে খেতে তত রাত্রি হবে।

গৃহিণী। তবে আমিও লেখা পড়া করি। এই বলিয়া এক খানা কাগজ পেন্‌সিল লইয়া বসিলেন।

আধ ঘণ্টা আন্দাজ মধ্যে আমার বই পড়া শেষ হ'ল তখন দেখি মাতু কাগজ পেন্‌সিল লইয়া কি সব লিখিয়াছে। আমি ঐ লেখা দেখতে গেলাম ; তিনি দেখিতে দিলেন না। আমি জোর করিয়া কাগজ কাড়িয়া লইলাম। উহাতে নিম্নলিখিত কথা গুলি লেখা রহিয়াছে !

ভাত গুলি জুড়িয়ে গেল।

গেল গেলই।

যার জন্য রান্না সেই যদি খেতে গেল না ত আমার কি ?

তবু আমার একটা কি আছে ? জুড়ান ভাত গুলা আজ খেতেই পারবেন না তিনি খেয়ে নিলেই আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হত।

তিনি আমি তিনি আমি তিনি আমি।
সো হং সো হং সো হং।
শিব দুর্গা শিব দুর্গা শিব দুর্গা।
আচ্ছা মা কালী কোন বাড়ীর গৃহিণী।
কাল কর্ত্তা কালী গৃহিণী।
বিশ্ব সংসার তাঁদের বাড়ী।
কালী ভগবতী কাল ভগবান্।
মা কালীর রান্না ঘর কোনটা?
মা কালী তাঁহার কর্ত্তার জন্য অবশ্য কত কি রাঁধেন।
ভগবতী যতক্ষণ রান্না করেন ভগবান ততক্ষণ কি করেন?
ভগবান ততক্ষণ পড়া শুনা করেন।
আচ্ছা মা কালী কি রাধেন?
মানুষে ভাত ডাল সিদ্ধ করে।
ভগবতী মানুষ সিদ্ধ করেন।
তবে বুঝি সিদ্ধ পুরুষরা ভগবানের খাদ্য।
পৃথিবীটা বুঝি ভগবতীর রান্না ঘর।
ধাবা গো বাবা ভগবান, সিদ্ধ পুরুষদিগকে খেয়ে ফেলেন।
এ কেমন কথা হলো?
কথাটা ঠিকই হইয়াছে।
সিদ্ধ পুরুষরা ভগবানের পদে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন!
ভগবান সেই প্রাণ ভোজন করেন।
এই যেমন আমরা পাকা আমটি খাই আঁটিটি থাকে।
ভগবানও সিদ্ধ পুরুষের রসটুকু খান কিন্তু আঁটিটি থাকে সেই আঁটি থেকে আবার নূতন যুগে মানুষের গাছ হয়।
আমার প্রাণটাও একজনের পায়ে ঢেলে দিতে কেবল ইচ্ছা করে।
স্বামী আমার ভগবান।
মা কালী আমাকে সিদ্ধ করবেন। ভালবাসাটা আশুগ প্রাণেশ্বরের পদে প্রাণ বিসর্জ্জন বড় আনন্দ।
মা কালীকে যেন বুকের মাঝে দেখচি।

একটী যেন নীল দীপ শিখা।
কেমন একটী সুন্দর রূপ হল।
সূর্য্যের মধ্যে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণরূপ।
রূপ যেন প্রেমে মাখা।
মা বলেছেন কি চাস?
স্বামী পদে প্রাণ বিসর্জ্জন।
শব্দ হলো ওঁ।
আমি জপ করি।
নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়।

মাতঙ্গিনীর লেখাটি পড়িলাম তাহার মুখের দিকে সজল নয়নে একবার চাহিলাম তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন তুমি কেন আমার লেখা পড়িলে আমার ভারি রাগ হইয়াছে; আমি উঠিয়া যাই। এই বলিয়া তিনি উঠিলেন; অভিমানিনীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম "চল খাই গে।"

আজি ভোজনে বড় আনন্দ।

অনন্তরাম।

আমাদের পন্থা ঘরে ঘরে এই আনন্দ ভোজন দেখিতে চায় গুরুদেব, মহাদেব পন্থার এই কামনা পূর্ণ কর।

সম্পাদক।

যতিপঞ্চকম্।

(শঙ্করাচার্য-কৃতম্]

(১)

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
বিশোকমন্তঃকরণে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

বেদান্তের বাক্যে যার সদাই উল্লাস,
ভিক্ষান্ন খাইয়া যেই তুষ্ট বারমাস,
শান্তিসুখে মন যার সদা নিমগন,
পরিধান করে যেই কৌপীন বসন,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয়!

(২)

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ
শ্রিয়ঞ্চ কথামিব কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

বাসহেতু বৃক্ষমূলে যে করে আশ্রয়,
ভোগ্যদ্রব্যে রত নয় যার করদ্বয়,
ধনে অভিমানে সদা যেই ঘৃণা করে,

কেবল কৌপীন খানি সদা যেই পরে,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয়!

(৩)

দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মান্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

জড়তা ছাড়িয়া যার চৈতন্যে গমন,
নিজাত্মায় পরমাত্মা যে করে দর্শন,
নাহি অন্ত নাহি মধ্য নাহি বাহ্যজ্ঞান
কৌপীন বসন খানি যার পরিধান,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেইজন জানিও নিশ্চয়!

(৪)

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ত ॥

অতুল আনন্দ যার সদা রয় মনে,
শান্তি সুখ পায় যেই ইন্দ্রিয় দমনে,
ব্রহ্ম সুখে দিবানিশি সদা যার রতি,
কৌপীন পরিতে যার সদা চায় মতি,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয়॥

(৫)

একাক্ষরং * পাবনমীবয়ন্তঃ
শিবং শরণ্যং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

পবিত্র একটী বর্ণ সদা যার মুখে,
হৃদি রাখি সদাশিব থাকে যেই সুখে,
ভিক্ষা করি শেষ দিন কেটে যার যার,
পরিতে কৌপীন খানি সদা যেই চায়,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

বিলাতী সন্ন্যাসী।

(৮ম সংখ্যার ২৪৩ পৃষ্ঠারপর)

আমরা কথা প্রসঙ্গেঅনেক কথা কহিয়া ফেলিয়াছি। বিলাতী সন্ন্যাসীর কথা পুনরায় আরম্ভ করা যাউক। তিনি কহিলেন "সেই বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী যোগী পুরুষ বলিতে লাগিলেন জন্মান্তরিণ কর্ম্মফলে তোমাকে এই

* "একাক্ষরং" ওঁ। "পঞ্চাক্ষরং" এইরূপ পাঠ যে স্থলে থাকিবে, তথায় "নম শিবায়" অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। তবে কর্ম্ম বিশেষের দোষে তুমি ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিয়াছ; সেই কর্ম্মক্ষয় জন্য তীর্থ পর্য্যটন আবশ্যক। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া, ভবিষ্যত আচরণ সম্বন্ধীয় কতক গুলি নীতি গর্ভ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাকে বিদায় হইতে কহিলেন।

আমি কহিলাম—"এক্ষণে আমার মনের অবস্থা কিরূপ তাহা আমি নিজে বুঝিতে পারিতেছি না সুতরাং কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব। স্থির করিতে পারি নাই মনস্থ স্থির হইলে একটা মিমাংসা করিব। কিন্তু এ স্থান হইতে আমার বাসস্থান অনেক দূর;—বনমধ্যে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া আসিয়াছি পথ অপরিজ্ঞাত—কিরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইব?"

তিনি "তোমার ঘড়ির সহিত কোম্পাস আছে,—অশ্বারোহণ করিয়া ঠিক্ উত্তর মুখে যাও দণ্ডেক কাল মধ্যে তোমার বাংলায় উপনীত হইবে।"

আমি। "একদণ্ড কাল ইংরাজি অর্দ্ধ ঘণ্টার ও অল্প; অত অল্প সময় মধ্যে বাংলায় যাইতে পারিব?"

"নাহয় ঠিক দক্ষিণ মুখে ফিরিয়া আসিবে। অনর্থক প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক নাই।" তিনি যেরূপ গম্ভীর স্বরে এই কথা কহিলেন তাহাতে আমার দ্বিরুক্তি করিতে সাহস বা ইচ্ছাও হইল না। আমি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কোম্পাস দ্বারা উত্তরদিক স্থির করিয়া লইয়া ঘড়ি দেখিয়া যাত্রা করিলাম এবং অনতিবিলম্বে বাংলার হাতার মধ্যে উপস্থিত! ঘড়ি খুলিয়া, আসিতে আমার চব্বিশ মিনিট লাগিয়াছে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম। সে দিবস বৈকালে সমভিব্যাহারীদিগের সংবাদ লইলাম—তাঁহারা প্রত্যাবৃত হইয়াছেন, কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না।

পর দিবস প্রত্যুষে অশ্বারোহণে ঠিক দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম—অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে একটী ক্ষুদ্রকায়া গিরিতরঙ্গিণী আমার পথরোধ করিল। সে স্থলে জীবনে কখনও পদার্পন করিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মনে বড়ো ভয় হইল—সকলই মহাপুরুষের খেলা ভাবিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সমস্ত দিন গভীর চিন্তার পর তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিব সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা গেলাম। পরদিবস তখনকার ইচ্ছা-

মত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া, কয়েকটীমাত্র টাকা লইয়া তীর্থ যাত্রায় নির্গত হইলাম। এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিয়া ৺চন্দ্রনাথ গমণ করিতেছি। পুনরায় তাঁহার সহিত কবে দেখা হইবে বলিতে পারি না,—তবে দেখা নিশ্চয়ই হইবে।"—

সম্প্রতি আমার এক বন্ধুর নিকট একটী গল্প শুনিলাম তাহা এই প্রবন্ধের প্রতি পোষক এজন্য এ স্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশের কোন গ্রাম নিবাসী কান্তিবাবু নামক একব্যক্তি পশ্চিমে গবর্ণমেণ্টের আফিসে চাকুরী করিতেন। তাঁহার সরলতার জন্য সাহেবরাও সময়ে সময়ে তাঁহাকে পাগল (Madman) বলিতেন। তিনি সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদিগের সেবা সুশ্রুষা করিতেন। কখন কখন তাঁহার মনে একটু একটু বৈরাগ্যের ভাবও উদয় হইত। কি কারণে বলিতে পারিনা তাঁহার মন একদা ঔদাস্য ভাব ধারণ করিল; আফিসে ছুটির পর তিনি বাসায় না আসিয়া সঙ্গে যে দুইটী মাত্র টাকা ছিল তদ্বারা টিকিট কিনিয়া রেল গাড়িতে কিয়ৎদূর গমন করিলেন। আহারীয় সংগ্রহ বা কিছুদূর গমন করিবার জন্য হাতে আর এক কপর্দ্দকও ছিল না দৈবাত্তর সেই ষ্টেশনে পাঞ্জাবের কোন এক রাজা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হওয়ায় এবং উত্তরাখণ্ডের কোন যোগীর আশ্রয় গ্রহণাভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাজা, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বহুদূর লইয়া গেলেন ও একটী পথ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—এই পথে গমন করিলে আপনি মহাপুরুষ দিগের আশ্রম সমীপে যাইতে পারিবেন। যদি প্রতিনিবৃত্ত হয়েন ও পাথেয় আবশ্যক হয় তবে আমার এই লোকের নিকট প্রয়োজনমত অর্থ পাইবেন, এই বলিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিয়া দিলেন।

কান্তিবাবু রাজার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া উত্তরাভিমুখে গমনান্তর এক সাধুর নির্দ্দেশানুসারে হিমাদ্রি পার্শ্ববর্ত্তী এক নিম্ন শৃঙ্গে উপনীত হইলেন। সে স্থানে একজন গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছেন—দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ নাই। ক্ষুন্নিবারণার্থ তিনি একটা লতা দেখাইয়া দিয়া তাহার মূল আনিতে বলিলে, কান্তিবাবু তাহা হইতে এক

সেখান দগ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কান্তিবাবু তাহা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলেন ও সন্ন্যাসিপ্রদর্শিত নির্ঝর হইতে জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী কিছু আহার করিলেন না। তিনি বলেন যে, তিনি যে কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি তাঁহাকে কিছু আহার করিতে দেখেন নাই। কান্তিবাবু আরও বলিয়াছেন যে ঐ মূলদগ্ধ আমাদিগের মোহনভোগ তুল্য সুমিষ্ট।

অতঃপর সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে কহিলেন। কান্তিবাবু তাহাতে সম্মত না হইয়া, আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি নানারূপে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আপনাকে অতি নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেন। যখন দেখিলেন তাহাতেও তিনি স্বীয় অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন না তখন তিনি বলিলেন, "আমি স্কটল্যাণ্ড নিবাসী খৃষ্টান।" আমরা বহরম পুরের বাঁধা ঘাটে যে স্কটলণ্ড নিবাসী সন্ন্যাসীর বিষয় কহিয়াছিলাম তিনিও আপনার পরিচয় অবিকল সেইরূপই দিলেন। কান্তিবাবু তাহাতেও যখন নিরস্ত হইলেন না তখন তিনি কহিলেন "আপনি যখন আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন আমার আদেশ আপনার অবশ্য পালনীয়। আমি আপনাকে অনুমতি করিতেছি আপনি ফিরিয়া যাউন। ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে বুঝিলেই এখানে আসিবেন। তখন আপনাকে উপদেশ দিতে আর আমার কোন বাধা থাকিবেনা। এই বলিয়া তিনি কতকগুলি কর্ত্তব্য উপদেশ করিলেন।"

কান্তি বাবু কহিলেন—"আমি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকরিয়া থাকি উপরস্থ কর্ম্মচারিকে না বলিয়া অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছি। আমার চাকুরী নিশ্চয় গিয়াছে চাকুরি না করিলে কিরূপে সংসার চালাইব? আমি না গেলে পরিবারবর্গের যাহা হয় হইবে।"

সন্ন্যাসী "আপনার চাকুরী যায় নাই। আপনি গমন মাত্র চাকুরী পাইবেন আমি আদেশ করিতেছি চলিয়া যাউন।"

কান্তিবাবু অগত্যা ফিরিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে পূর্ব্বোল্লিখিত রাজ কর্ম্মচারীর নিকট পাথেয় লইয়া কর্ম্মস্থলে না গিয়া তাঁহাদের হেড অফিসে

গমন করিলেন। তথাকার বড় সাহেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন—"কান্তি পাগলা এতদিন কোথা ছিলে, তোমার চাকুরী গিয়াছে, এক্ষণে কি করিবে!"

কান্তি। "আমার চাকুরী গেলে ছেলে পিলে খাইবে কি?"

সাহেব। "সে জ্ঞান থাকিলে কি তুমি অবসর না লইয়া না বলিয়া চলিয়া যাও?"

কান্তি! "আমার চাকুরীতে আবশ্যক নাই। আমি সপরিবারে আপনার কুঠিতে আসিয়া থাকি,—আপনি চারিটি করিয়া খাইতে দিবেন।"

সাহেব। "তোমার পাগলামী গেল না, যাহা হউক আমি পত্র দিতেছি, লইয়া যাও দেখিও এরূপ কার্য্য আর কদাচ করিও না।"

আমার পেন্‌সনত আর হইবেনা—এইখানেই পড়িয়া থাকি।

"যা যা আর পাগলামি করিস্‌নে—তোর পেন্‌সেনের যাহা হয় একটা করিব।" এই বলিয়া সাহেব তাহাকে একখানি পত্র দিয়া বিদায় দিলেন।

কান্তি বাবু এক্ষণে পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ী বসিয়া আছেন। কেহ গুরু সমীপে গমনের কথা কহিলে বলেন "সময় হইলেই গুরুদেব ডাকিয়া লইবেন। তাঁর সংসারে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে যায় নাই সেই জন্যই বিলম্ব।"

আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার সহিত কান্তি বাবুর বর্ণিত ঘটনায় যেরূপ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহাতে বোধহয় আমরা বহরমপুরের বাধান ঘাটে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম তিনি ও পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ সন্ন্যাসী একই ব্যক্তি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।*

(প্রশ্নোত্তর)

প্রথম অধ্যায়।

প্রশ্ন। 'হিন্দু' কাহাকে বলে?

উত্তর। যিনি, বেদ, স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাহাদিগকেই ধর্ম্ম ও আচারের ভিত্তি বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং ব্রহ্মের অস্তিত্ব কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস করেন তিনিই হিন্দু।

প্র। বেদ কি?

উ। মানব অপেক্ষা কোনও উচ্চতর যোনির পুরুষকর্ত্তৃক মানব জাতির নিকট যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাহাকে বেদ বলে। ইহা কোনও এক বিশেষ জাতি বা দেশমধ্যে আবদ্ধ নহে। হিন্দুদিগের বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামক চারি গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে।

প্র। ব্রহ্মের লক্ষণ কি?

উ। যতোবিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন সর্ব্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ ব্রহ্মলক্ষণৈঃ॥

যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয় যাঁহাতে বিশ্ব অবস্থিতি করে। এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্মের নিম্ন লিখিত লক্ষণ শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেনঃ—

---

* গুপ্তবিদ্যালোচনী সভার ভারতবর্ষীয় কেন্দ্রস্থান পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধাম হইতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর নামক মাসিক পত্র হইতে সংগৃহীত। সং পং।

স এক এ। সদ্রূপঃ সত্তোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষ নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতঃ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাংমনসোগোচরঃ।
সবেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন॥
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বর।
লোকেষু সৃষ্টিকারণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥
বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া॥
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ।
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে।
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রা কদাচন॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্।
বেদান্তবেদ্য ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ॥
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
তরোর্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি ভদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥

যথাগচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপি সরিৎপতিম।
তথার্চ্চ্যাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি॥

"তিনি একমাত্র,সত্তামাত্র, স্বপ্রকাশ,সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সদাপূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ, নির্ব্বিকার, নিরাধার নির্ব্বিশেষ,নিরাকুল গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা, সকলের দ্রষ্টা, ও বিভু। তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, ও সনাতন। তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত হইয়াও জীবমাত্রের সকল ইন্দ্রিয় ও তাহার গুণের প্রকাশক। তিনি লোকাতীত অথচ সকল লোকের কারণ, এবং বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি বিশ্বকে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। চরাচর সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীন, এই যে জগৎ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; ইহাও তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে।

সর্ব্বভূতের কারণ সেই পরমেশ্বর একমাত্র। হে দেবি তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, এবং আমি সংহার করি। ইন্দ্রাদি সকল লোকপাল তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতি এবং ভুবনত্রয়ে পূজ্যা।

তিনি অন্তর্যামী তাঁহা কর্ত্তৃক নিজ নিজ অধিকারে নিযুক্ত হইয়া দেবগণ কার্য্য করেন। তাঁহারা কেহই স্বাধীন নহেন।

তাঁহার ভয়ে বায়ু বহে, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, মেঘ কালে বর্ষণ করে, বনে বৃক্ষগণ পুষ্প প্রসব করে। তিনি প্রলয় কালে কালকেও বিনাশ করেন। তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু স্বরূপ এবং ভয়েরও ভয়স্বরূপ।

তিনিই বেদান্তবেদ্য ভগবান; যৎতৎ এই শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই বুঝায়। হে দেবগণ পূজিতে! সকল দেব দেবী সেই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জগৎ সেই ব্রহ্মময়।

তিনি তুষ্ট হইলে সকল জগৎ তুষ্ট হয়; তিনি প্রীত হইলে জগৎপ্রীত হয়। হে দেবি তাঁহার আরাধনা দ্বারা সকল দেবতাই প্রীত হন।

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখাপল্লবাদির তৃপ্তি হয় সেইরূপ তাঁহার আরাধনা দ্বারা সকল দেবতার তৃপ্তি হয়। পার্ব্বতি, নদী

যেমন অবশ্যই সমুদ্রে যায় সেইরূপ অন্য দেবতার পূজাও তাঁহারই উদ্দেশে হয়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

পৌরাণিক কথা।

বিশ্ব রাজ্যের বিচিত্র গতি। যাহা আজ অত্যন্ত উপাদেয়, যাহা আজ সকলের আদরের ধন, কাল্ তাহাই সকলের হেয় ও নিন্দার আস্পদ হয়। যে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রিয়তম পুত্র, আজ সকল শাস্ত্রকার একবাক্য হইয়া সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। যে তেজস্বিতা ও দুর্দ্দমতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়-কুল প্রবর জগতের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন, ব্রহ্মনিষ্ঠা ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের তাহাই শান্তিরোধক হইয়া ধর্ম্মচ্যুতির কারণ হয়। আজ যাহা ধর্ম্ম, কাল তাহা অধর্ম্ম। যাহা আমার পক্ষে ভাল, তাহা অন্যের পক্ষে মন্দ। যাহা এক স্থলে হিত, তাহা অন্য স্থলে অহিত।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ লইয়াই জগতের কার্য্য সাধিত হয়। জীবের উৎকর্ষ সাধন জন্য সত্ত্ব গুণের প্রয়োজন হয়। প্রলয় নিদ্রোত্থিত জড় প্রায় জীবগণকে প্রবৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মপরায়ণ করিতে রজো গুণের প্রয়োজন হয়। এবং সাধন বলে কল্পের শেষ উৎকর্ষে আরূঢ় জীবগণকে প্রলয় নিদ্রার শান্তি-ময় অঙ্কে শায়িত করিতে তমোগুণের প্রয়োজন হয়।

কাল অনুসারে প্রতিগুণের সেবাই ধর্ম্ম। অনুকূল কালে যাহা ধর্ম্ম, প্রতি-কূল কালে তাহাই অধর্ম্ম। আবার কোন জীব প্রবৃত্তি, প্রবলকালে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বভাববশতঃ নিবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়। তাহারা প্রাক্তন উৎকর্ষ বলে ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করে। এবং কেহ কর্ম্মবশে নিবৃত্তি প্রবল কালেও প্রবৃত্তির নিম্নসীমায় অবস্থিত হয় জীবের স্বভাব অনুসারে ধর্ম্ম বিভিন্ন। কালের জোয়ার ভাটাতে স্বতন্ত্র জীব সকল আপন স্বভাবের প্রবলবেগে চালিত হইয়া নানা দিকে সন্তরণ করিতেছে। কালের বিচিত্র গতি। জীবের বিচিত্র ধর্ম্ম। তাই জগতের চির বিচিত্রতা।

বিষ্ণুরূপী নারায়ণ সত্ত্বের আস্পদ হইয়া স্বয়ং প্রজাপালন করেন। তিনি কাল ধর্ম্ম অনুসারে যাহা রক্ষার উপযোগী তাহাই রক্ষা করেন। কিন্তু কোন সময়ে তমোগুণের এবং কোন সময়ে রজোগুণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেই সময়ে এই দুই গুণের তারতম্য ভেদে যাহা ভাল, তিনি তাহাই রক্ষা করেন। তিনিই কাল অনুসারে ভেদমূলক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। আবার যখন নিবৃত্তি ধর্ম্মের কাল আসে, তখন তিনি ভেদমূলক ধর্ম্মের নাশ করেন। তখন সে ধর্ম্ম আসুরিক ধর্ম্ম হয়। প্রলয়গত নিদ্রায় তিনি আপামর সকল জীবকে আপন বক্ষে স্থান দিয়া শান্তির পবিত্র মধুরতা প্রদান করেন। আবার চেষ্টার কাল আগত হইলে, পরমকারুণিক পরম পিতা প্রলয়শেষগত নিশ্চেষ্টতার নাশ করেন। রজোগুণ ও তমোগুণ সত্ত্বের দ্বার স্বরূপ। এই দুই গুণ আশ্রয় করিয়াই জীব সাধনক্ষম হইয়া সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে পারে। ভগবান্ স্বয়ং সত্ত্বগুণের আস্পদ হইয়া সত্ত্বগুণজনিত জীবের উৎকর্ষ সাধন করেন। অন্য দুই গুণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার দ্বারপালগণ ভেদমূলক ধর্ম্মের রক্ষা করেন।

জয় ও বিজয় বিষ্ণুর দ্বারপাল। তাঁহারা বিষ্ণুর স্বরূপ ধারণ করিলেও বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। তাঁহাদিগের শীল ও স্বভাব "ভগবৎ প্রতিকূল।" সনকাদি কুমারগণ শ্রীহরির দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন। দ্বারপালগণ বেত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে শ্রীহরির কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান নগ্নকায় কুমারদিগকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সৃষ্টিগত ভেদের কাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি হয়।

প্রিয় সুহৃৎ শ্রীহরির দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, কুমারগণ ক্ষুভিত চিত্তে দ্বার পালদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে উচ্চই বা কে? এবং নিচই বা কে? ভগবানের এই বৈকুণ্ঠে সকলেরই সমদর্শন। তবে তোমাদের এ বিষম দৃষ্টি কেন? যখন তোমাদের এই ভেদ দৃষ্টি তখন তোমরা সেই লোক আশ্রয় কর, যেখানে কাম, ক্রোধ লোভ প্রবল।" বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মীর সহিত সত্বর ঐ স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তিনি এই শাপের অনুমোদন করিলেন এবং পার্ষদদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমারা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আবার আমার নিকট সত্বর প্রত্যাগমন করিবে।"

জয় ও বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। আবার তাহারাই রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শেষ জন্মে তাহারাই শিশুপাল ও দন্তবক্র।

প্রলয়রাত্রি বিগত হইলে, সৃষ্টির প্রবাহ চলিল বটে কিন্তু তখন ও তমোগুণের অত্যন্ত প্রভাব। তমোগুণ বলে তখনও তত্ত্ব সকল একমাত্র কেন্দ্রগামী শক্তির বশীভূত। কেন্দ্রত্যাগী শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তখন ও ভূলোক রচনা করিতে শিখে নাই। তখনও একাকার। চারিদিকে তত্ত্ব রূপ কারণ সৃষ্টির জন্ম। পৃথিবী গোলকের আকার ধরিয়া তখনও একাকার (Nebulcus homogencety) ইহাতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। পৃথিবী প্রকাশিত না হইলে, জীব সৃষ্টীর স্থান হইতে পারে না এবং ভোগস্থান না থাকিলে জীবেরও সৃষ্টি হইতে পারে না তাই স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাকে বলিলেন।

আদেশেহহং ভগবতো বর্ত্তেয়াসীব সূদন।
স্থানন্তিবহানুজানাহি প্রজানাং যমচ প্রভো॥
যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্॥ ভাঃ পুঃ ৩ ১৩

ভগবান ব্রহ্মা একবার প্রলয় জল পান করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় দেখিলেন যে জল মধ্যে পৃথিবী নিমগ্না। ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না সৃষ্টির প্রত্যুষে তমোগুণের প্রাবল্য তিনি রোধ করিতে পরিলেন না। সে কালে রজো গুণের এত দুর্ব্বল শক্তি, যে পদার্থ সকল সহজে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তাই অসাধারণ জড়তা (Incertia) বলে, পদার্থ সকল যথাবস্থ হইয়া থাকে।

হিরণ্যাক্ষ সৃষ্টির প্রথম অবস্থার জাড্য। বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু এই জাড্যের নাশ করিয়াছিলেন। অনুযায়ী জীবের কার্য্যক্ষেত্র অবতরণই তখন তাহার উৎকর্ষ, তাহার স্থিতি। এই জন্য বরাহদেব বিষ্ণুর অবতার। গতি দুই প্রকার উর্দ্ধ এবং অধো, সত্বগুণের দ্বারা উর্দ্ধ গতি, এবং তমোগুণ দ্বারা অধোগতি হয়। তামোনাস করিবার জন্য সত্ব গুণেরই প্রয়োজন হয়। তাই ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে উর্দ্ধগামী, কেন্দ্রত্যাগী (centrifugal) শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারই বলে ভূগোলকের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভূগোলক আবির্ভূত হইলে, রজোগুণের প্রবলতা হয় এবং সৃষ্টির প্রবাহ নানা দিকে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তিই সৃষ্টির মূল। বিষয় বাসনা প্রবৃত্তির অঙ্গ। এই কালে ব্রহ্মাই এক মাত্র উপাস্য। কামের উপসনাই প্রধান ধর্ম্ম। যাহার যাহা অভিলাষ, তাহাই চরিতার্থ করিবার জন্য সকলে কর্ম্মপরায়ণ হইল। সকলের স্বতন্ত্রতা হইল। ভেদ সকল বিবিধ ও দৃঢ়মূল হইল। এই সকল ভেদে, ধর্ম্ম বিভিন্ন সকাম ও স্বার্থপর হইল। জীব আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গেল। উপাধির প্রবল অভিমানে অভিমানী হইয়া, সেই উপাধিকেই আমি বলিয়া মনে করিল। দম্ভ, মান, অহঙ্কারে পৃথিবী পূর্ণ হইল। ভেদমূলক আসুরী ভাবই হিরণ্যকশিপু স্বরূপ। সত্বগুণ দ্বারা ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয় এইজন্য সত্বগুণের অধিনায়ক ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর শত্রু। ব্রহ্মা আপনার সাধ্য মত হিরণ্যকশিপুকে অমর করিয়াছিলেন। তাহার সৃষ্ট জীব দ্বারা হিরণ্যকশিপুর কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না। প্রবৃত্তি প্রবল কালে এই অসুর তিনলোক জয় করিয়াছিল। সে লোকপালদিগের তেজ ও স্থান হরণ করিয়াছিল। দেবলোকে দেবগণ তাহার পাদবন্দন করিতেন। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ ও গৃহাস্থাদি সমুদায় আশ্রমী ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া তাহারই যজ্ঞ করিতে লাগিল। ভোগের পদার্থ সকল প্রচুর হইল।

অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী।
তথা কামদুঘা গাবো নানাশ্চর্য্য পদং নভঃ॥
রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাং স্তৎ পত্ন্যশ্চোহুরূর্ম্মিভিঃ।
ক্ষার সীধু ঘৃত ক্ষৌদ্র দধিক্ষীরামৃতোদকাঃ॥
শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্ব্বর্ত্তুধু গুণান্ দ্রুমাঃ।
দধার লোকপালানামেকা এব পৃথক্ গুণান্॥ ৭-৪।

সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিনাকর্ষণে কামদুঘা গাভীর ন্যায় বিবিধ শস্য প্রসব করিতে লাগিল। এবং নভোমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ হইল।' লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অমৃত জলযুক্ত রত্নাকরসকল এবং তাহাদের পত্নী নদী সমুহ তরঙ্গ দ্বারা রাশি রাশি রত্ন বাহিয়া আনিতে লাগিল। গিরি সকল হিরণ্য কশিপুর ক্রীড়াস্থল হইল। তরুগণ সকল ঋতুতেই সমভাবে ফল পুষ্পান্বিত হইল। অসুররাজ একাকীই সকল লোকপালের পৃথক পৃথক্ গুণ ধারণ করিল।

ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি হইলেই আনন্দ হয়। আনন্দের একমাত্র মূল ভগবান্। এবং ভগবানেই সকল আনন্দ পর্য্যবসিত হয়। ভগবান্ অল্প অল্প বিষয় দিয়া আনন্দের আভাস দেখান্। সামান্য বিষয় পাইয়াই, তুচ্ছ ভোগ লাভ করিয়াই, অজ্ঞান জীব মনে করে যে সে কত কি লাভ করিল। তাহার আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু যদি সে নশ্বর বিষয়ানন্দে ভুলিয়া থাকে তাহা হইলে আর ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে না, তাহা হইলে জগৎ মধ্যে ভেদ অন্তর্হিত হয় না, তাহা হইলে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদই প্রকৃষ্ট আহ্লাদ, কারণ ইঁহার আহ্লাদ কেবল ভগবান্‌কে লইয়া। কিন্তু সেই আহ্লাদ স্থাপিত করিবার জন্য ভগবান্‌কে নৃসিংহ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর বধ করিতে হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষ স্থানীয় তামসিক নিদ্রাশীল কুম্ভকর্ণ এবং হিরণ্যকশিপু স্থানীয় রাবণকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। যখন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন্, তখন তমোগুণের বড় প্রভাব ছিল না। তাই দন্তবক্রের কথা বড় শুনা যায় না। রাজসিক শিশুপালকে ভগবান্ বধ করেন।

পৃথিবী উদ্ধারের প্রসঙ্গে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এই দুই জনেরই কথা লিখিত হইল। কিন্তু আমরা যে কালের বর্ণনা করিতেছি, তাহাতে কেবল হিরণ্যাক্ষ বধের কথা লিখিলেই চলিত।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

চিন্তাকণিকা।

(১)

জীবকল্যানদায়িনী পরমারাধ্যা গুপ্তবিদ্যার মন্দিরের দ্বার সতর্ক প্রহরী দ্বারা সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষিত। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মায়েয় অপরূপ রূপ দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার বাসনা থাকিলে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পথে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়া বহুতর বিঘ্নকারীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া তবে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে, পারা যায়। কেবল মাত্র কৌতূহল নিবারণ জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে কেহই উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। নিজের সমস্ত সম্পত্তি শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক যাহা কিছু তুমি নিজের বলিয়া মনে কর তাহা সমস্তই যদি পরহিতব্রতে—সাধারণের সেবায় উৎসর্গ না করিতে পার তাহা হইলে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। যখন যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে তখনই উহা কিসের জন্য করিতেছ ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যদি কেবল মাত্র স্বার্থের জন্য—নিজের সাংসারিক ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য ঐ কার্য্য করিতেছ বুঝিতে পার তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। যে কোন কার্য্য করিবে নিজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাতে সাধারণের হিত সাধন হইবে কিনা তাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে। যদি প্রকৃত পক্ষে সাধারণের হিতসাধন না করিতে পার তবে (অভাব পক্ষে) যাহাতে তোমার কার্য্যের দ্বারা কাহারও উদ্বেগ ও অহিত না হয় প্রথমতঃ তাহাই লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিবে। বাস্তবিক তোমার বাক্য, কর্ম্ম, এমন কি চিন্তাদ্বারায় কাহারও কোন অনিষ্ট না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে অভ্যাস করিলেই দেবী গুপ্তবিদ্যার মন্দিরের পথের জটিলভাব অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ যাহা হইতে ইহসংসারে কেহই উদ্বিগ্ন হয় না এবং নিজেও যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি হর্ষ, পরশ্রী কাতরতা, ভয় ও দ্বেষরহিত, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যখন যে অবস্থাতে যে কোনও কর্ম্ম করিবে তখনই এই মূল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। ঐরূপ কার্য্য করা স্বভাব সিদ্ধ হইয়া উঠিলেই মায়ের মন্দিরের পথ নয়ন গোচর হইবে। পথ দেখিতে পাইলেই কিছু মন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইবেনা। রাস্তাটী সংকীর্ণ ও দুর্গম। পথে বহুবিধ বাধাবিঘ্ন ও অনেক শত্রুর আক্রমণ অতিক্রম করিতে হইবে। এই পথের কথা আর একদিন বলিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

উত্তরাখণ্ডে।

পঞ্চম অধ্যায়।

(৮ম সংখ্যার ২৬০ পৃষ্ঠার পর)

মহা। "এই কি তোমার একমাত্র ইচ্ছা? তথাকথিত অলৌকিক কার্য্যকরণ শিক্ষাভিলাষ তোমার নাই কি?"

চিন্তা। "জগৎপিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করণার্থ একমাত্র সত্যজ্ঞান লাভই আমার উদ্দেশ্য; আমি যেন আপনাকে এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীকে মুক্তি পথানুসরণে সহায়তা করিতে পারি। অতীন্দ্রিয় কার্য্য সম্বন্ধে আমার স্পৃহা নাই; তবে উক্তরূপ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা আবশ্যক মনে করি।"

মহা। "এই বেদিকায় খৃষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের শাস্ত্র, উপনিষদ, বেদ বেদাঙ্গ সমস্তই আছে, ইহার যে কোনটী হইতে সত্য গ্রহণে প্রস্তুত আছ?"

চিন্তা। "সত্য যাহা তাহা একই ঈশ্বরই,—সেই সত্য, সুতরাং তাহা গ্রহণে আমার আপত্তি থাকিতে পারে না।"

"উত্তম" এই কথা বলিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলে সমস্ত গৃহটী নিস্তব্ধ হইল।

কিছুক্ষণান্তর প্রবীন মহাত্মা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গম্ভীরভাবে মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, "তুমি কোন সৎ প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমার আত্মা ভগবত্তেজ সমন্বিত, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, মানব-সন্তান যাহাতে ঈশ্বর সন্নিহিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা তোমার অভিপ্রায়। দীক্ষার্থীগণের যে যে পরীক্ষা একান্ত অপরিহার্য্য, তদ্ব্যতীত সামান্য সামান্য পরীক্ষা হইতে তোমাকে মুক্ত করা গেল। অন্যের জন্য স্বার্থ-ত্যাগেরসংস্কার, আত্মপ্রীতি পরিহার পূর্ব্বক অপরের জগতের প্রীতি সাধন সংস্কার দীক্ষার্থীগণের মনে বদ্ধমুল করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। গত জীবনে তুমি যেমন ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, তুমি স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া মানব হিতার্থ যে রূপ নিয়ত শ্রম করিয়াছ—যে রূপ নিত্যসংযত হইয়া উঠিয়াছ তাহাতে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব তোমার হৃদয়ে বহুকাল হইতে পোষিত হইয়া তোমাকে প্রথম দীক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক; কারণ এই মৌলিক নিয়মের উপর প্রাচ্য বিজ্ঞান সংস্থাপিত। অবক্তের এবং বক্তের (involution and evolution) প্রহেলিকাময় নিয়ম জ্ঞানের অর্থাৎ কিরূপে সেই জগদাদি অনাদিদেব পরব্রহ্ম ব্যক্ত ভাবে ভূতাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইলেন (involved) এবং কি প্রকারেই বা ক্রমবিকাশ নিয়মে পুনঃ সেই পরব্রহ্ম স্বরূপে পরিণত হয়েন

(evolved), সেই বিধি জ্ঞানের সোপান স্বরূপ। সুন্দর রূপে তোমার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য একটী উদাহরণ দিতেছি,—যেমন একখণ্ড তুষার স্থূল ভৌতিক পদার্থ মাত্র উহাতে উত্তাপ প্রদান কর, উহা ও বারি রূপে পরিণত হইবে, অর্থাৎ ক্রমবিকাশাধিরোহিনীর একটী সোপানে আরোহণ করিবে; তখন উহার গুণের আধিক্য হইবে; উহাতে অপর বস্তুও দ্রবীভূত করা বা দ্রবরূপে মিশ্রিত করা যাইবে তুষারে তাহা সম্ভবে না। আর একটু অধিক উত্তাপ প্রদান কর, উক্ত অধিরোহণীর আর এক সোপানারূঢ় হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইবে, তখন তুষার বা জল অপেক্ষা উহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে; দৃষ্টিপথাতীত হইবে ও জলাপেক্ষা সমধিক চঞ্চল, বর্দ্ধিতায়তন এবং অপরাপর অনেক গুণ সম্পন্ন হইবে। আরও অধিক উত্তাপে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে অত্যুষ্ণ বাষ্প বলা যাইতে পারে। এ বারের অবস্থা মনুষ্যে আয়ত্ব করিতে সমর্থ হয় নাই। উহা সম্পূর্ণ দৃষ্টিবিষয়াতীত উহার শক্তি ভয়ানক এবং বুদ্ধির অগম্য, সে শক্তি এতই প্রবল যে, অনেকে বলেন যে সাগর বারি ভূগর্ভস্থ অগ্নি সংযোগে অত্যুষ্ণ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ভীষণ ভুকম্পন উৎপাদন করতঃ বহুবৃহৎ ভূখণ্ড বহুদুর উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। ক্রমবিকাশাধিরোহিণীর আর এক সোপানে উঠিলে উহা বৈজ্ঞানিকগণের বিক্ষিপ্তবাষ্প, ভাব ধারণ করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির অবকাশ স্থান পূর্ণ করে। সেই বিক্ষিপ্ত বাষ্পকে জ্ঞানীগণ সর্ব্বভূতানুবিশিষ্ট আকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তখন উহা জগৎ পরিচালক—জগৎ জীবন স্বরূপের অন্যতম কারণ হইয়া উঠে। পুনঃ আর এক সোপানোরোহণে ঈশ্বর সামিপ্য :লোকের দিব্যানুরূপ ধ্যরণ করে এবং আরও এক পদ উঠিলে সেই তুষার খণ্ড পরব্রহ্ম স্বরূপতত্ব প্রাপ্ত হয়।

সামান্য সৃষ্ট পদার্থ ক্রমবিকাশ ক্রমে স্বয়ং স্রষ্টাত্ব লাভ করে এই উদাহরণ শ্রবণে চিন্তামণির চিত্ত বিস্ময় রসে আপ্লুত হইল। তিনি ভাবিলেন, এরূপ দর্শন শাস্ত্র অতুলনীয়। কিন্তু এ মত সমাদরে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আবশ্যক।

তাঁহার অব্যক্ত চিন্তা মহাপুরুষের নিকট অব্যক্ত থাকিবার নহে। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন। "দেখ, সকল পদার্থই ঈশ্বর—সর্ব্বব্রহ্মময় জগৎ। সৃষ্টির স্বরূপ কথঞ্চিৎ বুঝিবার জন্য এক খণ্ড তুষার উদাহরণ

স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের স্থূলতম জড়ভাব প্রকাশিত ইহাতেই আবার তাঁহার অনন্ত শক্তি অন্তর্নিহীত।

"সেইরূপ খানিজ পদার্থ সমূহ, শিলাখণ্ড, মৃত্তিকা ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের সত্বা নিতান্ত স্থূল জড়ভাবাপন্ন সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত। তৎসমুদয়তেই তাঁহার অনন্ত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সমস্তই তাহাতে লীন হইবে। তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

"সেই অদ্বিতীয় কারিকরের জগৎ কারখানায় মানব মস্তিষ্ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র। সেই যন্ত্র সকল পদার্থেই শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে; চিন্তাই সেই শক্তি। এই শক্তির কল চিরস্থায়ী এবং ক্রমবিকাশ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারী। বিষময় প্রতিকুল শক্তিই হউক বা অমৃতময় অনুকুল শক্তিই হউক অনন্ত দেবের উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহাই সর্ব্বপ্রধান উপায়।"

চিন্তামণি উৎসাহ সহকারে উত্তর করিলেন "জগৎ কারণের সৃষ্টি কার্য্য কৌশলের এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আমি ইতি পূর্ব্বে আর কখন শ্রবণ করি নাই—ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার ধারণা হইতেছে।"

মহাপুরুষ বীণানিন্দিতস্বরে বলিলেন—"ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয় কালে সমস্তই অগ্নিময় ছিল। সে ঐশ্বরিক অগ্নি স্বরূপ অবস্থায় স্বয়ং পরব্রহ্ম—অজ্ঞেয়, অচিন্ত সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের অব্যক্তাবস্থা।"

সৃষ্টিকালে তিনি ব্যক্ত ভাবাবলম্বন করেন। তখন তিনি ভূতপঞ্চকত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূল জগৎরূপে আবির্ভূত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট যে ক্রম বিকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, এই সৃষ্টি প্রকরণ ঠিক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ যেরূপে এক পথে অধোগমনে ব্যক্ত ভাব, বিবর্ত্তন বা সৃষ্টি হয়, সেইরূপ অন্য পথে ঊর্দ্ধগমনে অব্যক্ত ভাব, ক্রমবিকাশ, ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি বা প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে।"

আকরিক জগৎ বিবর্ত্তন বা সৃষ্টির স্থূলতমাবস্থা। এই স্থানে বিবর্ত্তন শেষ হইয়া বিশ্রান্ত বা তুষ্টিস্থ তবং প্রতীয়মান হয়। তখন শব্দ ব্রহ্মোদ্ভুত স্পন্দন প্রয়োগে ব্রহ্মাণ্ডে একটি শক্তি উদ্ভুত হয়, সেই শক্তিদ্বারা পরমাণু সমূহ গত্যন্তর লাভ করিয়া বিকাশাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে।

"এই শব্দ ব্রহ্মোদ্ভব, প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের গূঢ়তমাবস্থা। স্থূলবিজ্ঞানানুশীলনকালে তুমি ভৌতিক পদার্থের উপর স্পন্দনের ক্রিয়া সুন্দররূপ আলোচনা করিয়াছ বলিয়া, যখন তৃতীয় পর্য্যায়ের গুহ্য বিষয়সমূহ তোমার নিকট ব্যক্ত হইবে তখন তুমি, সম্যক বুঝিতে পারিবে যে, দুইটী শক্তি সমবেগে প্রযুক্ত হইয়া দুইটীই পরস্পর নিরস্ত হইয়া যায়। তখন একটী ভীষণ শব্দ অব্যর্থরূপে সুপরিমিত স্পন্দন প্রয়োগদ্বারা সেই নিরস্ত পরমাণুচয়ের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশাভিমুখে তাহাদিগকে, আকর্ষণ ও বিক্ষেপন শক্তি সম্পন্ন একটী অব্যাহত বেগ প্রদান করিতে পারে। তাহাতে উহারা অপর একটী সম্পূর্ণ নূতন কার্য্য সম্পাদনার্থ একটী নূতন মার্গে প্রধাবিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এইরূপেই ঘটিয়া থাকে; ইহারই নাম ক্রমবিকাশ, প্রলয়াভিমুখী বা পর ব্রহ্মাভিমুখী শক্তি। এখন দেখ তোমাদিগের জড় বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য হয় কি না।"

চিন্তামণি সন্তোষ জ্ঞাপক স্বরে কহিলেন। "ইহা অতি সুন্দর ব্যাখ্যা এবং স্থূল বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"এখন সেই অদ্ভুত শব্দের বা শব্দ ব্রহ্মের প্রথম স্পন্দনাহত আকরিক পদার্থের কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এক নূতন শক্তি লাভ করিয়া পুনরায় তাহার উৎপত্তি স্থান দৈব প্রকৃতি অভিমুখে ধাবিত হইল। বিভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট পুরোবর্ত্তি প্রস্তরসমূহে ও সর্ব্ব প্রকার ধাতব পদার্থে ক্রম বিকাশের নিয়মানুসারে উত্তরকালে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিজ, ইতর জীব, মনুষ্য ও দেবযোনী পর্য্যন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। সকল বস্তুর আদিমাবস্থা ছাড়িয়া দিয়া, এক্ষণে আমাদিগের কথা ভাবিয়া দেখ—এক সময়ে আমরাও এইরূপ স্থূল পাহাড়, ধাতু, এই সকল ভাল মন্দ গুণান্বিত বৃক্ষ লতাদি, এই সকল হিংস্রক বা মৃদু স্বভাব ইতর প্রাণী ছিলাম, তৎপরে আদিমাবস্থায় অসভ্য জাতিত্ব, ক্রমে অর্দ্ধ সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম. সেই সমুদয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া (চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া) বর্ত্তমানাবস্থায় উন্নিত হইয়াছি। কেবল আমরাই এই সকল বস্তু ছিলাম এমত নহে, ইহারাও ক্রমে অনন্তদেবের চরণাভিমুখে ধাবিত হইয়া কালে আমাদিগের এই অবস্থা লাভ করিবে। ইহাতে গূঢ় তত্ত্বনিহিত আছে বলিয়া বোধ হইতেছে কি ?" (ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

২য় ভাগ। } মাঘ ১৩০৫ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

ভারতের নব রাজপ্রতিনিধি লর্ডকার্জ্জনের আগমন উপলক্ষে।

শোকাতুরা জননীর শূন্য ক্রোড়ে যথা—
অভ্যর্থিত, শত গুণ আদরে, কুমার ;
আজি বক্ষে ভারতের দুঃখ-বজ্রাহতা,
তেমনি উচ্ছ্বাস শুভাগমনে তোমার।

স্বরগের দূত সম লাগিতেছে মনে !
হৃদয় ভরিয়া তব এনেছ বহিয়া—

কি নব সুসমাচার ? আশার কিরণে
উঠিছে ভারত মুখ রঞ্জিত হইয়া।

তাহার শ্মশান বক্ষঃ উঠিছে শিহরি'
চরণ পরশ তব লভিয়া, হরষে !
পুনঃ শুষ্ক পুষ্প বুঝি উঠিছে মঞ্জরি' !

তোমার সরল কান্তি অমৃত বরষে
সর্ব্বাঙ্গে তাহার। যথা মেঘ মুক্ত দিবা'—
মধুর—মধুর রশ্মি বরষে তপন।

উজ্জল করিয়া তারে রাখুক ও বিভা,
কিন্তু নাহি করে যেন দগ্ধ কদাচন !

বিংশকোটী হৃদি দিয়া গড়া, সিংহাসন,
তোমার ভবিষ্য' তরে আছে অপেক্ষায়।
সে আসন চেয়ে শ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন,
মানবের আকাঙ্ক্ষিত কি আছে ধরায় ?

শ্রীমতী মৃণালিনী।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

১

ওই কেবা হরিনাম গায়,—
কার ও ললিত বাঁশী, ঢালিতেছে সুধারাশি,
কেবা হেন প্রেম স্রোতে জগত ডুবায় !

২

ও যে গোরা শচীর তনয়,—
অধম পতিত দীন, কারেও না ভাবি ভিন
সমাদরে পদে টানি সবে নাম কয়।

৩

কিবা হিন্দু কি যবন দল,
সবাই গৌরাঙ্গ ব'লে, চরণে পড়িছে ঢলে,—
প্রেম স্রোতে সারাবিশ্ব আজি ঢল ঢল।

৪

তার্কিকের তর্ক আজি দূর,—
যোগীর ভেঙেছে যোগ, কর্ম্মীর টুটেছে ভোগ
বহিছে সবার হৃদে ভকতি মধুর।

৫

জগতের শত দলাদলি,
যে করিয়া খান খান, জীবে দিল প্রেমদ
এস সবে তাঁর পায়ে পড়ি আজ ঢলি !

৬

তাঁর সেই রাতুল চরণে,
যে জন বিকাতে পায়,
সেই ধন্য এধরায়,
বয় গো অমৃত স্রোত তাহার হিয়ায়

৭

কে চাও গো জুড়াতে হৃদয়,
বারেক "গৌরাঙ্গ" বলি
পড় ও চরণে ঢলি,
প্রেমের দেবতা সে যে শান্তির আলয়।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

স্বামীজির পত্র।

ওঁ নমঃ শিবায়।

বৎস অনন্তরাম, মা মাতঙ্গিনী,

আমার হৃদয় মহামায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; হৃদয় মধ্যে ইষ্ট দেবতার

যুগল মূর্ত্তির স্থান, আমার মাতু মা ও অনন্তরাম অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমি কিছুকাল তোমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিব। আমি আজি তোমাদিগকে ছাড়িয়া পলাইলাম। আমার অন্বেষণ করিও না। যদি গুরুদেব শক্তি ও অনুমতি দেন তবে মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত দেখা করিব।

গুটি কত কথা বলিয়া যাই। অধ্যাত্ম বিদ্যালোচনায় চিত্ত নিবিষ্ট রাখিবে। শাম্ভবীবিদ্যা—গুপ্তবিদ্যালোচনী সভায় (Theosophical Society) যোগদান করিও। দৈবীসম্পৎশালী মহাপুরুষগণ উক্ত সমিতির উন্নতি ইচ্ছা করেন; উক্ত সমিতির জন্য যতটুকু প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিবে ততটুকু কার্য্য উক্ত মহাপুরুষগণের জন্য এবং আমার জন্য করা হইল বুঝিও। দৈবীসম্পৎ কথার অর্থ গীতাতে পাইবে।

তুমি সেদিন ষট্‌চক্র সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে তাহার অর্থ নিজেই বুঝিতে চেষ্টা করিও। আত্মার ষট্ কোষের সহিত ষট্‌চক্রের সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই ষট্‌চক্র রহস্য সম্যক্ বুঝিতে পারিবে। আত্মার ষট্‌কোষ কি কি তাহা Madame Blavatskyর ও Annie Besantএর বই হইতে পাইবে। আত্মার ষট্‌কোষ সম্বন্ধে কিন্তু যে সংস্কৃত সংজ্ঞা গুলি উহাঁদের পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে ঐ সংজ্ঞাগুলির কোন কোনটি আমাদের দর্শন শাস্ত্রের সহিত ঠিক মিলে না; কেবল নামের দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। উহাঁদের কথার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভাবিতে থাক। যে ভাবিতে শিখিয়াছে সেই মনুষ্য। মনুষ্যত্ব লাভে যত্নবান হও।

বেদান্ত দর্শনে অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়-কোষ এবং আনন্দময়কোষ এই পঞ্চ কোষের কথা আছে; এই পঞ্চকোষের কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং বেদান্ত শাস্ত্র হইতে তুমিও পড়িয়াছ; কিন্তু আজি ষট্‌কোষের কথা বলিতেছি সুতরাং উভয় কথার সামঞ্জস্য কোথায় সেইটা একটু বলিয়া যাই। মাতৃপিতৃজ দেহের নাম স্থূল শরীর; এই স্থূল শরীরকেই অন্নময় কোষ বলে। কিন্তু এই স্থূল শরীর প্রকৃত পক্ষে দুইটি দেহ লইয়া গঠিত; একটি মাতৃজ ও একটি পিতৃজ। মাতৃজ দেহই স্থূল মাংসাদি গঠিত দেহ এবং পিতৃজ দেহ উহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত।

একটি অপরটির সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া থাকে। মিসেস বেসাণ্ট এই পিতৃজ দেহের নাম দিয়াছেন Etheric body। এই পিতৃজ দেহের সংস্কৃত নাম পিণ্ড দেহ এবং মাতৃজ দেহের নাম ভাণ্ড দেহ। কর্ম্মফল বিধাতা দেবগণ, সূক্ষ্ম মহাভূতপঞ্চ পিণ্ডীকৃত করিয়া, জীবের কর্ম্মানুযায়ী এই পিণ্ডদেহ গঠন করেন; উহাই শুক্ররূপে পরিণত হইয়া মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করে ও মাতৃ-গর্ভস্থ ডিম্বে প্রবেশ করিয়া স্থূল উপাদান আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মাতৃজ দেহ, এই পিণ্ড দেহের আধার, সেই জন্য উহাকে ভাণ্ড দেহ বলা যায়। এই দেহ মধ্যে যে স্থল এই আধার দেহের লয় স্থান সেই স্থানের নাম মুলাধার পদ্ম বা মুলাধার চক্র। লয়স্থান কথাটির অর্থ হয়ত বুঝিতে পার নাই। দেহের যে স্থলে চিত্ত স্থির করিলে এই আধারদেহ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লয় হইয়া যায়। উহাই উক্ত দেহের লয় স্থান।

জীব লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া পিণ্ডদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া স্থূল আধারে প্রবেশ করেন, এই জন্য পিণ্ড দেহকে স্বাধিষ্ঠান এবং উহার লয় স্থলকে স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে।

এই দুইটি চক্র পার হইয়া গেলে জীব সূক্ষ্ম জগতে উপস্থিত হন, তখন তিনি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী হন। এই সূক্ষ্ম শরীরের অন্য নাম লিঙ্গশরীর। লিঙ্গ ত্রিবিধ। বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র। এই লিঙ্গত্রয় ক্রমে ক্রমে পার হইয়া জীব আনন্দময় অলিঙ্গ তত্ত্বে লীন হন। প্রকৃতির অন্য নাম অলিঙ্গ। আনন্দময় অলিঙ্গে লীন হওয়ার নাম সানন্দ সমাধি বা বিদেহ লয়। অব্যক্ত পুরুষ এই প্রকৃতির পারে অবস্থান করিতেছেন। বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই কথা কয়টি পাতঞ্জল দর্শনের কথা।

বেদান্ত দর্শন মতেও লিঙ্গশরীর তিনটি কোষে গঠিত; প্রাণময়কোষ, মনময়কোষ, ও বিজ্ঞানময়কোষ। পাতঞ্জল দর্শনের বিশেষলিঙ্গ, অবিশেষলিঙ্গ এবং লিঙ্গমাত্রই যথাক্রমে বেদান্ত দর্শনের প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষ এবং পাতঞ্জল দর্শনের অলিঙ্গই বেদান্ত দর্শনের আনন্দময়কোষ। মিসেস বেসাণ্ট তাঁহার Ancient Wisdom নামক পুস্তকের ২৩১ পৃষ্ঠাতে ষট্ কোষের যে যে নাম দিয়াছেন উহা পড়িয়া দেখিতে পাইবে যে তিনিও স্থূল শরীর এবং আনন্দময় শরীর মধ্যে তিনটি কোষের কথা লিখিয়াছেন, উহা-

দের ইংরাজী নাম দিয়াছেন Astral body, Mental body ও Causal body। উহারাই যথাক্রমে বেদান্ত দর্শনের প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ।

বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া Ancient Wisdom বই খানি যখন পড়িবে তখন একের পঞ্চকোষ এবং অন্যটির ষট্‌কোষ নিম্নলিখিতরূপে মিলাইয়া পড়িও।

	আত্মা	Atma	
	আনন্দময় কোষ	Bliss body	
	বিজ্ঞানময় কোষ	Causal body	
	মনোময় কোষ	Mental body	
	প্রাণময় কোষ	Astral body	
স্থূল শরীর	পিণ্ড দেহ	Etheric body	Physical body
	ভাণ্ড দেহ	Dense body	

কর্ম্মের রহস্য বুঝিতে গেলে ত্রিবিধা শক্তি রহস্য বুঝিতে হইবে। এই ত্রিবিধা শক্তি এই;—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তিকে চিনিতে পারিলেই ত্রিধা বিভক্ত সূক্ষ্ম শরীরকে চিনিতে পারিবে। বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়কোষ এবং প্রাণময়কোষ যথাক্রমে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির আশ্রয় স্থান। ব্রাহ্মণের উপাস্য গায়ত্রীর রুদ্রাণী, বৈষ্ণবী এবং ব্রাহ্মী শক্তিই যথাক্রমে উক্ত জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি। এই ত্রিবিধা শক্তির সাম্যাবস্থাই ব্রহ্মতেজ স্বরূপিনী আনন্দময়ী দেবী গায়ত্রী; এই বরণীয় ব্রহ্ম-জ্যোতিই আনন্দময় কোষের রূপ। এই ব্রহ্মতেজ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিরূপে পরিণত হয়। জ্ঞান শক্তি সৌরতেজস্বরূপ, ইচ্ছা শক্তি চান্দ্রতেজস্বরূপ এবং ক্রিয়া শক্তি অগ্নিতেজ স্বরূপ। বিজ্ঞানময়কোষের অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য্য, মনোময়কোষের চন্দ্র ও প্রাণময়কোষের অধিষ্ঠাতা অগ্নি।

পবিত্র ওঁকারে সতত মন নিবিষ্ট রাখিও। এই ওঁকারের সাহায্যেই ষট্‌কোষ এবং পুরুষকে চিনিতে পারিবে। ওঁকার সাধনার নামই যোগ; ওঁকার সাধনার নামই ঈশ্বরোপাসনা; ওঁকার সাধনা জন্য সাধারণকে অধি-

কারী করাই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই ওঁকার বিদ্যাই পরাবিদ্যা। এই বিদ্যারই অন্য নাম শাম্ভবীবিদ্যা। ওঁকারের সাহায্যে ষট্‌কোষ ও পুরুষকে কিরূপে চিনিতে হয় সংক্ষেপে বলি শুন।

বিল্ব বৃক্ষের বীজ মধ্যে এমনি একটী শক্তি আছে যে নিবন্ধন উহার প্রত্যেক পত্রই তিন ভাগে বিভক্ত। ওঁ এই মন্ত্রবীজের অন্তর্নিহিত শক্তি নিবন্ধন উহা হইতে যাহা জন্মে সকলই ত্রিধা বিভক্ত। তিনের মধ্যে একতাই ওঁকারের শক্তি। এই শক্তির নাম পরাবাক্ শক্তি। পরাবাক্ শক্তি আবার পশ্যন্তি বাক্, মধ্যমা বাক্ এবং বৈখরী বাক্ এই ত্রিবিধ রূপে ব্যক্ত ভাবাপন্ন হইয়া জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। এই ত্রিবিধ বাক্‌শক্তির সাহায্যে ওঁকার সাধনা করিয়া অব্যক্তকে চিনিতে পারিলে পরমপুরুষার্থ সাধনে কৃত-কার্য্য হইবে। বৈখারী বাক্‌এর লীলাক্ষেত্র স্থূলজগৎ, মধ্যমা বাক্‌এর লীলা-ক্ষেত্র সূক্ষ্ম জগৎ এবং পশ্যন্তি বাকের ক্ষেত্র কারণ জগৎ।

বৈখরী ওঁকার মধ্যমা ওঁকার এবং পশ্যন্তি ওঁকার এই তিনটি ওঁকার মনুষ্য বৃক্ষকে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ করিয়াছে এবং এই নিবন্ধন মনুষ্যের কাছে জগতের যা' কিছু লীলা সবই সাতের খেলা।

এই সাতের রহস্য যদি বুঝিতে চাও তবে প্রথমে বৈখরী ওঁকার অবলম্বনে স্থূল শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে সূক্ষ্ম শরীরী বুঝিতে শিখ। এখন এই স্থূল শরীরটিই তোমার শরীর এই অভিমান আছে, কিন্তু এই স্থূল জগতে জন্মের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে তোমার তখন যে দেহ ছিল তাহারই উপর তোমার পিতৃজ ও মাতৃজ দেহ আবরিত হইয়া বর্ত্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান দেহকে ওঁকার অবলম্বনে তিন ভাগে বিভক্ত দেখিতে শিখ; তখন বুঝিতে পারিবে, বৈখরী ওঁকার তোমার পূর্ব্ব দেহটিকে আর দুইটি দেহের যোজক করিয়া কিরূপে তোমাকে স্থূল শরীরে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে শক্তি তোমাকে তোমার মাতৃজ ও পিতৃজ দেহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেই তোমার সম্বন্ধে তাঁহার লীলা শেষ হইল। তখন তুমি তোমার পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ তোমার দেহ নহে বুঝিতে পারিবে। জন্মদাতা পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত দেহ তাঁহাদের কার্য্যে বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্থূল শরীরে অনাশক্তি অভ্যাস করিতে হয়।

স্থূল শরীরাভিমান ছাড়িয়া গেলে জীব যে দেহে থাকেন মধ্যমা প্রণব সহায়ে উহাকে আবার ত্রিধা বিভক্ত দেখিতে হইবে। এখানেও নিজেকে একটী যুগল দেহের যোজক মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবে। প্রাণময়কোষ এবং মনোময়কোষ এই যুগল দেহ, জীব যে দেবতাদের নিকট হইতে এই কোষ দ্বয় পাইয়াছে উহা তাঁহাদিগের উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়া ঐ দুই কোষে অনাশক্তি লাভ করা যায়। জীব এই কোষদ্বয় ছাড়িয়া দিলে, তিনি যে দেহাভিমানী হন, উহা আবার পশ্যন্তি প্রণব সহায়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখা যায়; জীব তখন আপনাকে আবার একটী যুগল দেহের যোজক বলিয়া বুঝেন। বিজ্ঞানময়কোষ এবং আনন্দময়কোষ এই যুগল দেহ। জ্ঞান আলোচনা দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে করিতে জীব এই দুই দেহেও অনাশক্তি লাভ করেন; তখন তিনি পরাপ্রকৃতিকেই নিজের দেহ বলিয়া বুঝেন এবং শিবোহং এই জ্ঞান লাভ করেন। মহাদেব তোমাদের মঙ্গল করুণ। আমার মা মাতঙ্গিনীকে ভালবাসিতে শিখিও। ভাল বাসিয়া মন হারাইতে শিখাই প্রধান শিক্ষা। ভালবাসার অর্থই মন বিসর্জ্জন শিক্ষা। সাবধান ভালবাসার মধ্যে যেন স্বার্থ না থাকে, মন বিসর্জ্জনই যেন স্বার্থ হয়। যিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছেন তিনি তাঁহার হৃদয় মন্দিরে ভগবানের প্রেমময় শক্তিরূপ দেখিতে পান। এই শক্তিরূপ ধ্যান করিতে শিখ; তোমার চক্ষু খুলিবে এবং ভগবানের প্রণবরূপ দেখিতে পাইবে। ওঁ তৎ সৎ।

তোমাদের চিদানন্দ বাবা

পত্র খানি পাইয়া গৃহিনীকে স্বামীজির পলায়ন সংবাদ দিলাম। গৃহিনী খানিক কাঁদিলেন; আমিও কাঁদিলাম। খানিক পরে গৃহিনী বলিলেন ওগো-তিনি যাবেন কোথা। আমাদের গুরু ভক্তির যদি জোর থাকে তবে আবার তাঁহাকে ফিরে আস্‌তে হবে।

অনন্তরাম।

কারী করাই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই ওঁকার বিদ্যাই পরাবিদ্যা। এই বিদ্যারই অন্য নাম শাম্ভবীবিদ্যা। ওঁকারের সাহায্যে ষট্‌কোষ ও পুরুষকে কিরূপে চিনিতে হয় সংক্ষেপে বলি শুন।

বিল্ব বৃক্ষের বীজ মধ্যে এমনি একটী শক্তি আছে যে নিবন্ধন উহার প্রত্যেক পত্রই তিন ভাগে বিভক্ত। ওঁ এই মন্ত্রবীজের অন্তর্নিহিত শক্তি নিবন্ধন উহা হইতে যাহা জন্মে সকলই ত্রিধা বিভক্ত। তিনের মধ্যে একতাই ওঁকারের শক্তি। এই শক্তির নাম পরাবাক্ শক্তি। পরাবাক্ শক্তি আবার পশ্যন্তি বাক্, মধ্যমা বাক্ এবং বৈখরী বাক্ এই ত্রিবিধ রূপে ব্যক্ত ভাবাপন্ন হইয়া জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। এই ত্রিবিধ বাক্‌শক্তির সাহায্যে ওঁকার সাধনা করিয়া অব্যক্তকে চিনিতে পারিলে পরমপুরুষার্থ সাধনে কৃত-কার্য্য হইবে। বৈখারী বাক্‌এর লীলাক্ষেত্র স্থূলজগৎ, মধ্যমা বাক্‌এর লীলা-ক্ষেত্র সূক্ষ্ম জগৎ এবং পশ্যন্তি বাকের ক্ষেত্র কারণ জগৎ।

বৈখরী ওঁকার মধ্যমা ওঁকার এবং পশ্যন্তি ওঁকার এই তিনটি ওঁকার মনুষ্য বৃক্ষকে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ করিয়াছে এবং এই নিবন্ধন মনুষ্যের কাছে জগতের যা' কিছু লীলা সবই সাতের খেলা।

এই সাতের রহস্য যদি বুঝিতে চাও তবে প্রথমে বৈখরী ওঁকার অবলম্বনে স্থূল শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে সূক্ষ্ম শরীরী বুঝিতে শিখ। এখন এই স্থূল শরীরটিই তোমার শরীর এই অভিমান আছে, কিন্তু এই স্থূল জগতে জন্মের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে তোমার তখন যে দেহ ছিল তাহারই উপর তোমার পিতৃজ ও মাতৃজ দেহ আবরিত হইয়া বর্ত্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান দেহকে ওঁকার অবলম্বনে তিন ভাগে বিভক্ত দেখিতে শিখ; তখন বুঝিতে পারিবে, বৈখরী ওঁকার তোমার পূর্ব্ব দেহটিকে আর দুইটি দেহের যোজক করিয়া কিরূপে তোমাকে স্থূল শরীরে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে শক্তি তোমাকে তোমার মাতৃজ ও পিতৃজ দেহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেই তোমার সম্বন্ধে তাঁহার লীলা শেষ হইল। তখন তুমি তোমার পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ তোমার দেহ নহে বুঝিতে পারিবে। জন্মদাতা পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত দেহ তাঁহাদের কার্য্যে বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্থূল শরীরে অনাশক্তি অভ্যাস করিতে হয়।

স্থূল শরীরাভিমান ছাড়িয়া গেলে জীব যে দেহে থাকেন মধ্যমা প্রণব সহায়ে উহাকে আবার ত্রিধা বিভক্ত দেখিতে হইবে। এখানেও নিজেকে একটী যুগল দেহের যোজক মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবে। প্রাণময়কোষ এবং মনোময়কোষ এই যুগল দেহ, জীব যে দেবতাদের নিকট হইতে এই কোষ দ্বয় পাইয়াছে উহা তাঁহাদিগের উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়া ঐ দুই কোষে অনাশক্তি লাভ করা যায়। জীব এই কোষদ্বয় ছাড়িয়া দিলে, তিনি যে দেহাভিমানী হন, উহা আবার পশ্যন্তি প্রণব সহায়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখা যায়; জীব তখন আপনাকে আবার একটী যুগল দেহের যোজক বলিয়া বুঝেন। বিজ্ঞানময়কোষ এবং আনন্দময়কোষ এই যুগল দেহ। জ্ঞান আলোচনা দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে করিতে জীব এই দুই দেহেও অনাশক্তি লাভ করেন; তখন তিনি পরাপ্রকৃতিকেই নিজের দেহ বলিয়া বুঝেন এবং শিবোহং এই জ্ঞান লাভ করেন। মহাদেব তোমাদের মঙ্গল করুণ। আমার মা মাতঙ্গিনীকে ভালবাসিতে শিখিও। ভাল বাসিয়া মন হারাইতে শিখাই প্রধান শিক্ষা। ভালবাসার অর্থই মন বিসর্জ্জন শিক্ষা। সাবধান ভালবাসার মধ্যে যেন স্বার্থ না থাকে, মন বিসর্জ্জনই যেন স্বার্থ হয়। যিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছেন তিনি তাঁহার হৃদয় মন্দিরে ভগবানের প্রেমময় শক্তিরূপ দেখিতে পান। এই শক্তিরূপ ধ্যান করিতে শিখ; তোমার চক্ষু খুলিবে এবং ভগবানের প্রণবরূপ দেখিতে পাইবে। ওঁ তৎ সৎ।

তোমাদের চিদানন্দ বাবা

পত্র খানি পাইয়া গৃহিনীকে স্বামীজির পলায়ন সংবাদ দিলাম। গৃহিনী খানিক কাঁদিলেন; আমিও কাঁদিলাম। খানিক পরে গৃহিনী বলিলেন ওগো-তিনি যাবেন কোথা। আমাদের গুরু ভক্তির যদি জোর থাকে তবে আবার তাঁহাকে ফিরে আস্‌তে হবে।

অনন্তরাম।

সাধনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঞ্চভৌতিক কোন জড় পদার্থই আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত কি সঞ্চালিত হইতে পারে না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর স্বয়ং ক্রিয়াশীল নহে, অর্থাৎ স্বয়ং পরিবর্ত্তিত হইতে কিম্বা গমনাগমন করিতে সমর্থ নহে। জীবের লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর কর্ত্তৃক ও স্থূল শরীর পরিবর্ত্তিত কিম্বা সঞ্চালিত হইতে পারে না, যেহেতু লিঙ্গ শরীরের পঞ্চ প্রাণ জড় পদার্থ; এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকার ইহাদের কোনটীই কোন পদার্থ বা বস্তু নহে, (সাবয়বও নয় এবং নিরবয়ব ও নয়); ইহাদের সমষ্টিই অন্তঃকরণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত, এবং এই অন্তঃকরণ মায়াশক্তির ক্রিয়া মাত্র, কোন কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ নহে। *

জৈব কার্য্য সমূহের পূর্ব্ববর্ত্তি ঘটনা বা কারণ জৈব ইচ্ছা, কিন্তু জৈব ইচ্ছার কারণ জৈব ইচ্ছা নহে, যেহেতু ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ ইচ্ছা করেনা, ইচ্ছা স্বতঃই অন্তঃকরণে উদিত হয়। ইচ্ছার কারণ সুখ দুঃখ বোধ, এবং সুখ দুঃখের কারণ পাঞ্চভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তন বিশেষ, যেহেতু পাঞ্চভৌতিক জগতের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনই বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখের কারণ রূপে দৃষ্ট হয়।

আত্মা ও নিরবয়ব অসীম চৈতন্য পদার্থ বলিয়া নিষ্ক্রিয়। সুতরাং জীব স্বয়ং

* অন্তঃকরণ যে কেবল ক্রিয়া মাত্র এবং কোন পদার্থ নহে ইহা মৎপ্রণীত "কোঽহম্" গ্রন্থে বিশেষ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কিছুই করিতে পারে না; জীবের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাভাব। পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ এবং ইচ্ছাদি মায়া শক্তির ক্রিয়ারূপদর্পণে বা অন্তকরণে আত্মপ্রতিবিম্ব মাত্র। * ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা হেতু, এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্মেচ্ছাসংজ্ঞক নিয়তি অনুসারেই মায়াশক্তির ক্রিয়ায় পাঞ্চভৌতিক জগতের আবির্ভাব, তিরোভাব, ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত পর হইতে জগৎধ্বংশের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিয়তি অনুযায়ীই জাগতিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তি ঘটনা পরবর্ত্তি ঘটনার কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

প্রতিবিম্বের জ্ঞান বা দর্শনই সংস্কার সংজ্ঞা প্রাপ্ত। পরপর দৃষ্ট প্রতিবিম্ব বা ঘটনা সমূহের মধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণ ভাব বা সম্বন্ধ ও প্রতিবিম্ব সকলের মূল প্রকৃত কারণ অবগতিই তত্ত্বজ্ঞানশব্দ বাচ্য। এই তত্ত্বজ্ঞান যাহার যে পরিমাণে অধিক তিনি সেই পরিমাণে অধিক জ্ঞানী। যিনি শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী। যাহার যেরূপ জ্ঞান তাহার সেইরূপ ইচ্ছা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার অন্তঃকরণে এমন কোন ঘটনা বা কার্য্যের জন্য ইচ্ছা হইতে পারেনা যে ঘটনা বা কার্য্য নিয়তি অনুযায়ী বা প্রাকৃতিক নিয়ম বা মায়াশক্তির ক্রিয়াক্রমানুসারে ঘটিবেনা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাহার কাম্য কিছুই নাই; এজন্য তাঁহার ইচ্ছা উদ্দেশ্যহীন বা অহৈতুকী, তবে প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তি অনুসারে তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে মাত্র।

এখন দেখা যাউক জীবগণের মধ্যে জ্ঞানবৈষম্যের কারণ কি। এক জনকে অন্য জন হইতে অধিকতর কি অল্পতর জ্ঞানী দেখা যায়, এবং এক ব্যক্তির সম্বন্ধেও কালে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার তারতম্য দৃষ্ট হয়। জ্ঞান বৈষম্যের কারণ নির্ণীত হইলেই "ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি" যে কি তাহা বুঝা যাইবে।

অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, জীবগণের ইচ্ছা সুখদুঃখমূলক এবং সুখ দুঃখের কারণ জাগতিক পরিবর্ত্তন বিশেষ। জীবের দেহও পাঞ্চভৌতিক জগতের অন্তর্গত।

* "কোঽহম" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পাঞ্চভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তনের কারণ কি? চন্দ্রসূর্য্যাদি পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের গতি লক্ষিত হইতেছে। জীব দেহ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। চুম্বকপাথরের দিকে লৌহ আকৃষ্ট হইতেছে। বৃক্ষ হইতে ফল পত্রাদি ভূমিতে পতিত হইতেছে। দেহে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনা নিচয় অন্তঃকরণে আমরা দর্শন করিয়া থাকি। এই সমুদায় জাগতিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ সকল সাবয়ব পদার্থ। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; বিশেষতঃ নিরবয়ব ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সাবয়ব জড় পদার্থের আকুঞ্চন, বিস্ফারণ, ও সঞ্চলনাদি অসম্ভব। অতএব অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পাঞ্চভৌতিক জড় জগতে সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং ক্রিয়াশীল অতি সূক্ষ্ম এমন কোন অসীম সাবয়ব পদার্থ আছে, যাহার সংবেগরূপ ক্রিয়ায় পাঞ্চভৌতিক জগতের সর্ব্ব প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই পদার্থের সংবেগরূপ ক্রিয়া জাগতিক পরিবর্ত্তনাদির কারণ বলিয়া উহাকে "শক্তি" সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যেহেতু "শক্তি" শব্দটী ক্রিয়াবোধক। পাঞ্চভৌতিক জগতের উৎপত্তি হইতে লয় পর্য্যন্ত উক্ত জগতের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূলে এবম্বিধ স্বয়ং ক্রিয়াশীল বা অন্তরসংবেগবিশিষ্ট শক্ত্যুপাধি কোন পদার্থের অস্তিত্ব বা বর্ত্তমানতা ১মতঃ অনুমেয়। ২য়তঃ শক্ত্যুপাধি এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলে জাগতিক পরিবর্ত্তনাদি সম্ভব এবং না থাকিলে জাগতিক পরিবর্ত্তনাদি অসম্ভব; এজন্য শক্তির অস্তিত্ব যুক্তিযুক্ত। ৩য়তঃ জীবদেহ সকল এবং পাঞ্চভৌতিক অন্যান্য জড় পদার্থ সকল স্বয়ং ক্রিয়াশীল নহে, শক্তিসংবেগে সঞ্চালিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লোকে প্রসিদ্ধ; এবং শাস্ত্রে জ্যোতির্ম্ময়ী ঈশ্বরদেহের অস্তিত্ব বিষয়ে আভাস ও পাওয়া যায়, এজন্য শক্তির অস্তিত্ব শ্রুতি বাক্যানুমোদিত। ৪র্থতঃ এবম্বিধ শক্ত্যুপাধি জ্যোতির্ম্ময়ী পদার্থের আংশিক প্রকাশ ও সদ্‌গুরূপদেশানুযায়ী সাধনায় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব অনুমান, যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও শ্রুতিবাক্য প্রমাণাদি হইতে পাঞ্চভৌতিক জগতের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের কারণস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম সাবয়ব স্বয়ং ক্রিয়াশীল অন্তর সংবেগবিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক "শক্তি"র অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

তারা সঙ্গীত।

জয় জগত জননী গোমা তারা।
জয় কলুষ নাশিনী ওমা ভব দারা॥
ত্বং হি অনাদ্যা, সর্ব্বেষামাদ্যা,
ত্বং হি জগদ্বীজং সারাৎসারা।
চরণে পড়েছে শিব, একি মা তা অশিব,
(যেন) নীল গগন মাঝে ভাসে রাঙ্গা তারা।
কিবা নীল বরণ, নিষ্কলঙ্ক গগণ,
বাঘাম্বর পরিধান অতি মনোহরা।
হৃদে পীন পয়োধর, পদ্ম অসি দুই কর,
খর্পর অপর কর নর মুণ্ড ধরা।
মরি কি মুখ চন্দ্রমা, ত্রিনয়নী অনুপমা,
প্রস্ফুটীত নীলপদ্ম চুমিছে ভ্রমরা।
দ্বিজরাজ শোভে ভালে, জড়িতা নাগিনী দলে,
কেন মা খরবাক্কতি শিরে জটা ভরা।
কহে দীন আকিঞ্চন, পাপে জ্বলে এ জীবন,
পদামৃত কর দান ওমা বিষহরা।

ওঁ তৎ সৎ,

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সাধুসঙ্গ মহিমা।

কুরুক্ষেত্র তীর্থে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ সমাগত আত্মতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাসাদির অভ্যর্থনা ছলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ——

অহোবয়ং জন্মভৃতোলব্ধং কার্ৎস্যেন তৎফলং।
দেবানমপি দুষ্প্রাপং যদ্ যোগেশ্বর দর্শনং ॥১॥

হে মহর্ষিগণ, আমরা সার্থক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি যে হেতু অদ্য দেবতা গণেরও দুষ্প্রাপ্য যোগীশ্বর দর্শন যাহা মনুষ্য জন্মের সর্ব্ব প্রধান ফল তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হইল।

এই শ্লোকে ভগবান যোগেশ্বর দর্শনকে মনুষ্য জন্মের সর্ব্ব প্রধান ফল রূপে কীর্ত্তন করিলেন। যেহেতু মনুষ্য জন্মে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সেই জন্ম সফল হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণের তত্ত্বোপদেশ ব্যতীত জ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই।

এই স্থানেই ভগবদাচরিত ব্যাবহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রদর্শিত হইল। যেমত আমি সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণকাম পুন্য পাপাস্পৃষ্ট পরমেশ্বর হইয়াও জন সংগ্রহার্থ স্বয়ং তীর্থযাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, পদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ গণের পূজা করিতেছি, বর্ণ ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতেছি, অথচ আমরা এই সকল কর্ম্ম জন্য পুন্য বা স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তি প্রত্যাশার সম্ভাবনাই নাই, তদ্রূপ যাহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যফলে এই জীব লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিছেন তাঁহারাও জন সংগ্রহার্থ আমার মত ব্যবহার করিয়া অজ্ঞ জীবগণকে তত্ত্বোপদেশ দিবেন। যাহাতে তাহারা স্ব স্ব চিত্ত বৃত্তির শক্ত্যানুসারে অবিচলিত রূপে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, ধর্ম্মের চরম সোপানে আরূঢ় হইয়া আমার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মব্রহ্মরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে, আপনারা

সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন। যাহাতে কাহারও ধর্ম্মমতি বিচলিত হয় কদাচ এইরূপ ব্যাবহার করিবেন না।

প্রথমতঃ ভগবান্ যাহা স্বকৃত ব্যাবহার দ্বারা প্রদর্শন করিলেন তাহাই দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা—

কিংস্বল্প তপসাং নৃণামাচার্য্যং দেব চক্ষুষাং।
দর্শন স্পর্শন প্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং ॥২॥

হে মহর্ষিগণ! যাহারা পূর্ব্ব জন্মে অল্প তপস্যা করিয়াছে, তজ্জন্য ইহজন্মে যাহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই, আমার সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ দর্শন করিতে পারে নাই কেবল প্রতিমাদিতে আমাকে নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছন্নরূপে উপাসনা করে, তাহাদের কি আপনাদের দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণ নমস্কার ও পাদ সেবাদি ঘটিয়া থাকে?

অর্থাৎ আপনারা কি অজ্ঞ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আমার সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ দর্শনোপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন? যদি আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন যে যখন ঐ সকল জীব আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূজা ও ভাবনা করিতেছে, তখন অবশ্যই ক্রমে ক্রমে তাহাদের চিত্ত শুদ্ধি হইলে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইবে সুতরাং তাহাদিগকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যক কি? এরূপ বিবেচনা করিবেন না। উপদেশ দিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেহেতু—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৩॥

জনময় তীর্থ সকল তীর্থই নহে, মৃণ্ময় বা শিলাময় দেব দেবই নহে, তাহারা সেবা দ্বারা বহুকালে পবিত্র করিতে পারে, সাধুগণ দর্শন মাত্রেই পবিত্র করেন, অতএব জনময় তীর্থ ও মৃচ্ছিলাময় দেব অপেক্ষা সাধু দর্শন শ্রেষ্ঠ।

সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য সন্নিধানে তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অনায়াসে শুদ্ধ চিত্ত হইয়া স্বারাধ্য ইষ্ট দেবতায় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া পরমপদ লাভ করেন। বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইয়া প্রতিমাদিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভেদজ্ঞান রূপ মহাবিঘ্নেরও সম্ভাবনা আছে যথা—

নাগ্নির্নসূর্য্যো নচ চন্দ্র তারকা ন ভূর্জলং খং শ্বসনোহথ বাঙ্মনঃ।
উপসিতা ভেদকৃতোহরস্তুধং বিপশ্চিতোঘ্নন্তি মুহূর্ত্ত সেবয়া ॥৪॥

অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য, মন, উপাসিত হইয়া যদি ভেদ জ্ঞানের জনক হয়েন তবে জীবের অজ্ঞান নাশ করিতে পারেন না। জ্ঞানীগণ মুহূর্ত্ত মাত্র পরিসেবিত হইলেও অভেদোপদেশ দ্বারা জীবের অজ্ঞান নাশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ—

যখন জীব সকলের মধ্যে কেহ অগ্নিতে কেহ সূর্য্যে কেহ জলে ইত্যাদি নানা স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি অগ্নি সূর্য্যাদির ভেদ বশতঃ ঐ সকল উপাধিতে আশক্ত হইয়া স্বায় উপাস্য সর্ব্বব্যাপি জগদন্তর্যামি জগদীশ্বরের ভেদ নিশ্চয় করিয়া কেহ অগ্নির নিন্দাপূর্ব্বক সূর্য্যের প্রশংসা করে কেহ বা সূর্য্যের নিন্দা করিয়া অগ্নির প্রশংসা করে, তাহা হইলে তাহাদের মন দ্বেষভাবে অপবিত্র এবং কল্যাণ পথচ্যুত হইতে পারে। অতএব তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য যে অজ্ঞানী মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ করেন যে, তুমি অগ্নিতে যাহাকে উপাসনা করিতেছ তাঁহাকেই কেহ জলে কেহ স্থলে কেহ আকাশে কেহ আদিত্যে কেহ বা সর্ব্বভূতে উপাসনা করিতেছে। তোমাদের সকলেরই উপাস্য একমাত্র সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি সর্ব্বান্তর্য্যামি জগদীশ্বর সুতরাং কদাচ অন্যের উপাস্য দেবতাকে দ্বেষ ঘৃণা নিন্দা বা উপহাসাদি করিও না। যেহেতু তোমারই অভীষ্ট দেবতাকে সকলে উপাসনা করিতেছ। তিনিই নানারূপে নানা স্থানে নানা জীবের মনোমত নানাবিধ ফল প্রদান করিতেছেন। যদি অজ্ঞ জীব এইরূপ সদুপদেশ প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহার জগদীশ্বরে ভেদ বুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে স্বারাধ্য অভীষ্ট দেবতার সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে।

দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন জীব পরম পবিত্র তত্ত্বজ্ঞ সদগুরু সন্নিধানে উপদেশ গ্রহণ না করে, তবে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সম্পৎ কেবল বিপদের কারণ হইয়া উঠে যথা—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুলপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্ঠভিজ্ঞেষু স এব গোখর ॥৫॥

যে জীবের বাতপিত্ত কফ বিনির্ম্মিত স্থূল শরীরে আত্ম বুদ্ধি আছে এবং যাহার স্ত্রী পুত্র ধনাদিতে আত্মীয় বুদ্ধি আছে যাহার পৃথিবীবিকার ঘটপট প্রতিমাদিতে উপাস্য বুদ্ধি আছে এবং যাহার জলে তীর্থ বুদ্ধি আছে অথচ যে সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ক্ষণকালের মধ্যে তত্ত্বোপদেশ জলে মানসিক চির সঞ্চিত অজ্ঞান মল ধৌত করিয়া জীবের অভ্যন্তর পবিত্র করেন তাঁহাদিগকে পবিত্রকর জ্ঞান করে না সে গো তৃণ বাহক গর্দ্দভ তুল্য। যেমন গোগণের ভক্ষনীয় তৃণ বাহক গর্দ্দভ স্বপৃষ্ঠে ঘাস ভার বহন করিয়া শ্রান্তি ক্লান্তি প্রভৃতি অশেষ দুঃখ ভোগ করে কিন্তু এক মুষ্টি ঘাস ভক্ষণ জন্য আনন্দ লাভ করে না তদ্রূপ ঐ অবিবেকী জীব সাংসারিক মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহ রাগ দ্বেষ রোগ শোক বাদ বিবাদ জনিত বিবিধ দুঃখের ভারমাত্র গ্রহণ করে ক্ষণকাল জন্যও আত্মানন্দ ভোগের অধিকারী হয় না।

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা শরীরে আত্ম বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছেন, যাহারা স্ত্রী পুত্রাদির শরীরে আত্ম দর্শন করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারাই পন্থা তাঁহাদের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান তাঁহাদের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ। তাঁহাদের সলিলে তীর্থ বুদ্ধি নাই প্রতিমাদিতে ঈশ্বর বুদ্ধি নাই সর্ব্বত্র সেই সর্ব্বান্তর্য্যামি জগদীশ্বরের ভাব অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

কিন্তু এই অমৃতময় উপদেশ না পাইয়া কিম্বা ইহাতে অবজ্ঞা করিয়া যিনি এই ক্ষণভঙ্গুর স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন তিনি তাহার পুষ্টি ও স্বাচ্ছাদ্য জন্য নিরন্তর ব্যাগ্র হন। অশেষবিধ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও শরীরটিকে হৃষ্ট পুষ্ট করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। কেহ বা আপন দেহকে রুগ্ন ভগ্ন বিরূপ বা কুরূপ দেখিয়া একেবারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হন আপনাকে হতভাগ্য ও অশেষ দুখমাস্পদ মনে করেন এবং যাবজ্জীবন মহাদুঃখে কালহরণ করেন। কেহবা অল্পকালের নিমিত্ত পুত্র মিত্র কলত্র পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করেন। কেহ বা অচিরস্থায়ী ধনজন আহরণে অন্যায় পথে পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিধ ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া বিশ্ব বিপিনের বিষময় কণ্টক স্বরূপ হন কেহ বা ধনাদি আহরণে অশক্ত হইয়া অজর অমর আত্মার মৃত্যু কাল বাসনা করেন। কেহ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বশতঃ প্রতিমাদিতে

ঈশ্বরোপাসনা করিতে গিয়া উপদেশাভাবে মাটি ভাবিয়া মাটি হন। কেহ বা একটি মূর্ত্তিতে আশক্ত হইয়া অন্য প্রতিমূর্ত্তির দ্বেষ বা নিন্দা করেন। কেহ অকস্মাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পৃথিবীস্থ অপর উপাসকগণকে ঘৃণা করেন। এই রূপে নানা ভাবে নানা কুতর্ক করিয়া তনুমন কলুষিত করেন। তত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরু পাইয়াও তাঁহাকে চিত্ত পবিত্রকর জ্ঞান না করিয়া সামান্য মনুষ্যবৎ উপেক্ষা করেন অথবা তাঁহার জ্ঞান গর্ভ উপদেশ বুঝিতে না পারিয়া অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু যে কোন মাহাত্মা এই ভগবদুপদেশের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন তিনি কখনই স্থূল দেহকে হৃষ্ট পুষ্ট দেখিয়া গর্বিত হন না, অথবা এই দেহ ব্যঙ্গ বিরূপ মৃত কল্প হইলেও দুঃখ বোধ করেন না এবং পুত্র মিত্র বিত্তাদি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পাইয়াও অহঙ্কারাদি রিপুর বশীভূত হন না। অথবা বিত্তাদি না থাকিলেও মহান মন দুঃখে কাল হরণ করেন না এবং সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও স্বারাধ্য দেবতা শূন্য সূচাগ্র পরীমিত স্থান ও দেখিতে পান না সুতরাং কোন একটি উপাসককেও ভূত ভৌতিকের উপাসক বলিয়া বিদ্বেষ উপহাস বা নিন্দা করেন না। অজ্ঞ প্রবোধার্থ প্রতিমাদিতে ঈশ্বরোপাসনা করিয়াও স্বীয় জ্ঞান মহিমার অনুমাত্রও হানি বোধ করেন না। তিনি কখন শরীর মলাপহারি জলকে পবিত্রকর জ্ঞান করিয়া মানস মলাপহারী জ্ঞান গুরুকে অবজ্ঞা করেন না কিম্বা জন সংগ্রহার্থ পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্যাটন করিয়াও শ্রান্ত বা ভ্রান্ত হননা। কোন অবস্থাতেই ঈদৃশ মহাপুরুষের মনে ঘৃণিত অনিষ্ট প্রসবিনী বৃত্তির উদয় হয় না, একেবারে তাঁহার ঐহিক পারত্রিক সকল পথ জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হইয়া পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়।

প্রাচীনশিক্ষার-আধুনিক চেষ্টা।

ধর্ম্ম, নীতি, বুদ্ধি, দেহ প্রভৃতি লইয়া যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই সর্ব্বাঙ্গীন। পুরাকালে আর্য্যগণ সন্তানদিগকে সকল বিষয়ের উন্নতিমূলক শিক্ষা প্রদান করিতেন। ছাত্রগণ হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রাচ্য দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদ্বারা মানসিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতেন, অপর দিকে সেইরূপ ব্যায়াম শিক্ষাদ্বারা শারীরিক বল সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মই হিন্দুর মজ্জাগত, সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত। ইহা সমাজের সহিত—জীবনের সহিত এরূপ সংশ্লিষ্ট—এরূপ ওতঃপ্রোত অবস্থিত যে, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব অন্যের কার্য্যকরিত্ব থাকিতেই পারে না। অস্থি মাংসে যেমন সম্বন্ধ, বাক্য অর্থে যেরূপ একত্ব, মেধা বুদ্ধিতে যেপ্রকার নৈকট্য হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজীবনে সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দুসমাজের এমন নিকট সম্বন্ধ, যে হিন্দুধর্ম্মে আঘাত কর, হিন্দুসমাজ ধ্বংশ হইবে—সমাজের উপর হস্তক্ষেপ কর ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। বস্তুত হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ স্বতন্ত্র নহে—স্বতন্ত্র থাকিবার নহে। যেখানে হিন্দুধর্ম্ম আছে, সেখানে হিন্দু সমাজও আছে; যেখানে সমাজের মূল উৎপাটিত হইয়াছে, সেখানে ধর্ম্মচ্যুতিও ঘটিয়াছে। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মাচরণ করিলে লোকে সংসার যাত্রার অনুপযুক্ত হয়। কিন্তু সেটি বিষম ভ্রম; বরং ইহাতে মনুষ্যকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তাহাদিগকে পরিজন, সমাজে এবং দেশের অধিক কি সমগ্র মানবজাতির উন্নতিকল্পে বিশিষ্ট রূপে যত্নশীল করিয়া থাকে। পুরাকালে হিন্দুযাজকগণ লোকহিতপরায়ণ সাধু ছিলেন, মুনি ঋষিগণ দার্শনিক জীবন অতিবাহিত করিতেন, ক্ষত্রিয়গণ সংগ্রামে অসমসাহসী—অমিতবিক্রান্ত, বৈশ্যগণ অতুল সম্পত্তিশালী এবং জনসাধারণ রাজভক্ত, প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও জীবনে উন্নতিশীল ছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যতা বা নীতি বিষয়ে ঔদাস্যকে লোকে নীচতা ও অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া গণনা করিত—সেরূপ ব্যক্তিকে লোকে সম্ভ্রমসূচক, লাভজনক বা দায়িত্বশালী কার্য্যের নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষা

করিত। যে ব্যক্তি আপন বৃত্তির উপযোগী, এক কথায় স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত না হইতেন, সমাজে তাঁহার স্থানাভাব হইত। যে ভৃত্য প্রভুর কার্য্যে উদাসীন, যে বৈশ্য ধনসঞ্চয়ে অবহেলক, তাহারা, শত্রুকে পৃষ্ঠদর্শনকারী ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় অবজ্ঞাত হইতেন।

ধর্ম্মই ভারতের উন্নতির মূল ছিল এবং ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অবনতি সাধিত হইয়াছে দেখা যায়। এক দিকে ভারত সন্তানের পৈত্রিক সম্পত্তি ধর্ম্মরত্ন অপহৃত হইল, অন্যদিকে ভারতলক্ষ্মীও ছাড়িয়া গেলেন। বৈদেশিক প্রথম বিজেতৃবর্গ ভারত অধিকার করিলেও ভারতসন্তানগণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসচ্যুত হয়েন নাই—তখনও তাঁহাদিগের নৈতিক শিক্ষাপ্রবল ছিল। রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহাদিগের সান্ত্বনা স্থল—তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক ছিল। তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে কর্ম্মফল ভোগ করিতেন ও বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতিবীজ বপন করিতেন।

কিন্তু এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতে ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিল—আর এক প্রকারের শিক্ষা আসিয়া—ধর্ম্মহীন শিক্ষা আসিয়া ধীরে ধীরে ভারতের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিল, তাহার তীক্ষ্ণ আঘাতে ধর্ম্মবিশ্বাস খণ্ডিত করিল, নৈতিক জীবন বিদ্ধ করিল। যে শিক্ষাপ্রভাবে ইংলণ্ড উন্নতিমার্গে ধাবিত হইয়াছিল, বিজেতাগণ কৃপাপরবশ হইয়া সেই শিক্ষা বিস্তার পূর্ব্বক পাশ্চত্য রীতি নীতি ভারতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং বিজিত ভারতসন্তানগণকে স্বজাতির সমান অধিকার প্রদানে উদ্যুক্ত হইলেন। ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন ও ইংলণ্ডীয় যুবকবৃন্দের ন্যায় ভারতীয় জনসাধারণের সমান অধিকার প্রদান তাঁহাদিগের প্রকৃত অভিপ্রায়। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অকপট ব্যবহারে ভারতে বিভিন্ন বিপরীত বিষময় ফল প্রসূত হইল। হারো, ইটন, উইঞ্চেষ্টার, রগবি, অক্ষফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানে খৃষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেখানে সকল বালকই দীক্ষা শিক্ষায় খৃষ্টিয় ধর্ম্মভাব গ্রহণে সম্পূর্ণ তৎপর হয়। কিন্তু ভারতে সেই প্রণালীর শিক্ষার ফলে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষায় অবহেলা লক্ষিত হইতে লাগিল এবং একমাত্র সাংসারিক উন্নতি বিধায়ক শিক্ষা ধর্ম্মনীতি শিক্ষার স্থান অধিকার করিল। তজ্জন্য শিক্ষাদাতৃগণের উপর দোষারোপ করা যায় না। কারণ, শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থীগণের ধর্ম্ম বিভিন্ন;

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশিক্ষার একাংশ হইলে ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট অথচ ইংরাজ রাজপুরুষ-দিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, অপরন্তু ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা বিরুদ্ধ। যে, যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করে তাহা দ্বারা সেই ধর্ম্মের শিক্ষা হওয়া সম্ভব; অতএব ভিন্নধর্ম্মী রাজপুরুষগণ দ্বারা ধর্ম্ম বর্জ্জিত শিক্ষাপ্রদান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষা শিক্ষাপদবাচ্যই হইতে পারে না—তাহার যে পরিণাম অগত্যা তাহাই ঘটিতে লাগিল।

পুত্রদিগকে এই ওকারের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা হিন্দু পিতা, মাতা ও ধর্ম্মশিক্ষকগণের নিতান্তই অকর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক শিক্ষা পাইতেছে কি না, তাহার তথ্যানুসন্ধান তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যাবহেলনে ও বিদ্যালয়ে পারিতোষিক এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক উন্নতির প্রলোভনে সুকুমারমতি বালকগণের সমুদয় শক্তি ও উৎসাহ একমাত্র অর্থকরী বিদ্যালোচনাভিমুখে প্রধাবিত হইল। কয়েক পুরুষ ধরিয়া ধর্ম্মাভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধি, নীতিশিক্ষাভাবে মলিনবৃত্তি ভারতবাসীগণ, অনন্যসাধারণ ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, বিশাল সাহিত্য, শাস্ত্রাদি পৈত্রিক সম্পত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সদম্ভে মানীষিগণের যুগযুগান্তর সঞ্চিত জ্ঞান তাচ্ছল্য করিলেন, এবং কল্যকার নব সভ্যজাতির মত ও তাহাদের রীতি নীতি চালচলন শিক্ষা, তাঁহাদের স্থূলতম জড়বাদ, তাঁহাদের গর্ব্বিত স্থূল বিজ্ঞানাদি সংগ্রহে উৎসাহিত হইয়া দেশহিতৈষিতা, জাতীয়মর্য্যাদা, অভিমান বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন। যে সময়ে ভারতীয় যুবকগণ প্রাচীন ভারতকে চিতানলে দগ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ভবিষ্যত উন্নতি সোপান ভূমিসাৎ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন, ঠিক সেই সময়ে মাঃ ব্লাভাট্স্কী এবং কর্ণেল অলকট্ বীরনেতা আসিয়া অন্ধযুবক্‌দিগের অধঃপতনের পথে দণ্ডায়মান হইলেন—তাহাদের বিপদ বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের দুর্দ্দশা—হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে উত্তেজিত করিলেন। সুষুপ্ত আর্য্যসন্তানগণ তাঁহাদিগের আহ্বানে জাগিয়া উঠিলেন। তত্ত্বসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে দিবস তাঁহাদিগের গৌরবের নিদান মৃতসঞ্জীবন, কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সেই দিবস হইতেই সমগ্র ভারতে সমগ্র জগতে সনাতন ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনের সূত্রপাত হইল।

প্রকৃত ধর্ম্ম, নীতি, হিন্দু আচার ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষার অভাব অনুভব করিয়া তত্ত্ব সভার কয়েকজন চিন্তাশীল সভ্যের হৃদয় ব্যথিত হইল। সেই অভাব মোচনার্থ, উচ্চতম পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণের পবিত্র ধর্ম্ম, নীতি, আচার ব্যবহার শিক্ষা প্রদানার্থ তাঁহারা হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ৺ কাশীধামে একটি হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের সংকল্প করিলেন। যাহাতে ছাত্রগণের চিন্তা-শক্তির বিকাশ হয়, যাহাতে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান জন্মে, যাহাতে তাহারা আপনাকে আর্য্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হয়, যাহাতে আত্মনির্ভরক্ষম হয়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা, বিনয়াদি যাবতীয় আর্য্যগুণ, আর্য্যধর্ম্ম যাহাতে তাহাদিগের প্রকৃতিগত হইয়া, সমুদয় উচ্ছৃঙ্খলভাব তিরোহিত হয় এইরূপ শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইল।

যাঁহারা ছাত্রগণের ধর্ম্ম ও নৈতিকভাব পরিপোষণ করিবার জন্য ব্যাকুল যাঁহারা তাহাদিগকে সন্তানের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহ, যত্ন এবং সতর্কতা সহকারে শিক্ষাদান করিবেন এবং যাঁহারা আধুনিক অধ্যাপকগণের ন্যায় কেবল পুস্তকের অধ্যাপনা কার্য্য সমাধা করিয়া নিবৃত্ত থাকিবে না, যাঁহারা হিন্দু রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, বিনয়, গুরুজন ভক্তি প্রভৃতি শিষ্যগণের মর্ম্মে মর্ম্মে বসাইয়া দিবার জন্য অকপটে চেষ্টা করিবেন, এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত এবং অধ্যাপনা কার্য্যে পারদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিই অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়া শিক্ষকের কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি।

বালককাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল। এই প্রবাদের মূলে কিছু সত্য আছে কি না কখন অনুসন্ধান করি নাই। ব্রাহ্মণেরা তপোবলে মহা তেজস্বী ছিলেন, কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া সে তেজের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণে রীতিমত ধর্ম্মসাধন করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই শূদ্রাচারী অথবা ম্লেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রতাপ এখন শ্রাদ্ধসভায় অথবা গ্রাম্য দলাদলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এপ্রকার ছিল না। তখন ব্রাহ্মণেরা রীতিমত বর্ণোচিত সাধনাদি করিতেন এবং তেজস্বী ছিলেন। এই কারণেই ঐরূপ প্রবাদ এখনও রহিয়াছে। তপোবলে প্রকৃতই মহাতেজস্বী হওয়া যায়, তাহা এখনও সাধকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোক এখন অতি বিরল, কিন্তু একেবারেই লোপ হয় নাই। আমি একজন ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি দেখিয়াছিলাম, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিষয় কার্য্য উপলক্ষে আমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে কোন করদ রাজ্যে বাস করিতাম। এক দিন শুনিলাম রাজবাটীর কিছু দূরে নদী তীরে একজন সাধু আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রথযাত্রীর মত লোক যাতায়াত করিতেছিল। আমারও দেখিবার জন্য কৌতূহল হইল। একজন বন্ধুর সহিত সাধু দর্শনে বৈকালে যাত্রা করিলাম। যাইয়া দেখিলাম, নদীতীরে একটি বৃক্ষতলে একজন অতি প্রাচীন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাহার নিকটে স্তূপাকারে নানা প্রকার ফল রহিয়াছে। তিনি ফল মাত্র আহার করেন বলিয়া লোকে সেই স্থানে ঐ সকল ফল রাখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা যাইয়া দেখিলাম সাধু ঐ সকল ফলের মধ্যে কতকগুলা তেঁতুল লইয়া পিণ্ডাকার করিয়া ভক্ষণ করিতেছেন এবং নিকটস্থ কয়েকটি গাভিকে খাওয়াইতেছেন। আমাদেরও এক এক ডেলা তেঁতুল খাইতে দিলেন। ঘোর বিপদে পড়িলাম। তাঁহার অনুমতি লইয়া তেঁতুল

গুলি পকেটস্থ করিলাম। ক্রমে নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। লোক জন সকলে চলিয়া গেল, কেবল আমি ও আমার বন্ধু মাত্র তথায় থাকিলাম। বাবাজী ধুনী জ্বালিবার উপক্রম করিলেন। সঙ্গে একটি ছোট কুড়ালি ছিল, তাহার দ্বারা কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কাষ্ঠখণ্ড গুলি ধুনিতে সাজাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া একবার ফুৎকার দিলেন। দেখা গেল, কাষ্ঠের উপর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। দ্বিতীয় বার ফুৎকার দিতে সমস্ত কাষ্ঠ একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। আমরা অবাক্। পূর্ব্বে সে স্থানে অগ্নি দেখি নাই, কেবল মাত্র কতকটা ভস্ম পড়িয়াছিল। তাহাতে অগ্নি ছিল না।

অন্য কথা না কহিয়া সাধু শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হওয়ায় আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম। পর দিন তথায় যাইয়া শুনিলাম তৎপ্রদেশস্থ রাজার মাতা তাঁহাকে বাটীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু সাধু যাইতে নারাজ। বলিলেন, তাঁহার সেখানে যাইবার কিছু প্রয়োজন নাই, রাজমাতার যদি কিছু আবশ্যক থাকে, তাঁহার নিকট আসিতে পারেন। তাঁহার পাথেয় জন্য রাজবাটী হইতে কিছু টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহাও লন নাই। অনেক অনুরোধের পর বলিয়াছিলেন যে, তিনি অর্থ লইবেন না, তবে যদি রাজ পরিবার তাঁহাকে পাথেয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার গন্তব্য স্থানের একখানি রেলওয়ে টিকিট খরিদ করিয়া তাঁহাকে দিতে পারেন। সন্ন্যাসীর কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তাঁহার যোগশক্তির অন্য পরিচয় পাই নাই, তবে ফুৎকার দ্বারায় কাঁচা কাঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে দেখিয়াছি। যাহা সন্ন্যাসীরা এখনও পারেন, তাহা যে পূর্ব্বে ছিল না, তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল, এখন আমাদের মুখে ছাই।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

সরস্বতী-বন্দনা।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

শ্বেত-বরণা বীনাপানী, শ্বেত-বসনা সুর-ঈশ্বরী, সরস্বতী
জ্ঞানদায়িনী।
শ্বেত সরোজ বাসিনি, নারায়ণী পরম বৈষ্ণবী জয় প্রণত-জন-পালিনি;
মধুর বীণা যন্ত্রধারিণী।
অজ্ঞান-তিমির-নাশিনি, ইন্দু-বদনা যক্ষ রক্ষ সুর নর-পূজিতা
মহা-বাগ্-বাদিনী।
তুমি সকল-কণ্ঠ-নিবাসিনি, জননী, মধুর সুর তান গমক
মূর্চ্ছনা লয়, আশ কৃন্তন সৃষ্টি কারিণী।

সুমেরু প্রমান ধন অধিপতি যদিনর, কন্দর্প সমান কান্তি হয় তনু মনোহর, বিহীনে করুণা তব, বৃথা সে বিভব সব, (তা'র) সরেনা বাক্ বদনে, কাঁদে সে দিবা রজনী।

নহিলে করুণা তব সাধ্য কা'র ত্রিভুবনে,
প্রকাশে আপন ভাষা সুখে যত জীবগণে,
দীন রাম ভণে, সদা বাঞ্ছা মনে,
সারদে! বরদা ভব এ অধম অভাজনে,
সেবকে তারিলে যশঃ রহিবে তব ভুবনে,
করুণা করি চরমে চরণে রেখ জননি।

শ্রীরামলাল দত্ত।

উত্তরাখণ্ড।

চিন্তামণি অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন। "আজ্ঞা হা! ইহাতে সর্ব্বাগতিক একত্বভাব, সকল সত্তায় পরস্পর সম্বন্ধ ও আপেক্ষিক ভাব সুন্দররূপ বুঝিতে পারা গিয়াছে। ইহাতে প্রথমতঃ মানব ভ্রাতার উপর প্রেমভাব বর্দ্ধিত হয়, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত জাগতিক বস্তুর উপর কেমন একটু সম্ভ্রমের উদয় করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে যাবতীয় বর্ত্তমান বস্তুই অস্তিত্বের অধিকারী; কারণ সেই অস্তিত্বে উপরই তাহাদিগের পরিস্ফূরণ নির্ভর করিতেছে। কোন জীবের অস্তিত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিলে তজ্জীবনের অভিজ্ঞতা লাভান্তর উন্নতি করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম আবশ্যক হইয়া পড়ে।"

মহা। "যথার্থ কথা। ভবিষ্যতে জন সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য তোমার এই রূপ চিন্তা শক্তি আবশ্যক হইবে। যে মানুষ একটা অশ্বকে নির্দ্দয় রূপে কষাঘাত করে, সেও এক কালে সেই অশ্ব ছিল, এবং কালে সে অশ্বও তাঁহার বর্ত্তমান উপাধি লাভ করিবে। মনুষ্য ইতর প্রাণীগণকে বধ করিয়া তাহাদিগের উন্নতি মার্গে অনর্থক বিলম্ব ঘটায়। আত্মরক্ষা ব্যতীত যদি এইরূপ জীব ধ্বংশ করিলে নিঃসন্দেহ দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

চিন্তামণি বালজীবনে মৃগয়ায়ক্ত ছিলেন, সে সময়ে অনেক পশু পক্ষীর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন; এজন্য কহিলেন "ভয়ানক সত্য।" মহা। "ক্রম স্ফূরণের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক জীবেরই কর্ম্মফল ভোগার্থ কিছু কিছু নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। আমাদিগের ন্যায় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ অধিক কি উদ্ভিজ্য জগতেরও অদৃষ্টফল ভোগ অপরিহার্য্য।

চিন্তা। এ সকল দার্শনিক বিষয় উচ্চ শ্রেণীর নীতি পূর্ণ। কোন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছিলাম কাহারও প্রাণ নাশ করিলে, আত্মহত্যা করা হয়, চৌরের ধন অপহৃত হয়—অর্থাৎ জন্মান্তরে চৌরকে দারিদ্র ভোগ করিতে হয়, এখন ইহার অর্থ বুঝিলাম।'

মহা। "এক চৌর্য্য বলিয়া নহে; কুৎসা গ্লানি, অসহিষ্ণুতা তিতিক্ষাভাব নির্দ্দয়তা ঘৃণা প্রভৃতি যাবতীয় অপরাধের পরিণাম এইরূপ।"

চিন্তা। "এই দার্শনিক মতদ্বারা সকল দেশেরই বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ হিতকারী নৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হইতে পারে।"

মহা। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, ইহা পার্থিব জীবনের নৈতিক বিধির ভিত্তি স্বরূপ। তুষার খণ্ডের দৃষ্টান্তে ও জগৎ সৃষ্টির নিয়মালোচনায় যেরূপ ক্রম বিকাশবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে, আর একটু অগ্রসর হইলে কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবন স্রোত উচ্চতর প্রদেশে পরিচালিত করিবার নিয়ম সংস্থাপন করা যায় না।

চিন্তা। বিবর্ত্তবাদ ও ক্রম বিকাশের নিয়ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জগৎকারণ বা জগতের সত্য নিত্য শক্তি, অদৃশ্য ও অননুভূত ভাবে অসত্য, অনিত্য ও ক্ষয়শীল দৃশ্যমান ভূত গ্রামকে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিচালিত করিতেছেন।"

মহা। "এই সত্য আমাদিগের নিজের উপর প্রয়োগ করিলে বুঝিতে পারিবে, যে, আমাদিগের স্থূল দেহ যথার্থ মনুষ্য নহে। সেই শক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, এই স্থূল শরীরকে অদৃশ্যভাবে পরিপোষণ করিতেছে, উচ্চরাজ্যে লইয়া যাইতেছে এবং পরিণামে চরমাবস্থায়, (জগৎ কারণ সমীপে) উপস্থিত করিবে। এই মহোপকারী মহাশক্তিই সেই আত্মা সেই আদ্যাশক্তি। সেই আত্মাই প্রকৃত ও অবিনাশী মনুষ্য, এবং নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করিবে।

প্রাতঃকালে অন্যান্য মনে যে চিন্তা করা যায়, অপরাপর চিন্তা উপস্থিত হইলেও সেই প্রাতঃকালীন চিন্তা সমস্ত দিবস প্রবল থাকে। এই জন্যই একান্ত মনে "অহং দেবো নচান্যাস্মি ব্রহ্মৈবাহং নশোকভাক্ সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্" চিন্তা করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতে হয়। ইহার নাম অভ্যাস যোগ। এই অভ্যাস যোগ, হিন্দুর আহারে, বিহারে, শয়নে জাগরণে সকলে কার্য্যই। যাহা নিরন্তর অভ্যাস করা যায়, তাহা প্রকৃতিস্থ হইয়া যায়। যখন ঐ অভ্যাস প্রকৃতিস্থ হইবে, তখন সত্য সত্যই "নিত্য মুক্ত স্বভাব বান্" হইয়া যাইবে। কিন্তু মনকে চোক্ ঠারার কাজ নহে।"

চিন্তা। "ইহার আবার মনকে চোক্ ঠারা কিরূপ?"

মহা। "শুদ্ধ মুখের কথা হইলেই, লোকে মনকে চোক্ ঠারা বলে।"

এখানে একটী গল্প মনে পড়িল। একটী ব্রাহ্মণ কুমার প্রত্যহ প্রত্যুষে একটী নদী পার হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া আইসে। তাহার গুরু অধিক বেলায় নৌযোগে নদী পারে গিয়া দেখেন বটু সমুদয় পুষ্প লইয়া গিয়াছে। একদা তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অধিক বেলা না হইলে ঘাটে নৌকা পাওয়া যায় না। তুমি কিরূপে প্রত্যুষে পর পার হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া আইস। বালক উত্তর করিল "আপনিই তো আমাকে মন্ত্র দান কালে বলিয়া ছিলেন যে, আন্তরিক ভক্তি সহকারে অন্তরের সহিত এই মন্ত্র জপ করিলে সকল কর্ম্মই সুসাধ্য হয়—ভবনদী পার হওয়া যায়; আমি আপনার প্রদত্ত মন্ত্র প্রভাবেই এ সামান্য নদী কেন পার না হইতে পারিব।" গুরু কহিলেন "কল্য তুমি যাইবার সময়ে আমকে সঙ্গে লইয়া যাইও।" পর দিবস তথানুষ্ঠিত হইলে, গুরু শিষ্যকে অগ্রগামী হইতে কহিলেন। শিষ্য অনায়াসে নদী পার হইয়া অপর পারে গিয়া দেখিল গুরু তখন ও বহু পশ্চাতে থাকিয়া যত অধিক জলে যাইতেছেন ততই বস্ত্র তুলিতেছেন। তদ্দর্শনে শিষ্য কহিল "যখন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন তখন ডুবিবার বা বস্ত্র আর্দ্র হইবার ভয় কেন করিতেছেন? হরি ও বলিবেন কাপড় ও তুলিবেন তাহা হইলে মন্ত্রের প্রভাব মন্ত্রে বিশ্বাস কোথা রহিল?" বাস্তবিক কথাও তাহাই দৃঢ় বিশ্বাসে চিন্তা করা আবশ্যক,মুখে "নিত্য মুক্ত স্বভাববান্ বলিলে হয় না আবৃত্তি মাত্রে কার্য্য হয় না, সেইরূপ চিন্তা করা আবশ্যক। চিন্তা ও কর্ম্ম রূপ অভ্যাস দ্বারা তত্তদাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকাংশ লোকই এইরূপ না করায় কোন ফল না পাইয়া শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিয়া থাকে।"

চিন্তা। "নীতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে প্রত্যক্ষ।"

মহা। 'তোমাদিগের খৃষ্টীয় শকারম্ভের বহু সহস্র বৎসর পুর্ব্বে হিমাদ্রির নিভৃত পবিত্র ধর্ম্ম মন্দিরে এই উন্নত ধর্ম্ম নীতি সংস্থাপিত ও উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে।"

''এই সকল চিন্তা দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে; দেহের আশা মিটাইবার জন্য যে শ্রম করা যায় সেটা ভূতের ব্যাগার খাটা মাত্র। উহা আত্মার উপকারার্থ নহে—আত্মার নিকট দিয়াও যায় না। আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে বলা যাইতে পরে যে প্রকৃত মানুষের বিষয় ধরিলে, দেহের

আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে যে পরিশ্রম করা যায়, সেটা অনর্থক সময়াতিপাত মাত্র। অথবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গেই একটী ক্লেশ—একটা অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়—এক প্রকার প্রবঞ্চিত হওয়ার আভাস পাওয়া যায়, ইহাতে বুঝা যায় যে, এ দেহ আত্মার কারাগার মাত্র।

যে সকল জীব স্বাধীন ইচ্ছা বিবর্জ্জিত. তাহাদিগের আভ্যান্তরিক শক্তি সাধারণ নিয়মে পরিচালিত হইয়া স্বতঃই ক্রম বিকাশ মার্গের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপস্থিত হয়। বাহ্যিক অবস্থা বিশেষ দ্রুততা বা বিলম্ব সংঘটন হইলেও সকল অচেতন পদার্থ ও সমস্ত ইতর প্রাণীই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্ব নিয়মে বাধ্য হইয়া চলিয়া থাকে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা থাকা প্রযুক্ত মানব সেই আন্তরিক শক্তিকে ব্যহত করিয়া কখন কখন অকর্ম্মণ্য করিয়া স্বকীয় উন্নতি মার্গ রুদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিপোষণ, দৈহিক আশা পরিতৃপ্তি, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি দ্বারা ক্রম বিকাশ শক্তি ধ্বংশ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যের প্রকৃত প্রার্থনা পরিস্ফুট হইতে না দিয়া আত্মাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নির্জ্জন কারাবদ্ধ করিয়া তুলে॥"

চিন্তামণি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন। ''হায়! এই দুঃখময় সংসারে এই ব্যাপারই অধিক। লোকে মায়াবশতঃ এ সত্য বুঝিতে পারে না কেহ বা বুঝিয়াও বুঝে না।

মহা। ''এখন দেখা গেল যে, আমাদিগের আত্মাই প্রকৃত মনুষ্য। যদি আমরা সুখ শান্তি লাভ ইচ্ছা করি তবে চিন্তা দ্বারা আত্মার প্রার্থনা অবগত হইয়াও তাহা গ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী ও পরব্রহ্ম লাভাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংসারে বন্ধন শিথিল হইতে থাকে।

যাঁহার নিকট কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ করা যায় তিনিই গুরু পদবাচ্য প্রথমাবস্থার মনুষ্যের সংসারই গুরু—সংসারই আত্মীয় স্বজন শত্রু, মিত্র। সেই সংসার রূপ আত্মীয়, স্বজন ভীষ্ম দ্রোণকে সেই কাম ক্রোধাদি জ্ঞাতি রিপুনিচয় দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিতে না পারিলে জয়লাভের আশা বৃথা। এ কুরুক্ষেত্র সমর প্রথমে ভীষণ হইলেও গাণ্ডীবধন্বার ন্যায় রথী ও শ্রীভগবানের ন্যায় সারথী হইলে জয়লাভে অষ্টাদশ দিবসের অধিক লাগে না। তখন

দেখিতে পাই আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খলেই ধাবিত হইতেছি।

পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই আমাদিগের সারথ্যের নিমিত্ত উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছেন; অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদিগের যুদ্ধ কৌশল পরিজ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক যদি এক মাত্র সেই শ্রীমুখের উদ্দেশেই আমরা ভক্তি সহকারে শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেই আমাদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী সেই শ্রীমুখের কথায় ভক্তি জন্মিলেই আমাদিগের এই দুর্ব্বল বাহু গাণ্ডীব ধারণক্ষম হইবে, দ্বিবাহু হইয়াও আমরা কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় সহস্র বাহু হইব। তখন দেহ কুরুক্ষেত্রেআমাদের জয়লাভ হইবে। আমার এই দৃষ্টান্তে হয় তো তুমি মহাভারতকে রূপক মনে করিবে, কিন্তু বাস্তবিক উহা বিশুদ্ধ রূপক নহে। স্থূল জগতে বাস্তবিক মানুষীতনুমাশ্রিতম্ শ্রীভগবানকে সারথী করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুন পরাস্ত করিয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সেইরূপ—জীবাত্মা রথীর রথে পরমাত্মা সারথী হইয়া তাঁহাকে সংসার রূপ আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব পিতামহ গুর্ব্বাদি সকলকে পরাজয় পূর্ব্বক সেই সূত্রাত্মকে শান্তি রাজ্যের সুখ সম্ভোগে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে বুঝিয়া লইতে হইবে প্রত্যেক কার্য্যই স্থূল সূক্ষ্মাদি ক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, মহ জন তপঃ ও সত্য সপ্তলোকেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম যেমন স্থূল জগতে ঘটিয়া ছিল, সেইরূপ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর অন্তরেও পরে পরে সপ্তলোকে ঘটিয়া আমাদিগকে অধিক হইতে অধিকতর শান্তির অধিকারী করিয়া তুলে এবং সত্যলোক নির্ম্মল, অবিমিশ্র শান্তি প্রদান করে।

এই সকল উপদেশ প্রথম পর্য্যায়ের অধিকারীগণের জন্য স্থির হইয়াছে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। প্রথম পর্য্যায়ের অনুশীলনে স্থূল ভূত সৃষ্টি ও ক্রম-বিকাশের নিয়ম অবগত হওয়া যায়—অর্থাৎ এক হইতে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি ও তাহাতে লয় প্রাপ্তি উপলব্ধি হইয়া থাকে।

"উক্ত নিয়ম হইতে নিম্ন লিখিত নীতি শিক্ষা লাভ করা যায়।

"১ম। সর্ব্ব জাগতিক ভ্রাতৃভাব;

"২য়। সর্ব্ব সত্ত্বায় আদর বা ঘৃণা রাহিত্য;

"৩য় নিত্য ও সত্য জ্ঞানারম্ভ;

"৪র্থ। অনিত্য ও অসত্য জ্ঞানারম্ভ;

"৫ম। নিত্য সত্যের আলোচনা;

"৬ষ্ঠ। অনিত্যের প্রকৃত ও উপকারিণী শক্তির আদর ও সদ্ব্যবহার।

"এ সমুদার কি তোমার মতের সহিত ঐক্য হইতেছে? যে গূঢ় ঐশী নিয়ম বিবৃত হইল তদনুসারার্থ তোমার মন ব্যগ্র হইয়াছে কি?' চিন্তামণি অতি ব্যগ্র ভাবে উত্তর করিলেন—"অদ্যকার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া আমি বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ফলতঃ বহু দিবস হইতেই এই পন্থাবলম্বনে আমার ইচ্ছা আছে তবে এতদিন যথার্থ পন্থা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিকট এই সমস্ত নূতন বোধ হইলেও পারমার্থিক পন্থা বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আরও বিশদ ব্যাখ্যা ও গভীর চিন্তার প্রয়োজন। আমি এখানে আসিয়া বড়ই প্রীত এবং এই নিভৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ লাভ করায় মহাত্মাগণের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়াছি।"

মহাত্মার সঙ্কেতে চিন্তামণি অপর দীক্ষার্থীগণের সহিত বেদির উপর আরোহণ করিলেন। তিনি দীক্ষার্থীগণকে পরাইবার জন্য দীক্ষার চিহ্ন স্বরূপ কয়েকখানি গৈরিক বসন বামপার্শোবিষ্ট মহাত্মার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি একখানি চিন্তামণিকে পরিতে দিলেন। তৃতীয় মহাত্মা কয়েকটী যন্ত্র চিত্রিত একখণ্ড চতুষ্কোণ বস্ত্র রজ্জুদ্বারা তাঁহার গলদেপে বন্ধন করিয়া দিয়া কহিলেন,—"এখানি একখানি কবচ। সকল মহাত্মা একত্রিত হইয়া ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ইহাতে এবম্বিধ ওজঃপুঞ্জ সঞ্চারিত করিয়াছে যে, যতদিন তুমি ইহা ধারণ করিবে ততদিন শত্রুজয়ী হইবে, অর্থাৎ তোমার আত্মার শত্রু তোমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি দীক্ষিত হইয়াছ, এক্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে তোমার নিকট প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইবে বিবিধ প্রকারে তোমার আত্মার পরীক্ষা করিবে। জ্ঞানদ্বার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে অদ্য রাত্রে তোমার নিকট তামস্‌রাজ্যদ্বার—নরকের দ্বারও উন্মুক্ত হইল; তথা হইতে পিশাচগণ দলে দলে নির্গত হইবে। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি ও অচল বিশ্বাস স্থাপন করিবে; তাহাদের আক্রমণ কালে এই কবচ হস্তে লইবে কপোল সংলগ্ন করিলে আরও উত্তম এবং নিরন্তর প্রণব উচ্চারণ করিবে। প্রণবের উচ্চারণ ওঁ অ-উ-ম্ গম্ভীরস্বরে বারংবার বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত হইলে

এই শব্দ হইতে যে সকল স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহারা অবিশুদ্ধ ওজপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া মনকে বিশোধিত করে, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়াসক্তি দূর করে এবং পিশাচ-গনের অসৎ প্রস্তাবে ব্যাঘাৎ উৎপাদন করে। বাস্তবিকই পিশাচেরা প্রত্যক্ষী-ভূত হইয়া অবিশুদ্ধ ওজঃপুঞ্জ অবলম্বন করিয়া সাধককে মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রণব উচ্চারণে অবিশুদ্ধ ওজঃ বিনষ্ট হইলে, তাহারা মোহিত করিবার উপায় ভ্রষ্ট হয়। তাহাদিগের আক্রমণ সহজ নহে; কারণ মনুষ্য যখন দুর্ব্বলকায়, নৈতিক বল শূন্য ও বিকল চিত্ত হয় অর্থাৎ যখন শারীরিক বল, বুদ্ধিবৃত্তি ও অধ্যাত্মিক চিন্তার হ্রাস হইয়া আইসে, তখনই তাহারা প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া থাকে।"

"এক্ষণে একটু মনোযোগ সহকারে ঠিক আমার উচ্চারণানুরূপ উচ্চারণ করিবার চেষ্টা কর; এই বলিয়া মহাপুরুষ চক্ষু মুদিত ও মস্তক উন্নত করিয়া, মুখব্যাদান পূর্ব্বক বীর-গম্ভীর স্বরে প্লুত "অ" তৎপরে ক্রমশঃ মুখ সঙ্কোচ করিতে করিতে প্লুত "উ" ও অবশেষে হসন্ত "ম" উচ্চারণ করিলেন। যতক্ষণ চিন্তামণি বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ না হইলেন, তাবৎ তিনি বারংবার ঐরূপ করিতে লাগিলেন,—প্রত্যেক বারে অন্ত্যবর্ণটী দীর্ঘতরকাল উচ্চারিত হইতে লাগিল। উচ্চারণের মধ্যে যেন কেমন একটু হৃদয় উল্লাসকারী ধ্বনি নির্গত হইতেছিল। মহাপুরুষ কহিলেন,—"এই শব্দ প্রলয় অবস্থার পরব্রহ্ম-স্বরূপ। অতি প্রাচীনকালে ঈশ্বর সালোক্য প্রাপ্ত মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক এই শব্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। যে অবস্থা হইতে উৎপন্ন হউক না কেন, অবিশুদ্ধ ওজঃপুঞ্জ মাত্রেই ইহার স্পন্দনে বিনষ্ট হইয়া যায়।"

"পিশাচগণ সন্নিহিত না হইলে, অথবা আমাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ব্যতীত এই পবিত্র ঘোর শব্দ উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করা নিষেধ।"

ক্রমশঃ।

২য় ভাগ। } ফাল্গুন ১৩০৫ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

মা।

"সৎসঙ্গ" নামক মাসিক পত্রিকাতে একটি পদ্য প্রকাশ হইয়াছে উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"রন্ধনে পাচিকা সেবায় দাসী
নিভৃতে রসিকা কত রস হাসি।
স্নেহেতে জননী আশঙ্কা ময়ী,
বিপদে মন্ত্রিনী গ্লাডষ্টোন জয়ী।
যথাকালে পুনঃ ধর্ম্মকৃত দারা
প্রেমের আফিসে রেজেষ্টারী করা।

পুণ্যকাজে সেই সহধরমিণী
একত্র কর্ম্মেতে নিপুণা সঙ্গিনী।
পিতামহী বুড়ী ভোজন বেলায়,
খাও খাও বলে কত আগুলায়।
সন্তান পালনে কোথা লাগে আয়া
বল কার এই বহুরূপী মায়া ?
হিন্দুকুল নারী বিনা কোথা আর
একই আধারে দশ অবতার ?

পদ্যটি বেশ। কিন্তু হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া, জননী শব্দটি দারা শব্দের সহিত এত পৃথক্ ভাবে বলিতে ও শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, পদ্যটিতে একই আধারে উক্ত দুই শব্দের প্রয়োগ একেবারে ভাল লাগিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম বাবু প্রথমে স্ত্রী সম্বন্ধে জননী শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর গুণ স্মরণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন সূর্য্যমুখী স্নেহেতে জননী। ছেলেবেলা যখন উহা পড়িয়াছিলাম তখন ঐ কথার ভিতর কবিত্বই দেখিয়াছিলাম ; কিন্তু এখন দেখি যে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে "মা" শব্দটি "স্ত্রী দারা ইত্যাদি শব্দ" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখাই নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে ক্ষেত্রে "মা" শব্দ একবার প্রযুক্ত হইবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী শব্দ আর কখনও যেন প্রযুক্ত না হয় এই শিক্ষা হিন্দুর ঘরের ছোট বড়, ভদ্র অভদ্র সকলেই শিখিয়া রাখিয়াছে। 'মা' নাম সাধনার ইহাই প্রথম সোপান। হিন্দুর কাছে 'মা' শব্দ এত অধিক পবিত্র যে যদি কোন স্ত্রীকে একবার 'মা' বলিয়া ডাকা যায় তবে তাহার সহিত পরে রমণ করিলে মাতৃহরণের পাপ হয়। এই পাপের আশঙ্কা হিন্দু মাত্রেরই অস্থি মজ্জায় এমন দৃঢ় নিহিত যে অতি সামান্য লোকেও স্ত্রীর সম্বন্ধে মাতৃ শব্দ প্রয়োগ করিবার কথা হইলেই জিব কাটিয়া শিহরিয়া উঠে। যদি সেই স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া থাকে তবে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাকে আর স্ত্রী ভাবে দেখিতে পাইবে না ইহাই হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া শিখিয়াছি ; ইহা কি কেবল কুসংস্কার ? অনেকে বোধ হয় মনে করিয়াছেন যে ইহা কোন কুসংস্কার মাত্র ; পদ্যে ও নভেলে মাতৃ বাক্য শব্দ স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখিয়া 'মা' ও 'স্ত্রী' শব্দের পার্থক্য রক্ষা করিতে যাও-

য়াটা কুসংস্কার, এইরূপ ধারণা কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়াছে। নব্য কৃতবিদ্য কোন কোন লোকের মুখে আমি এইরূপ শুনিয়াছি, যে তাঁহারা স্নেহময়ী স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে সঙ্কুচিত হন না। ইহা উন্নতি না অবনতি ? 'মা' শব্দ ও 'স্ত্রী' শব্দের প্রয়োগ ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ পার্থক্য রক্ষা করা যদি কুসংস্কার হয় তবে নব্য কবিরা, ভাবের বলে যদি স্ত্রী সম্বন্ধেও জননী শব্দ প্রয়োগ করিতে চান তবে কোন আপত্তি করা উচিত নহে। আমরা কিন্তু বুঝি যে উহা কুসংস্কার নহে।

এক একটি কথা এক একটি সমাজে মন্ত্র স্বরূপ থাকিয়া সমাজে আধিপত্য করিয়া থাকে। সেই কথাটির শক্তি যখন হ্রাস হইয়া যায় তখন সমাজও হীনবল হইয়া ক্রমে মরিয়া যায়। 'মা' শব্দটি হিন্দু সমাজের ঐরূপ একটি মহামন্ত্র। স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে অন্য অন্য সমাজে শিক্ষা দেয়, কিন্তু স্ত্রীলোককে মাতৃ ভাবে ভক্তি করিতে হিন্দু সমাজ শিক্ষা দেয়। তাই বহুকাল হইতে হিন্দু শিখিয়া আসিতেছে যে, যে স্ত্রীকে একবার 'মা' বলিয়া ডাকিবে তাহার প্রতি যেন কামভাব কখনও ন্যস্ত না হয়। এইরূপ মা শব্দের সহিত, কামের নিবৃত্তি ভাবের সংযোজনা করিতে শিক্ষাই হিন্দুর কাছে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। হিন্দু সমাজে এই শিক্ষাটি আছে বলিয়াই হিন্দু সমাজ এখনও জীবিত আছে নহিলে রোম গ্রীস মিশরের ন্যায় হিন্দু জাতির চিহ্নও এত দিন থাকিত না। জাতির অভ্যুত্থান ও পতন জাতীয় কর্ম্মের ফল। যে সমাজে ব্যভিচার দোষ অধিক মাত্রায় উপস্থিত হয়, সেখানে উহার পতন উক্ত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল। এক 'মা' মন্ত্রই হিন্দু সমাজকে সেই ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করিতেছে। হিন্দু সমাজে পুরুষ যদি কোন স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া ডাকেন তবে সেই স্ত্রী, সেই পুরুষের সঙ্গে নির্জ্জনেও কথোপকথন করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হন না ; কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে যে পুরুষ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছেন তিনি তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিবেন না। 'মা' শব্দের সঙ্গে সমাজের স্ত্রীলোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে ; স্ত্রীলোকের এই বিশ্বাসই 'মা' শব্দের শক্তি।

পুরুষের প্রতি, স্ত্রীলোকের বিশ্বাস সংস্থাপক 'মা' শব্দটির শক্তি তোমরা কেহ হ্রাস করিবার চেষ্টা করিও না। যদি বল যে স্ত্রীও মাতৃ শব্দ বাচ্য হইতে পারে, তাহা হইলে, যাহার সম্বন্ধে মাতৃ শব্দ একবার প্রয়োগ করা যায় তাহার

সহিত স্ত্রী সঙ্গ যে একেবারে নিষিদ্ধ একথা আর রহিল না। তোমার কাছে 'মা' শব্দটি শক্তি হীন হইয়া গেল। তুমি অন্য স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া ডাকিলেও সে তোমাকে আর বিশ্বাস করিবে না। তোমরা সকলে যদি 'মা' শব্দটিকে এইরূপ শক্তিহীন কর তবে সমাজ অধঃপতিত হইবে। হিন্দু সমাজরূপ বৃক্ষের অধিকাংশ শিকড় শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু প্রধান এই 'মা' মন্ত্ররূপ শিকড়টি আছে তাই বৃক্ষটি এখনও সজীব রহিয়াছে; তাই এখনও ব্যভিচার দোষরূপ কীট সদলে উহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। 'মা' মন্ত্রটির শক্তিহীন হইলে, তোমার খুড়ি, জেঠাই, ভ্রাতৃবধূ ও পুত্রবধূ, এবং তোমার প্রতিবাসিনী যাহাকে 'মা' বলিয়া থাক তাহারা আর তোমাকে বড় বিশ্বাস করিবে না; তুমি যে উহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অসমর্থ, উহারা এখন ইহাই বুঝে, কারণ তোমার মুখ উচ্চারিত 'মা' শব্দের সহিত ঐরূপ বিশ্বাস উহাদের মনে গাঁথা আছে। বল দেখি ঐ বিশ্বাসটি যদি নষ্ট হয় তবে তুমি সুখী হইবে কি দুঃখী হইবে। শুধু দুঃখের কথা কি বলিতেছি এই 'মা' শব্দ যাঁহার কাছে শক্তিহীন হইয়াছে তাঁহার সবেগ অধঃপতনের আশঙ্কা বড় প্রবল। 'মা' মন্ত্রকে শক্তিহীন করিও না। যাঁহাকে একবার 'মা' বলিয়া ডাকিবে তাঁহার সহিত রমণেচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে হিন্দু সমাজের এই শিক্ষা কুসংস্কার মনে করিও না।

এত গেল সমাজের কথা; বাহিরের কথা। ভিতরের কথা দুটা এইখানে বলি। সাধক, যদি মা আনন্দময়ীকে চাও তবে নিজের ইন্দ্রিয় গুলাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না; তাহারা দিনকতক তোমার অধীনে থাকিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিবে যে তুমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইয়াছ; আর যাই তোমার ঐ অহঙ্কার টুকু উপস্থিত হইবে, তখন উহারা ছদ্মবেশী কামকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তোমার নিজের ক্ষমতায় সেই শত্রুকে সংহার করিতে পারিবে না সুতরাং প্রথম হইতেই একখানি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখ। "মা" নাম সেই অস্ত্র। এই অস্ত্র দেখিলেই শত্রুগণ ভয়ে পলাইবে।

মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা। কুণ্ডলী সূত্রে গ্রথিত মালার অনুলোমে ৪, ৬, ১০, ১২, ১৬, ২ ক্রমে মা নাম জপ; আবার বিলোমে জপ, মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা। দুই ষোল বার দশ ছয় চারি। সাবধান সাবধান যেন মাতৃযোনি লঙ্ঘন না হয় জপ জনিত সমস্ত তেজ নষ্ট হইবে। মহা অন্ধকার মধ্যে যে আলোটুকু খুঁজিতেছ তাহা পাইবে না।

মাতৃযোনি বা আত্মযোনি কি তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। যাহা শুনিয়াছি তাহারই দুই এক কথা বলি। শক্তির উদ্ভব ও লয় স্থানের নাম মাতৃযোনি। এই শক্তি অর্থ কুণ্ডলিনী শক্তি। শিবলিঙ্গ যে যোনি পীঠ উপরে আছেন উহার উত্তরাগ্রভাগ মাতৃযোনি দ্বার। ইহার অপর নাম মেরু। ইহা জপের মালা থুবনী। এই মাতৃযোনি বা মেরু কদাচ লঙ্ঘন করিও না। ইহা স্বরের বিরাম স্থল। প্রণবধ্বনি এই স্থল হইতে উদ্ভূত হইয়া এই স্থলেই লয় হয়। এই লয় স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আনন্দ স্রোত স্বরূপ প্রণবধ্বনি শুনিতে থাক এবং গুরুকে বল তিনি ডমরু বাজাইয়া তাল দিতে থাকুন। তা হলে কি আনন্দময়ী মা আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন। মা স্নেহ দানে সংসারের সব জ্বালা ঘুচাইয়া দিবেন।

এই শিবলিঙ্গ ও যোনি পীঠ চিদাকাশে আছেন। নিজের হৃদয় মধ্যে উহা খুজিয়া লও। আবার মাথার মধ্যে খুজিয়া লও। আবার চক্রে চক্রে খুঁজিয়া লও।

মাথার মধ্যে তালু মূলের উপর মাথার যে অস্থি আছে যাহাকে সেলাটার্সিকা (Sella Tercica) বলে উহার উপর পিটুটারী বডি (Pitutary Body) বলে একটি পদার্থ আছে; জপন দ্বারা তন্নিহিত তেজের প্রসারণ হইলে ঐ তেজ পিনিয়াল গ্লাণ্ড নামক একটি যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। তখন সাধক দিব্য নেত্র লাভ করিয়া লিঙ্গযোনি দর্শনে কৃতার্থ হন। মাথার মধ্যের Pons Varoli টি শিবলিঙ্গের স্থূল প্রতিমা। এই পন্স ভ্যারোলির উপর গোল গোল মাদুলির মত চারিটি জিনিষ আছে ইহাদের বলে Corposa quadra gemina। উহাদের সুমুখ দিগের দুটির উপরে ঐ পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডটি আছে। এই পাঁচটি বুঝি শিবলিঙ্গ প্রতিমার ৫টি মুখ। জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে পাঁচটি নক্ষত্র লইয়া

রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র হইয়াছে। Corposa quadra gemina ও Penial gland এই পাঁচটি বুঝি সেই পাঁচটি নক্ষত্রের স্থূল প্রতিমা। হাঃ হাঃ হাঃ আমার শিব আমার রাধা। মা আমার কৃষ্ণ। বল হরি হরি হরিবোল। আমি যখন রাধা হব মা তখন কৃষ্ণ হবেন তখন দুজনে স্বামী স্ত্রী ভাবে দাঁড়াব। মধুর ভাবে সাধনা ইহার পূর্ব্বে নহে। আগে "মা" বলা চাই তার পর ফুল ফুটলে রাধকৃষ্ণ বলিতে হয়। যিনি ঊর্দ্ধলিঙ্গ, যিনি অনঙ্গবিজয়ী তিনি ভিন্ন অন্য কেহ স্ত্রী ও জননী শব্দ এক আধারে প্রয়োগ করিতে অধিকারী নহেন। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাস।

ধন্য তুমি আদি কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস!
কি মধুর গীতি কাব্য করিলে প্রকাশ।
জনমি নান্নুর গ্রামে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ধামে,
রাখিলে অতুল কীর্ত্তি এ বঙ্গ মাঝারে,
তোমার সুযশ যত ভাবুকে প্রচারে।

বৈষ্ণব ধরম শুধু প্রেম ভক্তি হয়
আদর্শ প্রেমিকা রাধা সদা কৃষ্ণময়।
মাধুর্য্য রসেতে ভরি নায়ক নায়িকা করি,
কাব্য পটে নানা মতে করিয়া চিত্রন
মাধুর্য্য রসেতে কৃষ্ণ লীলার বর্ণন।

সাজাইলে ভাষা কত অমূল্য রতনে,
মরম বুঝিতে নারে অরসিক জনে।
আদ্য রসে ভক্তি যোগে, কৃষ্ণ রতি উপভোগে
আগুণে জলের মিশ বড়ই মধুর,
রসতত্ত্বে সিদ্ধ হয়ে গেলে স্বর্গপুর।

ভাবেতে বিভোর কবি ছানিয়া পীরিতি
প্রেমের তুলিকা ধরি আঁকিলে মুরতি।
আত্মহারা হয় যেই, পিরীতি লভয়ে সেই;
এ হেন উদার ভাব করিতে বর্ণন
রাধাকৃষ্ণ রস-কেলি করিলে কীর্ত্তন॥

মোহিলে চৈতন্য দেবে কৃষ্ণ প্রেম ভরে,
শুনিয়া তোমার গাঁথা প্রেমে নৃত্য করে।
অভাবুক পাপমনে, অশ্লীলতা আরোপণে,
তব ভাব উদ্ধারের পথরোধ করি,
পাণ্ডু গ্রস্ত আঁখি হেন পাণ্ডুবর্ণ হেরি।

তোমার কবিত্ব যবে স্ফূর্ত্তিলাভ করে,
বঙ্গ-ভাষা দীনা হীনা ক্ষীণ দেহ ধরে।
কন্যা রূপে নিলে কোলে, সাজাইলে নানা ফুলে,
ক্ষুদ্র দেহ পুষ্ট হল তোমার লালনে,
পরায়ে ভকতি বাস বাড়ালে সম্মানে॥

ভাষা সব মাঝে তব কবিতা কমলে,
কাব্য-রস মধু-লোভে ভক্ত অলি দলে,
গুন্ গুন্ গুন রবে, মধুপানে মত্ত সবে,
পানেতে পিয়াস বাড়ে নাহি মিটে আশ
অক্ষয় ভাণ্ডার তব ধন্য চণ্ডীদাস!

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

চতুর্ব্যূহ উপাসনা।

চতুর্ব্যূহ বল্‌তে কি বোঝা যায়? শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে, প্রথমে গুণাতীত শুদ্ধ সত্ব, অব্যক্ত ও অনাবৃত নারায়ণ ছিলেন। সেই নারায়ণ হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট পুরুষ বাসুদেব উৎপন্ন হইলেন। এই বাসুদেবই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অবিকল অনুরূপ পিণ্ডান্ত স্বরূপ যে দেহ, তন্মধ্যগত হৃদ্দেশস্থিত ঈশ্বর। এই বাসুদেব স্বয়ং দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাহাতে এক অংশে নবীন নীরদবরণ শ্যামসুন্দর নারায়ণ; অপরাংশে শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও শুভ্র স্ফটিক সন্নিভ বাসুদেব বা হিরণ্যগর্ভ। সেই বাসুদেব হইতে সূত্রাত্মারূপী সংকর্ষণ অর্থাৎ অনন্ত বা বলরাম; তাহা হইতে ঐশ্বর্য্যরূপী প্রদ্যুম্ন বা বিরাট পুরুষ; এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞারূপী অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইলেন।

নারায়ণ (গুণাতীত, অব্যক্ত ও অনাবৃত) অর্থাৎ
Undifferentiated, Unmanifested & unknowable.
বাসুদেব (মহৎ বা Universal Mind)
তিনি দুইভাগে বিভক্ত হইলেন!—

(১) প্রথমভাগ হইলেন	(২) দ্বিতীয় ভাগ হইলেন
নবীন নীরদ বরণ	শুভ্রবর্ণ হিরণ্যগর্ভ
শ্যামসুন্দর "নারায়ণ"	সঙ্কর্ষণ বা সূত্রাত্মা
	প্রদ্যুম্ন বা বিরাট (ঐশ্বর্য্য)
	অনিরুদ্ধ বা প্রজ্ঞা
	অমঘা বল।

কথিত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই মূর্ত্তি চতুষ্টয়কেই চতুর্ব্যূহ কহে। অর্থাৎ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই অবস্থা চতুষ্টয়ের জ্ঞাপকই চতুর্ব্যূহ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দে আছে;—

ভগবদ্ভক্ত সূত শৌনকঋষিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি পুরুষ মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চারি মূর্ত্তির্ব্যূহ। ভগবন্! সেই নারায়ণ,—বাহ্য পদার্থ মন, সংস্কার ও জ্ঞানোপাধিক জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই সকল বৃত্তিদ্বারা বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা ও তুরীয় চিন্তিত হইয়া থাকেন। তত্তন্মূর্ত্তিস্থ ভগবান্ ঈশ্বর হরি, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, শস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা উপলক্ষিত ঐ ব্যূহমূর্ত্তি চতুষ্টয় ধারণ করেন।"

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রণীত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

প্রকৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণধাম॥
সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারে তাহাই বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুলে ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রহ্ম লোক নাম।
গোলোকস্থ শ্বেত দ্বীপ বৃন্দাবন ধাম॥
সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম।
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা করেন বিলাস।
মথুরা দ্বারিকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলাসয় চতুর্ব্যূহ হঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।

সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলেন অনন্ত সময় ॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥
সেই পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ চারি পাশে।
দ্বারিকাদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
তাঁর যে রামেররূপ মহা সঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধ তত্ত্ব নাম।
শুদ্ধ তত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার।
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ব সঙ্কর্ষণ নাম ॥

ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, মথুরা, দ্বারিকা ও গোকুল এই তিনটী অপার্থিব জিনিষ, চর্ম্ম চক্ষের অগোচর। প্রেম চক্ষু বা দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া প্রজ্ঞা খুলিয়া গেলে পর তবে তাহাদের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত ধাম অপার্থিব "শুদ্ধতত্ত্বময়" এবং পরব্যোমের পার্শ্বস্থ তুরীয় বিশুদ্ধ সত্বকেই সঙ্কর্ষণ কহে।

এই সংসারে প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তিরই বিশেষ বিশেষ জাতি ও বিশেষ বিশেষ নাম আছে, কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্মের বিশেষ কোন জাতি বা গুণ বা নাম নাই। তিনি গুণাতীত, নামাতীত, অবাঙমানস গোচর। কিন্তু তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং পরিপক্ক শ্রদ্ধাযোগে ও কঠোর সাধনাবলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পরব্রহ্মের অতি মহান্, অতি সুমধুর ও অতি গুহ্য **নির্ব্বিশেষ** একটি নাম আছে; প্রাণমন খুলিয়া ভক্তিভরে এই নামে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন, চিদঘনানন্দরূপে ভক্তের সমীপস্থ হন, দিব্য চক্ষের গোচর হন। তাঁহার সেই নামটীকে প্রণব কহে।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২।৮ অঃ
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যারহন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩।৮ অঃ গীতা।

ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত, হৃদয়েতে মনকে নিরুদ্ধ ও প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান স্বরূপ ওঁ এই অক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করতঃ যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

এখন দেখা গেল ওঁকারই পরব্রহ্মের প্রকৃত নাম, অর্থাৎ পরমাত্মার নামই ওঁকার। ওঁ=অ+উ+ম+ঁ(নাদ ও বিন্দু) অর্থাৎ অ, উ, ম, নাদ ও বিন্দু এই কয়টী অক্ষরের সংযোগে পরব্রহ্ম জ্ঞাপক ওঁকারের সৃষ্টি হইয়াছে।

"অ"কার অর্থে রাম বা সঙ্কর্ষণ, অর্থাৎ বিশ্বাত্মক অথবা জাগ্রতাবস্থার অধিষ্ঠাত্রী সমষ্টি স্বরূপ।

"উ"কার প্রদ্যুম্ন, অর্থাৎ তৈজসাত্মক বা স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাত্রী সমষ্টি স্বরূপ।

"ম"কার অনিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাত্রী সমষ্টি স্বরূপ।

"ঁ"অর্দ্ধমাত্রা বা বাসুদেব, অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থাত্রয় বর্জ্জিত তুরীয় পদার্থ যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে।

"."বিন্দু, আদ্যা প্রকৃতি রুক্মিণী বা মূল প্রকৃতি।

শ্রুঃ। রোহিণী তনয়ো রামো অকারাক্ষর সম্ভবঃ।
তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষর সম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥
শ্রুঃ। প্রজ্ঞাত্মকো নিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষর সম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মক কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৫৬ ॥
শ্রুঃ। কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূল প্রকৃতি রুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজন সম্ভূত শ্রুতিভ্যো ব্রহ্ম সঙ্গতঃ ॥ ৫৭ ॥

গোপাল তাপনী।

অথবা, জাগ্রৎ, বিরাটরূপ।
স্বপ্ন, হিরণ্যগর্ভ।
সুষুপ্তি, কারণ।

এই তিন উপাধির পর বাসুদেবাখ্য তুরীয় উপাধি ; তাহা অতিক্রম করিলে চিদ্ঘনানন্দ গোপালরূপ প্রকট হন।

অথবা, অকার ব্রহ্মাকে, উকার বিষ্ণুকে এবং মকার শিবকে বুঝায়।

অর্দ্ধমাত্রা (ঁ) পুরুষরূপী ঈশ্বর বা তুরীয় ব্রহ্ম।

বিন্দু (· , প্রকৃতি স্বরূপ জগন্মাতা ঈশ্বরী বা জগযোনি। তৎপর সমস্ত কারণেরও কারণ অব্যয়, অক্ষর, গুণাতীত, নিষ্কল পরব্রহ্ম এবং মূল বা পরা প্রকৃতি।

তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভ (Mundane Egg), অসীম এবং অনন্ত আকাশের পরিচায়ক।

বলরামই সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ অনন্ত এবং চতুর্ব্যূহের এক ব্যূহ বা কলা। সর্প বর্ত্তুলাকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বীয় লাঙ্গুল গলাধঃকরণ করিতেছে, ইহাই অনন্তের চিহ্ন সপ্তকল্পজীবী ঋষি মার্কণ্ডেয় প্রলয়কালে সুকোমল শিশুরূপী ভগবান হরিকে কারণার্ণবে একটী বটপত্রে শায়িত দেখিলেন ! কিরূপ দেখিলেন ? না, বালক মনোহর অঙ্গুলি বিশিষ্ট পাণিযুগল দ্বারা চরণাম্বুজ আকর্ষণ করতঃ মুখে প্রদান করিয়া চুষিতেছিলেন। ইহাও পরাৎপর হরির অনন্তের বা অসীমত্বের চিহ্ন। বাসুকী বা অনন্ত অসীমত্বের চিহ্ন। অর্দ্ধমাত্রা বা উভয়দিগে অসংযুক্ত অর্দ্ধপরিধি অসীম অনন্ত পরব্রহ্মের এবং তন্মধ্যস্থ বিন্দু পরা প্রকৃতিরপরিচারক। এই পরা প্রকৃতিই দৃশ্যমান জগতের মূলীভূত নিদান স্বরূপ। পরব্রহ্ম একটী বৃত্তস্বরূপ, যাঁহার পরিধি কোথাও নাই অথচ তাঁহার কেন্দ্র সর্ব্বত্র বিরাজিত। ওঁ হরি ওঁ॥

শ্রীসুদর্শন দাস।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(৮ম সংখ্যার ২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

এইবারে আমরা সেই সুরম্য রাজবিদ্যামন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি যে এই চতুর্থ গ্রহ পৃথিবী হইতে কিছু দূরে একটি নূতন গ্রহ নির্ম্মিত হইতেছে ; ইহার আকার গোল ; এখনও ইহা জীবের বাসোপযোগী হয় নাই। আমি এই গ্রহটি দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া

গুরুদেবের দিকে চহিবা মাত্র, তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে পৃথিবীর আয়ু কাল পূর্ণ হইলে উহার জীবনীশক্তি সমস্ত এই নূতন গ্রহে সঞ্চারিত হইবে ; পৃথিবী উহার প্রাণ এই নূতন গ্রহে ঢালিয়া দিয়া নিজে প্রলয় কালীন সুষুপ্তি অবস্থা ভোগ করিবে। গুরুদেব এই সময়ে অতি সংক্ষেপে শক্তিতত্ত্ব কিছু বুঝাইয়া দিলেন। উহা আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহা বলিব। জগতে যত কিছু পদার্থ আছে সমস্তই চেতন পদার্থ ; অচেতন পদার্থ জগতে কিছু নাই। চেতন—সংযুক্ত নহে এমন পদার্থ বিশ্বে নাই। এই চেতনার নামই শক্তি বা জীবনী শক্তি। যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি উহারও প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এই জীবনীশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং এই জীবনীশক্তির সত্বা নিবন্ধন প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জীব। এই জীবনী শক্তিকে ত্রিবিধ ভাবে ভাবা যাইতে পারে ; প্রথম, পরমাণুর অন্তর্নিহিত চেতনা ; দ্বিতীয়, পরমাণু সকলের সংযোজক শক্তি ; তৃতীয় সংঘাত চেতনা। পরমাণু সকল একত্র মিলিত হইয়া যখন একটি দেহ নির্ম্মিত হয় তখন সেই দেহের যে চেতনা উহারই নাম সংঘাত চেতনা। অনেক গুলি দ্রব্যের একত্র সংহনন অর্থাৎ মিলন হইতে যে একটি দেহ নির্ম্মিত হয় উহার নাম সংঘাত। এই সংঘাত চেতনা শক্তিই পরিবর্ত্তন শীল। এই যে মনুষ্য আমি, একটি দেহ ধারণ করিয়া নিজে জীবিত আছি মনে করিতেছি এই দেহে এখন যে শক্তি আছে, মরিয়া গেলে উহাতে সেই শক্তি থাকিবে না এই শক্তিরই নাম সংঘাত চেতনা। যে সকল পরমাণু পুঞ্জের সমষ্টি লইয়া এই দেহ, সেই সকল পরমাণুর শক্তি কিন্তু দেহের চেতনার সঙ্গে লোপ পায় না। পরমাণু অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি কল্পান্ত স্থায়ী ; মোটামুটি ভাবিতে গেলে এই পরমাণু অন্তর্নিবিষ্ট চেতনাকে চিরস্থায়ী বলা যাইতে পারে। পরমাণু সংযোজক শক্তিও ঐরূপ চিরস্থায়ী। শক্তি ভাবিতে গেলে শক্তির আধারও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হয় ; শক্তির প্রথমরূপ, যাহা পরমাণু নিহিত চেতনা, প্রত্যেক পরমাণুই উহার আধার, যাহা সংঘাত চেতনা রূপে প্রতীয়মান হয় সংঘাত দেহই উহার আধার। আর ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সকল যে একার্ণব আধারে ভাসমান হইয়া রহিয়াছে, আকাশ স্বরূপ সেই আধারই সংযোজক শক্তির আধার। আনন্দই এই সংযোজক শক্তির স্বরূপ। পরমাণুর অবিনাশিত্ব, কল্পান্ত স্থায়িত্ব, গুণই উহার অন্তর্নিহিত শক্তি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের

সৎ স্বরূপ হইতে উদ্ভূত শক্তিই পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি, তাঁহার আনন্দস্বরূপ হইতে উদ্ভূত শক্তিই সংযোজক শক্তি এবং তাঁহার চিৎ স্বরূপ হইতে উদ্ভূত শক্তিই দেহীর জীবনী শক্তি বা সংঘাত চেতনা।

গুরুদেব পূর্ব্বোক্তরূপে শক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়া বলিলেন যে এই যে পৃথিবী দেখিতেছ ইহাও একটি সজীব দেহ। প্রত্যেক গ্রহই ঐরূপ এক একটি সজীব দেহ। যেমন প্রত্যেক মনুষ্য শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষ এক এক জন, সেই সেই শরীরের শরীরী (অর্থাৎ দেহস্বামী) সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতা এক একজন আছেন ; সকলেরই নির্দ্ধারিত কাল প্রমাণ আয়ু আছে। কোন একটি গ্রহের আয়ু শেষ হইলে উহার দেহের চেতনা অন্য একটি গ্রহে সঞ্চারিত হয় এবং উহা মৃতবৎ পতিত হইয়া থাকে। এই যে নূতন গ্রহটি নির্ম্মিত হইতেছে দেখিতেছ, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণটুকু উহাতে সঞ্চারিত করিয়া, পৃথিবী মৃতবৎ হইয়া পড়িবে। এই পৃথিবীর সঙ্গে যে চন্দ্র ঘুরিতেছে দেখিতেছ উহা ঐরূপ একটি মৃতদেহ। গ্রহগণের এইরূপ মৃতদেহ অর্থাৎ শব সম্বন্ধীয় গূঢ়রহস্য অনেক আছে যাহার প্রকৃত রহস্য না বুঝায় অসন্মার্গাবলম্বী তান্ত্রিকগণ মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি বিদ্যাকেই শাম্ভবী বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়া প্রকৃত শাম্ভবী বিদ্যাকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাঁহারা সন্মার্গাবলম্বী এবং যাঁহারা মহাশত্রু কামকে জয় করিয়া বীর নামে অভিহিত হইয়াছেন, সেই সকল বীর পুরুষরাই মৃতগ্রহ রূপ শবের সাধনা দ্বারা জীবনী শক্তির গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সচেষ্ট হন এবং শম্ভু এইরূপ কামজয়ী বীর পুরুষকেই সাধনার প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দেন। সাবধান, অসন্মার্গাবলম্বী সাধকদের স্বকপোলকল্পিত সাধনা প্রণালীও, তন্ত্র অর্থাৎ শিব বাক্য বলিয়া জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে সুতরাং বাহিরে প্রকাশিত তন্ত্র শাস্ত্র সকলের আলোচনা অতি সাবধানে করা কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরু অবলম্বন ব্যতীত কেহ যেন তন্ত্রোক্ত বীরাচার মার্গে পদক্ষেপ না করেন। করিলেই মহা বিপদে পতিত হইবেন।

পৃথিবীর আয়ু সম্বন্ধে গুরুদেব বুঝাইলেন। যে এক কল্প কাল পৃথিবীর আয়ুর পরিমাণ। চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরিমাণ উহার দশগুণ পরিমাণে এক মহাযুগ হয়, এইরূপ সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। এই এক কল্পকালকে চৌদ্দভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগকে এক এক মন্বন্তর কাল

বলে। এক একটি মন্বন্তর কালের এক একজন অধিষ্ঠাতা আছেন ; উহাদের নাম মনু। বর্ত্তমান মন্বন্তরাধিপতির নাম বৈবস্বত মনু। এই কল্পের ছয়টি মন্বন্তর গত হইয়াছে সপ্তম মন্বন্তর কাল চলিতেছে। যাঁহাদের দিব্য নেত্র স্ফুরিত হইয়াছে তাঁহারা এই কল্প ও মন্বন্তর কালের, অতীত ও অনাগত বিষয় সকল চিদাকাশে অঙ্কিত দেখিতে পান। একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে গেলে লোকে প্রথমে যেমন তাহার একটি ছবি (প্ল্যান পংসং) আঁকিয়া মিস্ত্রিদের হাতে দেয় এবং সেই মিস্ত্রিরা সেই ছবি অনুযায়ী বাড়ী প্রস্তুত করে, সেইরূপ এক একটি গ্রহ নির্ম্মাণ জন্য এবং উহার কার্য্য চালাইবার জন্য গ্রহাধিপতির কাছে এক একটি চিত্র আছে ; দিকপালগণ সেই চিত্র অবলম্বনে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই ছবি চিদাকাশে অঙ্কিত। দিব্য নেত্র লাভ করিয়া যোগীগণ এই চিত্র দেখিতে পান এবং জগৎকর্ত্তার অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সমাধা করিতে সচেষ্ট থাকেন।

এই এক কল্পের ইতিহাস কথাই হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্রে কথিত আছে কিন্তু সদ্‌গুরু ব্যতীত ঐ সমস্ত কথার রহস্য ভেদ করা সাধারণ জনের পক্ষে দুঃসাধ্য।

গুরুদেব এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে আমাকে একবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করাইলেন। আটলাণ্টিক সাগরের মেক্সিকো উপসাগরের সন্নিকটস্থ হইয়া গুরুদেব অনেক গুহ্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। উহা হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহারই কিছু এইখানে বলিব। এই যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড আজি যেরূপ অবস্থায় রহিয়াছে চিরকাল উহা ঐ ভাবে নাই পৃথিবীর চেতনা শক্তির মৃদু কম্পনে উহার উপরিস্থ ভূখণ্ডের অহোরহ পরিবর্ত্তন হইতেছে ; যুগের সন্ধিস্থলে এই চেতনা শক্তির কম্পন প্রবল বেগে উপস্থিত হয় ; তখন ভূমিকম্প জলপ্লাবনাদি বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর এইরূপ বিপ্লবও কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে ; চিদাকাশে কালের যে ছবি পূর্ব্ব হইতেই অঙ্কিত আছে, যুগসন্ধ্যার বিপ্লবের ছবিও সেই চিত্রে পূর্ব্ব হইতেই অঙ্কিত আছে। এইরূপ বিপ্লব হইতেই মানব জাতির এক একটি প্রশাখা ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহার স্থলে নূতন শাখা বাহির হয়। বাগানের মালী গোলাপ গাছে ভাল ফুল ফুটাবার জন্য গোলাপের শাখা যেমন মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেয় এই পৃথিবীর ঈশ্বরও সেইরূপ মানবজাতিরূপ বৃক্ষে মনুষ্যত্ব ফুল ফুটাইবার জন্য ঐ বৃক্ষের

শাখা প্রশাখা মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেন। যুগ সন্ধ্যার বিপ্লব ভাবী শুভ উদ্দেশেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ এক মহা বিপ্লবের বশে সোনার লঙ্কা আজি অতল জলে নিমগ্ন। ভারতবর্ষের দক্ষিণের ক্ষুদ্র একটি দ্বীপকে এখন লঙ্কা বলা হইয়া থাকে কিন্তু রামায়ণে যে লঙ্কাদ্বীপের কথা আছে তাহা কেবল ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপটির কথা নহে। বহুকাল গত হইয়াছে এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে আটলান্তিক মহাসাগরের পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভুভাগ এক মহা সমৃদ্ধিশালী মহাদেশ ছিল; এখন যেখানে আটলাণ্টিক মহাসাগর পুরাকালে সেইখানে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মানবজাতির চতুর্থ প্রশাখার বাসস্থান ছিল। বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ এবং প্রাকৃতিক শক্তিতত্ত্ব বিদ্যায় এই জাতি অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কালের চক্রে এই লঙ্কা রাজ্যের শিল্প কার্য্য ইত্যাদি সমস্তই অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী কাল এই সভ্য জাতির সভ্যতার পার্থিব চিহ্ন সব লোপ করিয়াছে কিন্তু সভ্যতার যাহা সার অংশ তাহা লোপ পায় নাই। বিদ্যা সভ্যতার সার অংশ। মহাপুরুষগণ এই সভ্যজাতির বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া হিমালয় গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন মানবজাতির বর্ত্তমান প্রশাখা অর্থাৎ আর্য্যজাতি যখন সেই সকল বিদ্যালাভের উপযুক্ত হইবে তখন মহাপুরুষগণ ক্রমে ক্রমে উহা বাহিরে প্রকাশ করিবেন।

সোণার লঙ্কা ধ্বংস হইয়া গেলেও, মেক্সিকো উপসাগর এখন যে ভূভাগের উপর সেই অংশে অনেককাল ধরিয়া মহা সমৃদ্ধি শালী একটি রাজ্য ছিল। উহার নাম মক্ষিকা পুরী। এবং উহার পূর্ব্বে দৈত্যপুরী বলিয়া আর একটি সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব ছিল। মক্ষিকাপুরী ধ্বংশ হইবার অনেক পর পর্য্যন্ত এই দৈত্যপুরী নিবাসীরা সভ্যতার নিশান উড়াইয়া রাজত্ব করিয়াছিল। কালক্রমে যখন এই রাজত্ব ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয় তখন ঐ জনপদবাসীরা পৃথিবীর নানা স্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তন্মধ্যে যাহারা মিশর দেশে যাইয়া বাস করে তাহারা বিখ্যাত হয়। সেই সময় মিশরে, এসিয়া মহাদেশবাসী মানবজাতির শাখা বিশেষেরও নিবাস ছিল। এই মিশর দেশ বাসীদের সভ্যতার চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। শিল্প বিদ্যা, কারু বিদ্যা, রসায়ন, গনিত, হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ বিদ্যা প্রভৃতিতে এই মিশরজাতি কতই উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

এই সমস্ত বিদ্যার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইহারা পৃথিবীর অন্য জাতির উপর

আধিপত্য স্থাপন করিয়া শেষে কতই অত্যাচার করিয়াছিল। সংহারকারী কাল সেই সমস্ত অত্যাচারও কিন্তু সহ্য করিয়াছিলেন; শেষে যখন ব্যভিচার ও স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল তখন পাপের মাত্রা পূর্ণ হইল; কাল তখন বদন ব্যাদান করিয়া উহাদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

মানব জাতির শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে গুরুদেব যাহা বুঝাইয়াছিলেন তাহা পরে বলিব। এইখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে মানব জাতির শাখা ৭টি এবং প্রত্যেক শাখার প্রশাখা ৭টি। আর্য্য জাতি ৪র্থ শাখার ৫ম প্রশাখা। লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতির অধিবাসীরা ঐ ৪র্থ শাখার ৪র্থ প্রশাখা ছিল। আমরা যখন পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে চীনদেশে উপস্থিত হই তখন গুরুদেব বলিলেন যে এই চীনজাতি, মানব জাতির চতুর্থ প্রশাখার একটি পল্লব। লঙ্কা প্রভৃতি রাজ্যের ধ্বংস হইবার সময় বর্ত্তমান চীনজাতির পূর্ব্ব পুরুষরা তথা হইতে এই চীনদেশে আসিয়া বাস করেন। এই চীনজাতি, প্রবৃত্তিমার্গের মহাপুরুষগণ দ্বারা সংরক্ষিত বলিয়া এতদিন ধরিয়া উহার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। চীন বাসীরা কিন্তু ক্রমে তমোগুণে বেষ্টিত হইয়াছে; নানা ব্যভিচার দোষে চীন রাজ্য কলুষিত হইয়াছে, সেই জন্য এই গঙ্গা চক্রের শেষ এবং জগন্নাথ যুগের মধ্যস্থলে চীনরাজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

'প্রবৃত্তি মার্গের মহাপুরুষ' এই কথার অর্থ গুরু কৃপায় যাহা বুঝিয়াছি তাহা পরে কোন সময় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ।

পৌরাণিক কথা।

মন্বন্তরের শাসন প্রণালী।

একটি রাজ্যশাসন করিতে হইলে নানা অঙ্গের আবশ্যক হয়। রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজসভা, ও বিভিন্ন রাজ কর্ম্মচারী বিভিন্ন অধিকারে নিযুক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করে। কেহ কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান করে। কেহ সেই বিধান অনুযায়ী সকলকে কর্ম্ম পরায়ণ করিতে বদ্ধ পরিকর হয়। কেহ কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘনে মনুষ্যকে যথাযথ দণ্ড দিয়া থাকে! কেহ প্রজাবর্গের প্রয়োজন অনুযায়ী

সকল দ্রব্যের যাহাতে সঙ্কুলন হয়, যাহাতে দুর্ভিক্ষ্য মহামারী ইত্যাদি উপদ্রব না হয়, তাহাই পর্য্যবেক্ষণা করিয়া থাকে। রাজা আপন আপন অধিকারে সকল কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। এই বিশাল বিশ্বরাজ্য শাসন করিবার এক প্রণালী আছে। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই, সকল কার্য্য সময় মত সাধিত হয়।

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে।
ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষশাসনাঃ॥

ভা, পু, ৮—১৪—২

পুরুষ দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মনু, মনুপুত্র, মুনি, ইন্দ্র ও দেবগণ মন্বন্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন। মন্বন্তরের কার্য্য চালাইবাব জন্য ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাকে মন্বন্তর অবতার বলে। এখানে পুরুষ শব্দে মন্বন্তর অবতার অভিহিত হইয়াছে। প্রথম মন্বন্তরে যজ্ঞ মন্বন্তর অবতার ছিলেন। এইরূপ প্রতি মন্বন্তরের এক একজন অবতার আছেন।

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনকে নৃপ।
মন্বাদয়ো জগদ্ যাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ॥

৮—১৪—৩

যজ্ঞ আদি যে সকল পুরুষের অবতার কথিত হইয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মনু আদি অধিকারীগণ এই বিশ্ব ব্যাপার সম্পাদন করেন। মন্বন্তর অবতারই মন্বন্তরের রাজা। তিনিই সকলকে আপন আপন কার্য্যে প্রেরণা করেন। আমাদের এই সপ্তম মন্বন্তরে বামন রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুই অবতার।

অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ।
আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্॥

৮—১৩—৬

এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে তিনিই পূর্ব্ব জন্মে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহ মদিত্যামাত্ম কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥

১০—৬—৪২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কে বলিতে পারে। তাঁহা ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

৮—১৪—৪

চতুর্যুগের অবসানে শ্রুতি সকল নষ্ট হয়। তখন ঋষিগণ তপস্যা বলে সেই সকল শ্রুতি জানিতে পারেন। বেদ দ্বারাই সনাতন ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়। যদিও বেদ সকল অনাদি, তথাপি কালে তাহার প্রচার একবারে লুপ্ত হইয়া যায়। ঋষিগণ যোগবলে বেদের অর্থ জানিতে পারেন। এবং তাঁহারা নষ্ট বেদকে প্রকাশিত করেন। যিনি যে মন্ত্রের প্রকাশক, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। প্রতি মন্বন্তরে সাত জন প্রধান ঋষি থাকেন। তাঁহাদিগকে সপ্তর্ষি বলে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত ঋষি। আমাদের সপ্তর্ষি কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ।

কশ্যপোঽত্রি বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথগোতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥

৮—১৩—৫

ইহাঁরাই আমাদের মহাযুগে বেদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ বেদই সনাতন ধর্ম্মের মূল।

ততো ধর্ম্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ।
যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীংনৃপ॥

৮—১৪—৫

মনু সকল আপন আপন কালে সংযত চিত্ত হইয়া মহীমধ্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সঞ্চারিত করেন। বেদ সকল মন্থন করিয়া ভগবান্ মনু আপন অধিকার কালের উপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ।

৮—১৪—৬

মনুপুত্রগণ মন্বন্তর অবসানের কাল পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে মনু প্রবর্ত্তিত

ধর্ম্মের পালন করেন। আমাদের মন্বন্তরে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ ধর্ম্মপালক ছিলেন। তাঁহারা রাজধর্ম্ম পালন করিবার জন্য অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। সেই শক্তি ঈশ্বর দত্ত।

কলিতে রাজ বংশ উৎসন্ন হয়। সূর্য্যবংশজ মরু এবং চন্দ্রবংশজ দেবাপি যোগিদিগের প্রসিদ্ধ নিবাস স্থান কলাপ গ্রামে মহাযোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারাই কলির অন্তে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। মনুবংশীয়দিগের উদ্ধার করিবেন।

দেবাপিঃ শন্তানার্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকু বংশজঃ।
কলাপ গ্রাম আসাতে মহাযোগ বলান্বিতৌ॥

১২—২৮—৩৭

তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রম যুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥

১২—২—৩৮

যখন মনুবংশীয় রাজাগণ না থাকেন তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাম মাত্র। তখন হরির নামই প্রধান ধর্ম্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলির রাজাগণ নিজে ধর্ম্মপরায়ণ হন্ না। তাঁহারা প্রজাবর্গকে কিরূপে ধর্ম্ম পরায়ণ করিবেন?

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্য রূপিণঃ॥
তন্নাথাস্তে জনপদা স্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ।
অন্যোন্যতো রাজাভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ॥

ভা· পু· ১২—১

তাই আজ বর্ণেরও বিচার নাই, আশ্রমেরও বিচার নাই। যে কালে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমাদর নাই, যে কালে ভিক্ষা কিম্বা দাসত্ব করিয়া ব্রাহ্মণগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যে কালে ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয় নাই, যে কালে গৃহস্থ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করিয়া গৃহ শূন্য আশ্রমীর আশ্রয় হইতে পারেনা, সে কালে

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উল্লেখ কেন? তাই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, এবং রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নামও করেন নাই।

যজ্ঞভাগভুক্তো দেবা যে চ তত্রান্বিতাশ্চ তৈঃ।
ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জিতাম্।
ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাং স্ত্রীন্ কামং লোকে প্রবর্ধতি॥

৮—১৪—৭

ইন্দ্র যজ্ঞাংশভোজী দেবগণের সহিত যথাকালে বারি বর্ষণ করেন এবং ত্রৈলোক্যশ্রী ভোগ করিয়া তিন লোকের রক্ষা করেন। বারি বর্ষণ কেবল উপলক্ষ মাত্র। প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারই দেবগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সময় মত বারি বর্ষণ যেমন জীবিকার জন্য মনুষ্যের উপযোগী, সেরূপ অন্য প্রাকৃতিক ব্যাপার নহে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্য ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া কেবল "পর্জ্জন্যে"র উল্লেখ করিয়াছেন।

"যজ্ঞোদ্ভবতি পর্জ্জন্যং পর্জ্জন্যাদান্ন সম্ভবঃ। দেবতারা জীবের উপযোগী প্রাকৃতিক কার্য্য করিয়া থাকেন। জীবের সাধারণ উন্নতির জন্য এবং জীব কর্ম্মের ফল বিকাশের জন্য আনুসঙ্গিক নানাবিধ প্রাকৃতিক কার্য্যের আবশ্যক হয়। বিজ্ঞান শাস্ত্র ঐ সকল কার্য্যের "কিরূপ" জানিতে পারে, "কেন" জানিতে পারেনা।

এইত গেল সাধারণ শাসন প্রণালী। অর্থাৎ সাধারণতঃ, মন্বন্তর অবতার, মনু, মনুপুত্র, মুনি, ইন্দ্র ও দেবগণ এই ছয় অঙ্গ মিলিয়া মন্বন্তরের শাসন করিয়া থাকেন। দেবগণ প্রাকৃতিক কার্য্য করেন, মুনিগণ বেদের আবিষ্কার করেন, মনু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার করেন, এবং মনুপুত্রগণ সেই ধর্ম্মের রক্ষা করেন। ইহাঁরা সকলেই মন্বন্তর অবতার দ্বারা আপন আপন কর্ম্মে নিয়োজিত হন্।

এই সাধারণ শাসন প্রণালীর অতিরিক্ত একটি অসাধারণ শাসন প্রণালী আছে। যাঁহারা সাধারণের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে অবস্থিতি করেন, অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন যে সকল জীবের জন্য কালের স্রোত অত্যন্ত মন্দগামী, তাঁহারা অসাধারণ ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হন্। তাঁহাদের জন্য ভগবৎ শক্তি অসাধারণ রূপে প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানঞ্চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক।
ঋষিরূপধরঃ কর্ম্ম যোগং যোগেশরূপধৃক্ ॥ ৮—১৪—৮

সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিরা হরি প্রতিযুগে জ্ঞান শিক্ষা দেন্। যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিরূপ ধারণ করিয়া তিনি কর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং দত্তাত্রেয় আদি যোগেশ্বর মুর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি যোগ শিক্ষা দেন্।

সেই শিক্ষা পাইয়া জীব দেবতা, ঋষি, মনু, মনুপুত্র কাহাকেও ভয় করেনা। আবার যখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি শাস্ত্র প্রচার করেন, তখন ইন্দ্র আদি লোকপালগণ এবং বেদবেত্তা ঋষিগণ ও তাঁহার ভক্তের নিকট অবনত মস্তক হন্। ঋষি পত্নীগণ ঋষিদিগকে অবহেলা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজন উপস্থিত করিয়া ছিলেন। স্বার্থপরায়ণ সকাম বৈদিক ঋষিগণ নিস্কাম ভক্তিপরায়ণ পত্নীদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ছিলেন।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্ধাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যেত্বধোক্ষজে ॥
নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরুবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবজি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥
অথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরে শ্বরে।
ভক্তি দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদিমতা মপি ॥
নন্নু স্বার্থ বিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥

ভাঃ পু ১০ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় ৩৯—৪৪

ঋষি পত্নীগণের দ্বিজাতি সংস্কার ছিলনা। তাঁহারা গুরুকুলেও বাস করেন নাই, এবং কোন শাস্ত্র অধ্যয়নও করেন নাই। কেবল ভক্তিবলে তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পতিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যখন ভগবান্ আপন অধিকার বিস্তার করেন তখন ঋষিগণ কিম্বা দেবগণ সে অধিকার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় গোপগণ ইন্দ্রের পূজা করেন নাই। ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা কেবল ভগবানের অধীন। মন্বন্তরের শাসন প্রণালী জানা তাঁহাদের আবশ্যক হয়না তবে তাঁহারা ভগবানের সকল কার্য্যেই সহায়ক হন্ এবং মন্বন্তরের শাসন প্রণালী ও ভগবানের স্থিতি বা পালন কার্য্যের প্রধান অঙ্গ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

প্রাচীন শিক্ষার আধুনিক চেষ্টা।

(১০ম সংখ্যার ৩১৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

গত দুর্ভিক্ষের ভীষণ কষাঘাত প্রপীড়িতদিগকে অন্নদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই প্রকার কলেজ স্থাপনের অধ্যক্ষগণ কিয়ৎ কালের জন্য অভীষ্ট কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রকাশিত হইবা মাত্র তাঁহারা প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করিয়া গত জুলাই মাসে কলেজ স্থাপন করিলেন এবং পর মাসে উহা এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তার আর্থার্ রিচার্ডসন্ অনুরাগ প্রণোদিত হইয়া বিনা বেতনে অধ্যক্ষের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকজন উদ্যমশীল অধ্যাপক এই সৎকার্য্যের ক্ষীণ মূলে জল সেচনের সাহায্যার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যাহাতে শৈশবকাল হইতে সুকুমারমতি বালকদিগের অন্তরে উচ্চতম ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হয়, জীবন নীতি মার্গে প্রধাবিত হয়, হৃদয়ে জাতীয় ভাব বদ্ধমূল হয় এবং প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি ও ঋষি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মে এই অভিপ্রায়ে মনু, মহাভারত, রামায়ণাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রত্যহ প্রাতে উপদেশ দিবার জন্য দুইজন খ্যাতনামা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন ॥

বিদ্যালয়ে স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস (Boarding house.) এবং ব্যায়াম-শালা এই চারিটি ভাগে বিভক্ত হইবে ॥—

স্কুল বিভাগ।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য, স্কুল বিভাগে সাতটি শ্রেণী থাকিবে। প্রথম শ্রেণীতে উক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অধ্যপনা হইবে, অবশিষ্ট শ্রেণী কয়টির পাঠ্য পুস্তক একটি সবকমিটির কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে।—

নিম্নলিখিত বিষয় গুলি পাঁচ বৎসরের পাঠ্যরূপে নিরূপিত হইবে ;—

(ক) ইংরাজি ; ভাষা, সাহিত্য, রচনা ॥—
(খ) প্রাচীন ভাষা ; সংস্কৃত ॥—
(গ) দেশীয় ভাষা ; হিন্দি, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রী ॥—
(ঘ) গণিত ; পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ॥—
(ঙ) ইতিহাস ; ভারতবর্ষীয়, ইংলণ্ডীয় ॥—
(চ) ভুগোল, সাধারণ, প্রাকৃতিক ॥—
(ছ) অর্থনীতি ও অর্থ বিজ্ঞান (Political Economy) ॥—
(জ) হিসাব, পত্র (Book keeping) ॥—
(ঝ) চিত্র (Drawing) ॥—
(ঞ) কৃষি ॥—
(ট) সংক্ষিপ্ত লিপি (Shorthand writing)
(ঠ) (সংক্ষিপ্ত) রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ॥—
(ড) হিন্দু ধর্ম্মোক্ত নীতি শিক্ষা ॥—

নীতি শিক্ষার্থে ক্রম পর্য্যায়ে সরল ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার পুস্তক সমূহ সব কমিটিকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টাকাল উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দান করা হইবে এবং প্রতি বৎসরান্তে ইহার স্বতন্ত্র পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে ॥—

উপযুক্ত ছাত্রগণকে প্রতিবৎসর পারিতোষিক সহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে ॥—

কলেজ বিভাগ।

এই বিভাগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ ; এল্, এল্, বিঃ এবং ডি, এস্ সি (D. Sc) পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইবে। এই সকল পরীক্ষায় নিম্নলিখিতরূপ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইবে ;—

(ক) ইংরাজি ; ভাষা, রচনা, সাহিত্য, ॥—
(খ) সংস্কৃত ; ভাষা, রচনা, সাহিত্য এবং দর্শন ॥—
(গ) পাশ্চাত্য দর্শন ॥—
(ঘ) গণিত ; বিশুদ্ধ ও মিশ্র ॥—
(ঙ) ন্যায় (Logic) ॥—
(চ) অর্থ বিজ্ঞান (Political Economy) ॥—
(ছ) ইতিহাস ; প্রাচীন ও নব্য ॥—
(জ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ॥—
(ঝ) ব্যবহার (Law) ॥—
(ঞ) হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নীতি শিক্ষা ॥

কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয় সমূহ অধীত হইবে ; কিন্তু সংস্কৃত নীতি গ্রন্থ নিচয় হইতে সঙ্কলিত নীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রত্যেক শ্রেণীর নিমিত্ত স্বতন্ত্র নির্দ্ধারিত হইবে ॥—

বাৎসরিক ৬০০৲ টাকা করিয়া নয়টি ফেলোশিপ্ (ছাত্র বৃত্তি) থাকিবে। প্রতি বৎসর তিনজন এম্, এ ফেলো নিযুক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে যাঁহার যেটি রুচিকর তিনি তদনুশীলনে সমুদয় সময় ক্ষেপন করিবেন, এই নিয়মে তাঁহারা তিন বৎসর কাল ফেলোশিপ্ বৃত্তি পাইবেন ॥—

(১) গণিত ॥—
(২) সংস্কৃত (কোন এক বিভাগ) ॥—
(৩) বিজ্ঞান ॥—

প্রতিবর্ষে ফেলোশিপ্ ও ধর্ম্মোপদেশের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট পরীক্ষা গৃহীত হইয়া উপযুক্ত ছাত্রগণকে পারিতোষিক দেওয়া হইবে ॥—

(ছাত্রাবাস (Boarding House)

ছাত্রদিগের বাসোপযোগী একটি গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ছাত্রদিগের অধিকাংশই

কলেজের উপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে যথোপযুক্ত উপদেশ লাভ করিয়া যাহাতে যথার্থ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন এই অভিপ্রায় সাধনার্থ একজন তীক্ষ্ণদর্শী তত্ত্বাবধারক ছাত্রাবাসে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধাণ করিবেন ॥

ব্যায়াম শালা ॥—

"সুস্থ শরীর সুস্থ মনের আধার" এই বাক্য বিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র স্বরূপ হইবে। ছাত্রদিগকে সুস্থ ও সবলকায় করিবার জন্য, তাহাদিগকে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি শরীর পরিচালক ক্রীড়ায় উৎসাহিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। তজ্জন্য একটি ব্যায়াম শালা স্থাপিত ও একজন ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইবে ॥—

নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির প্রতি উক্ত বিদ্যালয় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিবেন।

(১) ছাত্রাবাস ; (২) ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা ; (৩) গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ও দেশ হিতৈষী (Public Spirit) ; (৪) সংস্কৃতের প্রাধান্য স্থাপন ॥

(১) ছাত্রাবাস ;—এইটি বিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ ; বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ পক্ষগণ ইহাকেই ছাত্রগণের প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সংগঠনের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাদিগের মানস ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে পবিত্র ধর্ম্মভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেক চিন্তাকে পবিত্র বিষয়ে স্বতঃ প্রধাবিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে বাহ্যাভ্যন্তরীণ পবিত্রতা সংরক্ষণার্থ এবং তাহাদিগকে পিতৃ-স্নেহ-লালিতবৎ অনুভব করাইবার সবিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। কোন অপবিত্র ভাব, কুৎসিৎ দৃশ্য, কদর্য্য ভাষা, অপবিত্রতা সূচক কোন বিষয়ই যাহাতে তাহাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে না পারে এরূপ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বিত হইবে। দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, সুনিয়ম, তৎপরতা, শিষ্টাচার, পরোপকারিতা, কর্ত্তব্যপরতা, বিনয় এবং সরলতা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের মনে সৎসাহসের (Public Spirit) বীজ অঙ্কুরিত করা হইবে। যাহাতে তাহারা শিক্ষা ও অভ্যাস বলে ধর্ম্ম নিরত হয় এবং যাহাতে চিরদিন মনে এই বিদ্যালয়ের স্মৃতি জাগরুক থাকিয়া তাহাদিগের জীবন বিবিধ গুণান্বিত হইয়া উঠে এইরূপ চেষ্টা করা যাইবে ॥

পিতা, পুত্রের ধর্ম্ম বিচ্যুতি আশঙ্কা বা সমাজ বিগর্হিত আচার সম্বন্ধে সন্দেহ পরিশূন্য চিত্তে যেরূপ ব্যক্তির উপর তাহার শিক্ষা ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ; এরূপ খ্যাত নামা স্বধর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান শিষ্যানুরত একজন সুব্রাহ্মণ তত্ত্বাবধারক রূপে নিযুক্ত হইয়া ছাত্রগণের সহিত একত্র ছাত্রাবাসে বাস করিবেন। ইংরাজি বিদ্যালয়ে যেমন সুদক্ষ ব্যায়ামাচার্য্য নিযুক্ত থাকিয়া বালকদিগের স্বাস্থ ও বল বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ রাখিবেন এখানেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে ॥

(২)—ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা—বিদ্যালয়ের উভয় বিভাগেরই নিরূপিত শিক্ষার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু অধ্যাপকগণের উচ্চ আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে ছাত্রদিগের মন আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করা হইবে। অবসর ক্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, কোন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অথবা কোন ঋষি বা বীর পুরুষের জীবনী আলোচনা করা হইবে। সে সময়ে ইচ্ছা করিলে ছাত্রগণ বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। ফলতঃ ধর্ম্ম ও নীতি প্রত্যহ এক আধ ঘণ্টার উপদেশে পরিসমাপ্ত হইবে না ; ইহা ছাত্র জীবনের নিত্য সহচর হইবে ও তাহাদিগের জীবন গঠিত করিবে।

(৩) গুরুশিষ্যে সম্বন্ধ এবং দেশ হিতৈষ্যা—গুরু শিষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা সংস্থাপন এবং এক পক্ষে হৃদয়ের কোমলতা হইতে উদ্ভূত পিতৃস্নেহসিক্ত অথচ কঠোর ন্যায় কর্ত্তব্যপরতা ও অপর পক্ষে প্রফুল্ল ও অকপট নির্ভরতা ও অজ্ঞানুবর্ত্তিতা স্থাপন করা যেমন একান্ত প্রার্থনীয় ; পরস্পরের আর্থিকবন্ধন অর্থজনিত না হইয়া প্রেমজনিত হওয়া ততোধিক আবশ্যক। যে সকল অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত ছাত্রদিগের সমূহ হিতচিন্তায় উদাসীন থাকিবেন স্কুল বা কলেজে তাহাদিগের স্থান হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাদানে আনন্দিত হয়েন এবং উপদেশকের পবিত্র দায়িত্ব অনুভব করিয়া থাকেন তাঁহারাই স্থায়ীরূপে শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। বিদ্যালয়ের উপর যাঁহাদের আন্তরিক টান, ইহার গৌরবে আপন গৌরব জ্ঞান করিবেন যাঁহারা ইহার কার্য্য সফলতার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন এবং যাঁহারা ছাত্রদিগকে আপন সন্তান, বিদ্যালয়কে আপন গৃহ বিদ্যালয়কে আপন গৃহস্থালী জ্ঞানে ইহার হিত চিন্তায় নিরত থাকিবেন তাঁহারাই শিক্ষকের পদে স্থায়ী হইবেন। তাঁহারা আপনাপন দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্র-

গণকে মানবের মহত্ব, সরলতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে সুস্থ সবলকায় করিবার জন্যও আপনারা দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইবেক। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রকৃত তেজ ও সৎসাহস (Public Spirit) উৎপাদনে বিশেষ যত্নবান হইবেন, তাহা হইলে তাহাদিগের সুশৃঙ্খলা ও নিরালস্য পরিপোষণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবেনা—ক্রমে দেখিবেন ঐ বৃত্তিদ্বয় স্বতঃ পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে। যাহা কিছু নীচ, প্রতারণা, চাতুরীপূর্ণ, কুৎসিত, কাপুরুষতাসূচক, পাপজনক সে সমস্তই শিক্ষক এবং ছাত্রগণ ঘৃণার্হ মনে করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরিহার করিবেন। অনার্য্যসেবিত পদার্থ মাত্রেই ছাত্রগণ স্বয়ং ঘৃণাসহকারে দূরে নিক্ষেপ করিতে শিখিবেন ও করিবেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকে যতক্ষণ জগৎ সমক্ষে গর্ব্বিত স্বরে "আমি বারাণসীর হিন্দু কলেজের ছাত্র" এই কথা বলিতে না পারিবেন তাবৎ তাঁহাদিগকে আদর্শ জীবন অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত ও উত্তেজিত করা হইবে।

(৪) সংস্কৃতের প্রাধান্য স্থাপন—কলেজের ছাত্রগণ প্রাচীন ভারতের যশোকীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করিবে এবং তাহার অতুলনীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের মহত্ব জগৎ সমীপে প্রদর্শন পূর্ব্বক জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিবে এইরূপ আশা করা যায়। হিন্দু শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে পূর্ণ আস্থাবান এবং সংস্কৃত ও ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক তৎসমুদায় সুন্দররূপে অনুবাদিত হওয়া ব্যতীত ভারতের—জগতে তাহার সমুচিত আদর হওয়া সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান কালে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য রাজ্যের কোন স্থানে এরূপ অনুবাদ পাওয়া দুর্ঘট। কেবল তত্ত্বসভা হইতে এইরূপ দুই একটি মাত্র আশাপ্রদ শিক্ষার্থী আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র কিন্তু এরূপ শত শত ব্যাক্তি বারাণসী হিন্দু কলেজের জয় ঘোষণা করিয়া প্রতীচ্য ছাত্রসঙ্কুল জগতে ভারতের নাম উচ্চতম স্থানে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে।

হিসাব দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ন্যূন কল্পে বাৎসরিক ৩০,০০০, টাকা ব্যয় না করিতে পারিলে প্রাগুক্ত কার্য্য চলিবে না। গৃহ নির্ম্মাণ ও গৃহ সামগ্রীর নিমিত্ত ১,০০,০০০ টাকা ব্যতীত অন্ততঃ ৭,০০,০০০ টাকা স্থির করা আবশ্যক। এই পরিমাণ প্রথম দৃষ্টিতে অধিক বোধ হইতে পারে কিন্তু যে কার্য্যের জন্য ইহার আবশ্যকতা, তাহাত সামান্য নহে। প্রাচীন-স্মৃতি-গর্ব্বিত, বর্ত্তমানে.

মহিমান্বিত এবং ভবিষ্যৎ গৌরবাস্পদ একটি হিন্দুজাতি সৃষ্টির জন্য—জগৎকে—মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মপ্রসূ, দর্শনবিজ্ঞানের নিকেতন প্রাচীন আর্য্যবর্ত্ত প্রদর্শনার্থ, পুনঃ প্রাপ্তির জন্য জগতের আধ্যাত্মিকগুরু ভারতকে তাঁহার নষ্ঠ সিংহাসনে পুনঃ স্থাপনার্থ এই অর্থের প্রয়োজন। এইরূপ মহৎ কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত অর্থ প্রাবৃট বর্ষণের ন্যায় বর্ষিত হওয়া উচিত। ধর্ম্ম ও বিদ্যা শিক্ষা কার্য্য পরিপোষণ মানসে কাশিরাজ উক্ত কলেজের জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়া রাজোচিত কার্য্য করিয়াছেন।

এই মহান্ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাতৃগণ আর একটি আবশ্যকীয় বিষয় লক্ষ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। হিন্দুজাতি সাধারণতঃ দরিদ্র, অথচ রাজকীয় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষিত হওয়া বহু ব্যয়সাধ্য। দারিদ্র নিবন্ধন অধিকাংশ আর্য্যবংশীয় বুদ্ধিমান ছাত্র পাশ্চত্যবিদ্যা শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কেবল সংস্কৃত শিখিয়া তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগগ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পরস্পর মিলন জনিত অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় জীবনের একতা সূত্র বিচ্যুত হইয়া পড়েন। ইহাতে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক উৎপন্ন হইতেছে—একটি সাংসারিক উন্নতি পারদর্শী পাশ্চত্য ভাবান্বিত, ধর্ম্মবিবর্জ্জিত অপরটী পণ্ডিত পদবাচ্য, স্বধর্ম্ম নিরত দার্শনিক হইয়াও জগতের বিশাল ক্ষেত্রে মিলিতে অক্ষম বলিয়া সংকীর্ণ ভাবাপন্ন। এইরূপ দুইটি জাতীয় তন্ত্রীতে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাল বাজিয়া ঐক্যতানের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছে।

বারাণসী হিন্দু কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইবেন, তাঁহারা পাশ্চত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত অথচ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষায় পবিত্রীকৃত ও উদরতা-মণ্ডিত এবং উচ্চাদর্শ স্থানীয় হইয়া এক্ষণকার প্রতক্ষবাদী জাতিকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন—দুইটি বিভিন্ন তন্ত্রীকে সমস্বরে বাঁধিয়া একতালে বাজাইয়া দিবেন। অধ্যয়নশীল দরিদ্র হিন্দু যুবকগণকে কলেজ প্রদত্ত শিক্ষার সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জাতীয় উন্নতির সোপান স্বরূপে সংগঠিত করিবার জন্য বিদ্যালয়ের বেতন সামান্য অর্থাৎ মাসিক ।০ হইতে পাঁচটাকা পর্য্যন্ত স্থির করা হইল। এইরূপে বর্ত্তমানের দারিদ্র্য বিদলিত সাধারণতঃ ধীশক্তি সম্পন্ন যুবকবৃন্দ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া জগৎ সমক্ষে মাতৃভূমির উজ্জল ছবি ধারণক্ষম হইবেন।

এক্ষণে কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর এবং ভারতের আশ্রয় স্থল মহর্ষিগণ এই মহৎ-কার্য্যে কৃপাদৃষ্ট করুন।

স্কুল, কলেজ এবং ছাত্রাবাসগৃহ সত্বরই আরম্ভ করা আবশ্যক হওয়ায় অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; এজন্য সর্ব্বত্রই সকল ধার্ম্মিক এবং স্বদেশ হিতৈষী হিন্দু ও ভারত বন্ধু দিগের নিকট আবেদন করা যাইতেছে। অল্পই হউক আর অধিকই হউক মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন দানকরেণেচ্ছুকগণ, বোর্ড অব্ ট্রাষ্টির অবৈতনিক সম্পাদক বাবু গোবিন্দদাস, দুর্গাকুণ্ড অথবা বারাণসীর বেঙ্গল ব্যাঙ্কে, হিন্দু কলেজের হিসাবে সত্বর প্রেরণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে সাহায্য করিবে।

এই বিদ্যালয় তত্ত্বসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ও পরিপুষ্ট, কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত ইহা যেন সর্ব্বজন বিদিত থাকে।

উপসংহারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, এই বিদ্যালয় যেন স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া, ভারতবর্ষীয় আর্য্য বিশ্ব বিদ্যালয় অভিধানে মুলকাণ্ড রূপে সমগ্র ভারতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

দোল-সঙ্গীত।

ভৈরবী।—একতালা।

কিবা দুলিছে ভুবন মোহন। দ্বাদশ দল কমল দোলায় কমলিনি সনে কমল নয়ন।
প্রেম পবনে দোলাইছে দোলা, দেখরে মানস অপরূপ লীলা,
(যেন) অচলা চপলা কোলে করি করে খেলা নবিন নীরদ প্রেমে নিমগন।
দ্বিদলে ত্রিবেণী মহাতীর্থধামে, শশাঙ্ক শেখর গৌরী লয়ে বামে,
নিরখি নয়নে সেই রাধা শ্যামে, আনন্দ সলিলে ভাসে অনুক্ষণ;
প্রেমাবেসে দিগম্বর দিগম্বরী, নাচিছে বলিছে হরি হরি হরি,
শ্রীরাধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী জয় যদুপতি লক্ষী নারায়ণ।
মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মোপরে, সাপিনি নিদ্রিতা ছিল নত শিরে,
দোলের গোলেতে জাগরি শিহরে, উর্দ্ধমুখে প্রেমে করে নিরীক্ষণ;
দীনরাম বলে পূর্ণিমার দিনে, যতনে গোপনে অন্তর নয়নে,
হেরিলে এ দোল জনম মরণে, অনাসে জিনিতে পারে সর্ব্বজন।

শ্রীরামলাল দত্ত।

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা।

পান্থশালা।

(পারস্য জ্ঞান ভাণ্ডার অবলম্বনে)

একদা একজন দর্বেষ তাতার দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে বাল্ক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐ নগর পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজপ্রাসাদ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত, সন্নিকটে রাজপ্রাসাদের বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়া উহাকে পান্থ-নিবাস মনে করিয়া সেই স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন, এবং সুযোগ ক্রমে সেই প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পর্য্যঙ্কস্থিত দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যার উপর কম্বল বিছাইয়া তদুপরি শয়ান হইয়া আরাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপ অতিবাহিত হইলে প্রহরীগণ তাঁহার সমাগম বার্ত্তা অবগত হইল এবং তাঁহাকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে হে বাপু তুমি, তোমার যে বড়ই আস্পর্দ্ধা—তুমি কি সাহসে রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিয়া আছ?" দর্ব্বেষ নিরুত্তর—তাহাদের কথা যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশই করে নাই, তিনি পূর্ব্ববৎ হস্ত পদাদি প্রসারিত অবস্থায় শয়ন করিয়াই রহিলেন। তদ্দর্শনে প্রহরিগণ সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল। তখন তিনি বিনীত স্বরে কহিলেন "বাবা, বেচারা দর্ব্বেষের উপর এরূপ অত্যাচার কেন? আমি স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়াছিলাম অনর্থক কেন আমার শান্তিভঙ্গ করিতেছ ইহাতে তোমাদের ক্ষতিই বা কি হইতেছিল? আমার ইচ্ছা যে, অদ্য রজনী এই পান্থ-নিবাসেই অতিবাহিত করিব।"

প্রহরিগণ তাঁহাকে দর্ব্বেষ বলিয়া জানিতে পারিয়া কহিল "মহাশয় এ পান্থ-শালা নহে—রাজ প্রাসাদ।"

যৎকালে তাহাদিগের এইরূপ বাক বিতণ্ডা চলিতে ছিল, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সুল্‌তান সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দাঁড়াইলেন দেখিয়া, প্রহরিগণ নিজ নিজ দোষ ক্ষালণার্থ দর্ব্বেষের নামে অনুযোগ করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের অনুযোগে কর্ণ পাত করিলেন না; কিন্তু দর্ব্বেষের এইরূপ ভ্রম দেখিয়া একটু মুচকাইয়া হাসিয়া

কহিলেন—"মহাশয়, আপনার বিষম ভ্রম হইয়াছে। আপনি রাজপ্রাসাদ ও পান্থনিবাসের প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন না।"

এতচ্ছ্রবণে দর্ব্বেষ কহিলেন "জাঁহাপনা যদ্যপি ক্ষমা করেন তাহা হইলে আমি দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দানে বাধিত করুন।"

সুল্‌তান। "আপনার কি প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা করুন।"

দর্ব্বেষ। "যখন এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় তখন এখানে কে বাস করিতেন?"

সুল্‌তান। "আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ।"

দর্ব্বেষ। "তাঁহাদের পরে—আপনার পূর্ব্বে কে ছিলেন?"

সুলতান। "আমার পিতা থাকিতেন।"

দর্ব্বেষ। "এক্ষণে কে বাস করিতেছেন?"

সুলতান। "আমি।"

দর্ব্বেষ। "আপনার পরে কাহার থাকিবার সম্ভাবনা?"

সুল্‌তান। "আমার পুত্র—যুবরাজের।"

দর্ব্বেষ। "এখন বলুন দেখি, এই বাসস্থানকে পান্থ-নিবাস বলাতে আমার কি অপরাধ হইয়াছে—যখন এই অল্পকাল মধ্যে ক্রমান্বয়ে এতগুলি লোক এখানে বাস করিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কতজন পরে পরে আসিয়া কিছুদিনের জন্য অবস্থান করণান্তর অন্যকে স্থান দিয়া চলিয়া যাইবে—যখন এই প্রাসাদের অধিবাসীর অস্থায়ীত্ব এত অধিক, তখন ইহাকে পান্থশালা ব্যতীত আর কি বলিব? জগৎই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা নিয়মের অধীন কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আপনি অদ্য আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি বলে কিছুদিনের জন্য আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। কিন্তু যখন আপনার আত্মা এই দেহ ছাড়িয়া যাইবে, তখন যাহারা আপনার পরম সুহৃদ্‌-প্রিয় হইতে প্রিয়তর—তাহারাই তখন আপনার দেহকে এই প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিবে। এই রাজপ্রাসাদ বলিয়া নহে, প্রকৃত পক্ষে এই পৃথিবীও জীবরূপ পথিকের পান্থনিবাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজ আসিয়াছি কাল চলিয়া যাইতে হইবে। প্রকৃত নিবাস সেই "পরমপদম্।"

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

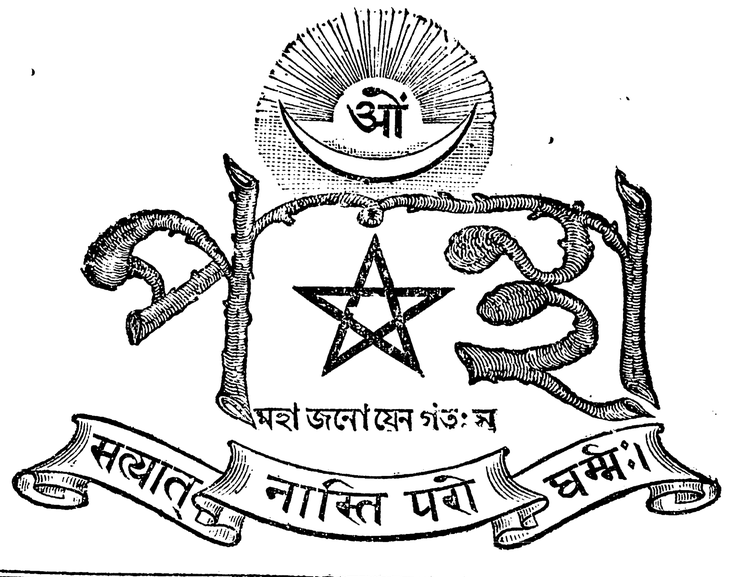

২য় ভাগ। } চৈত্র ১৩০৫ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

আদর্শ-দর্শনে।

বলগো সুধাই ওগো সুধাই তোমায়,
আমি কি আশার গান গাহিব আবার?
হয়েছে কি চিত্ত তবে আর্দ্র করুণায়,
আজি চিরদিন পরে এবে দেবতার?
তুমি কি আদেশে তাঁরি আসিলে আজিকে
পবিত্র উদার স্বর্গ হইতে নামিয়া?
আজি মম হৃদয়ের যেন চারিদিকে
স্বর্গের আভাস মধু উঠিছে জাগিয়া।
পূর্ণিমার আলো স্পর্শে সিন্ধুর হৃদয়ে
যেমন সুষমারাশি হয় উদ্ভাসিত।

কোথা শতলক্ষ পুষ্প বিজন নিলয়ে
অকস্মাৎ হইয়া উঠেছে বিকশিত ?
তাহারি সৌরভ যেন ভরিছে ভুবন !
আমারে তুলিছে হায় করিয়া ব্যাকুল !
চির অতৃপ্তিরে পুনঃ করিয়া নূতন,
আমারে কে যেন আজ করিছে বিভুল !

যে পরশমণি তরে খুঁজিয়াছি হায়,
আজীবন, আজীবন অশ্রান্ত সন্ধানে
কতবার মরুমাঝে মৃগ তৃষ্ণিকায়,
মোহিত হয়েছি, তার সংখ্যা কেবা জানে।
অঙ্কিত এ বক্ষোমাঝে স্তরে স্তরে স্তরে
নিরমম নিরাশার শত পদক্ষেপ ;
সমস্ত হৃদয়দেশ সমাচ্ছন্ন ক'রে—
ক্ষতের উপরে শুধু ক্ষতের প্রলেপ !

শতবার নিরাশায় দগ্ধ এ হৃদয়
গাবে কি আশার গান আর একবার ?
বল তুমি একবার, ভুলে এ তো নয়
ধরিয়াছ যে আদর্শ নয়নে আমার ?
তুচ্ছ এ ধূলির পৃথ্বি মনে আশা হয়,
ওই আদর্শের বলে স্বর্গ হবে জয়।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

সাধক-প্রার্থনা।

(১)

কদা বৃন্দারণ্যে নবঘননিভং নন্দতনয়ম্
পরীতং গোপীভিঃ ক্ষণরুচিমনোজ্ঞাভিরভিতঃ।
গমিষ্যামস্তোষং নয়নবিষয়ীকৃত্য কৃতিনো
বয়ং প্রেমোদ্রেকস্খলিতগতয়ো বেপথুভৃতঃ॥

হেন দিন হবে কবে বৃন্দাবন ধামে
নন্দের নন্দন সেই নবঘনশ্যামে
বেষ্টিয়া রহিবে যত গোপাঙ্গনাগণ
বিদ্যুতের মত সুশ্রী যাদের বরণ,
দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি অবিরল
সার্থক করিব মোরা নয়ন যুগল ;
অবশেষে পতিশূন্য হয়ে প্রেমভরে
দাঁড়াইয়া রব সবে কম্পিত-শরীরে !

(২)

কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটং।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

হেন দিন ভাগ্যে মোর আসিবে কখন
কাশীধামে গঙ্গাতীরে করিয়া গমন

কৌপীন বসনখানি অঙ্গে জড়াইয়া
ধীরে ধীরে হস্ত দুটী মাতায় তুলিয়া
"ওহে শিব, ওহে শম্ভু, ওহে ত্রিলোচন!
ওহে গৌরীনাথ, ওহে ত্রিপুরদমন!
কৃপাদৃষ্টি মোর প্রতি কর একবার
তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর"
বলিতে বলিতে আমি নিমেষ ভাবিয়া
জীবনের দিন কটা দিব কাটাইয়া!

(৩)

কদা বাযোধ্যায়াং বিমলসরযূতীরপুলিনে
চরন্তং শ্রীরামং জনকতনয়ালক্ষ্মণযুতম্।
অয়ে রাম স্বামিন্ জনকতনয়াবল্লভ বিভো
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

এ দিন কি ভাগ্যে মোর ঘটিবে অচিরে
যে দিন অযোধ্যাধামে সরযূর তীরে
দেখিব শ্রীরাম সীতা-লক্ষ্মণের সনে
ধীরে ধীরে ভ্রমিছেন পুলকিত-মনে;
"ওহে বিভু, ওহে প্রভু, ওহে সীতাপতি
কৃপা কর তুমি এই অধমের প্রতি"
বলিতে বলিতে আমি নিমেষ ভাবিয়া
জীবনের দিন কটা দিব কাটাইয়া!

(৪)

কদা কালিন্দীয়ে হরিচরণপদ্মাঙ্কিততটে
স্মরন্ গোপীনাথং কমলনয়নং সস্মিতমুখম্।
অহো পূর্ণানন্দাম্বুজবদন ভক্তৈকশরণ
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

এদিন কি ভাগ্যে মোর ঘটিবে অচিরে
হরি-পাদ-পদ্মাঙ্কিত যমুনার তীরে,
স্মরিয়া যেদিন সেই কমল-নয়ন
সহাস্য-বদন পুনঃ গোপিকারমণ,
"ওহে পূর্ণানন্দ, ওহে পঙ্কজবদন
কৃপা কর মোরে, ওহে ভক্তের জীবন"
বলিতে বলিতে আমি নিমেষ ভাবিয়া
জীবনের দিন কটা দিব কাটাইয়া!

(৫)

কদা বৃন্দারণ্যে বিমলযমুনাতীরপুলিনে
চরন্তং গোবিন্দং হলধরসুদামাদিসহিতম্।
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ মধুরমুরলীমোহন বিভো
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

হায়রে এমন ভাগ্য হবে কোন দিনে
যে দিন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে
দেখিব স্বয়ং কৃষ্ণ পুলকিত হয়ে
শ্রীদাম-সুবল-বলরাম আদি লয়ে
কেলিরস-সুধা-পানে বিভোর হইয়া
ভ্রমিছেন ধীরে ধীরে তথায় থাকিয়া;
"ওহে কৃষ্ণ! ওহে নাথ! মুরলীমোহন!
কৃপা কর;—আমি অতি অভাজন জন"
বলিতে বলিতে আমি নিমেষ ভাবিয়া
জীবনের দিন কটা দিব কাটাইয়া!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ।

১ মুক্তি ও মুক্ত। ২ নির্ব্বাণ। ৩ কৃষ্ণসেবা।

কবিবর রায় ভারতচন্দ্র গুণাকর তাঁহার রচিত অন্নদামঙ্গল নামক গ্রন্থে জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণার ভবানন্দ ভবনে যাত্রোপলক্ষে লিখিয়াছেন, যে মা অন্নপূর্ণা পথে এক নদীতীরে উপনীত হইয়া ঈশ্বরী পাটুনী নামিকা এক খেয়ানি পত্নীকে স্বীয় স্বামীর পরিচয়-প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও বলিলেন, "কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ।" ইহা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি; এইরূপ স্তুতি করাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার কহে। এই স্তুতি কি? না, অসীম, অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ ব্যোমকেশ ভগবান মহাদেবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যযোগ্য কোনই গুণ নাই; তিনি গুণাতীত, তাই তিনি নির্গুণ। ঈশ্বরী পাটুনী যৎসামান্যা পাটুনির মেয়ে; যিনি পূজ্যতম যোগী ঋষিগণের ধ্যানযোগগম্যা, সামান্যা ঈশ্বরী পাটুনী সেই লীলাময়ীর লীলা ও মায়া কি বুঝিবে? সেই সরল হৃদয়া পাটুনিমেয়ে মনে করিল, "মেয়েটী বড়ই সুন্দরী, রূপ লাবণ্যের আধারভুতা, সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না! আহা! এইরূপ লাবণ্যময়ী হইয়াও বাছা বড়ই অভাগিনী; বাছার স্বামীটী নিতান্তই অপদার্থ, তাহার কিছুমাত্রই গুণগরিমা না থাকাতে তাহাকে কপাল-পোড়া বলিয়া গালি দিতেছে।" আর আমরা এই প্রস্তাবটীর শিরোনামা দেখিয়াই জানিতে পারি যে ইনি বিশ্বেশ্বরী মা অন্নদা, ভক্তবৎসলা মা ভক্তের প্রতি দয়া পরবশা হইয়া ভক্তভবনে যাত্রা করিয়াছেন; কাজেই ঈশ্বরী পাটুনীর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাহাকে সামান্যাবোধে উপহাস ও উপেক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু বিশেষ-রূপে অনুধাবন করিলে আমরা বিদ্যাদিগ্‌গজগণ প্রায় সকলেই ঈশ্বরী পাটুনী অপেক্ষা বুদ্ধি বিবেচনায় ন্যূন বই সরেস নহি। "ঈশ্বর নির্গুণ," এইটী পাঠ করিয়া কি আমরা বুঝি নাই, যিনি নির্গুণ, তাঁহার একটা অভাব আছে, অর্থাৎ গুণের অভাব; যাঁহার গুণ নাই, তিনি আবার সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ কিরূপে? কিন্তু শাস্ত্রে বলে, এই নির্গুণ অর্থে গুণাতীত; তিনি নিরাকার

অর্থে, তিনি পার্থিব আকারবিশিষ্ট নহেন, তিনি তদতীত। সত্ব, রজো ও তমো এই গুণত্রয় পরিবর্ত্তনশীল ও বিনশ্বর; তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংশ আছে; গুণ পার্থিব জিনিশ, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যযোগ্য; ভগবান্ অপার্থিব, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রামের গ্রাহ্যযোগ্য নহেন, তাহার অতীত, অথচ সমস্তের মূলেই তিনি ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান আছেন।

প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ মুক্তি কি, ও মুক্ত কাহাকে বলে? দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাণ শব্দের গুহ্য তাৎপর্য্য কি, ও তদ্দ্বারা কি বুঝায়? তৃতীয়তঃ "কৃষ্ণসেবা" এই বাক্যের প্রকৃত ও নিগূঢ় অর্থ কি?

এখন একে একে এই তিনটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করা যাউক।

সত্ব, রজো ও তমো এই গুণত্রয় লইয়াই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। সৃষ্টির অবসান সময়ে যখন প্রলয়কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন ভগবান হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন; তখন উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা অপনোদিত হইয়া সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়; সমস্ত সৃষ্টপদার্থ বহুত্ব পরিত্যাগ করিয়া একত্বে পরিণত হইয়া পরাৎপর সেই পরব্রহ্মে গিয়া বিলীন হয়। অতএব দেখা গেল যে, গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থায়ই যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বহুত্ব বা পৃথকত্ব প্রাপ্ত হয়, কারণ সৃষ্টি প্রকরণের মূলই ঈশ্বরের বহুত্ব হইবার ইচ্ছা। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় তাহারা সকলে বহুত্ব ও পৃথকত্ব হারাইয়া একাকার হইয়া পরিণামে সেই একেই লয়প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা, স্থাবর, জঙ্গম, প্রাণী, অপ্রাণী, জগতের যাবতীয় পদার্থই কথিত ত্রিগুণযুক্ত। তবে বস্তুভেদে পরিমাণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কাহার মধ্যে সত্বগুণ প্রধান; কাহারও মধ্যে রজোগুণ প্রধান, কাহারও মধ্যে তমোগুণ প্রধান, কাহার মধ্যে সত্বরজো এতদুভয় মিশ্রিত গুণ বিদ্যমান, আবার কাহারও মধ্যে রজোস্তমো এই মিশ্রগুণ বর্ত্তমান। সত্বগুণের আদর্শ দেবতাগণ, তাঁহারা সত্বগুণের আধার, এই জন্যে তাঁহাদের প্রকৃতিকে দৈবপ্রকৃতি অর্থাৎ সাত্বিক প্রকৃতি কহে। যক্ষরাক্ষসাদি রজোগুণের আধার, ভূতযোনি সমূহ তমোগুণের আধার। মানব রজস্তমো এই মিশ্রগুণদ্বয় বিশিষ্ট। একদিকে দেবতাগণ যেমন সত্বগুণের চরম উৎকর্ষ, সেইরূপ স্থাবর তমোগুণের চরম উৎকর্ষ ও সত্বগুণের চরম অপকর্ষ। সত্বের লক্ষণ নির্ম্মলতা,

রজোগুণের লক্ষণ কার্য্যকারিতা, এবং তমোগুণের লক্ষণ জড়তা। জগতে এই গুণত্রয় বিদ্যমান থাকাতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তির পর স্থিতি, স্থিতির পর বিনাশ, বিনাশের পর পুনরায় ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য ধারা-বাহিকরূপে আবহমানকাল যাবৎ চলিয়া আসিয়া একরূপ হইতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥

সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু মূঢ়-চেতা ব্যক্তিগণ অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে সেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন।

প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মসম্পাদন করেন, আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যগ্দর্শী।

সত্ব, রজো ও তমো এই গুণত্রয়ের অনুযায়ী কর্ম্মের বিভাগ ও তারতম্যানু-সারেই গুণময়ী মায়া কার্য্য করিতেছেন; তাহাতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসি-তেছে। মনুষ্যাদি জীব জন্তু নিমিত্তভাগী মাত্র, কিন্তু মায়াপাশে আবদ্ধ জীব অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহা জানিতে না পারিয়া "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" ইত্যাকার বৃথাভিমান করিয়া থাকে।

বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীব দুইপ্রকার। যাহারা এই ত্রিগুণের বশীভূত তাহারা বদ্ধ, এবং যাহারা ত্রিগুণাতীত তাহারা মুক্ত। বদ্ধজীব গুণক্রিয়াবশে বাধ্য হইয়া যে সমস্ত সদসৎ কার্য্য করে, তাহারা অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। ত্রিগুণাতীত না হইলে, জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ান্তর নাই। সত্বগুণের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, তাহার ফল সুখভোগ। রজো গুণ কর্ম্মের উৎপাদক, তাহার ফল বিষয়ে অভিলাষ, ভোগবাসনায় অনুরাগ ও আসক্তি। তমোগুণ মোহোৎপাদক, তদ্দ্বারা জীব নিদ্রালস্য, প্রমাদ ভোগ করিয়া থাকে।

সাত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণও মায়াপাশে আবদ্ধ। অবিদ্যার বশে, "আমি সুখী", "আমি জ্ঞানী", ইত্যাকার অলীক কল্পনা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকাতে তাহারা সুখভোগে ও জ্ঞানগৌরবে আসক্তচিত্ত, কাজেই ভবকারা-গারের মায়াপাশ ছেদন করিতে তাহারা অসমর্থ; তবে তমোগুণীর পায়ে লৌহ নিগড়, সত্বগুণান্বিতের পায়ে স্বর্ণশৃঙ্খল! এই মাত্র যাহা প্রভেদ, কিন্তু উভয়েই পাশাবদ্ধ, জন্মমৃত্যুর অধীন।

এখন গুণাতীত কাহাকে বলে? যিনি সত্ব, রজো ও তমো এই ত্রিগুণকে বশীভূত করিয়াছেন, এই গুণত্রয় যাঁহার উপর কোনরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, তাঁহাকেই গুণাতীত কহে। মুক্ত ও মুক্তি কাহাকে বলে? যিনি গুণাতীত তিনিই মুক্ত, এবং ত্রিগুণের অতীত যে অবস্থা বিশেষ তাহাকেই মুক্তি কহে। এই মুক্তি লাভ হয় কিসে? ভগবৎভক্তি ও ভগবৎ সেবা দ্বারা তাহা লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান মুকুন্দের শ্রীচরণাম্বুজে ভক্তি কুসুমের প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া নিয়ত সানুরাগে তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি ত্রিগুণের অতীত মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানুবাচঃ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যোন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীত স উচ্যতে॥
গুণা নেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ র্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মাভূয়ায় কল্পতে॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে পাণ্ডব! প্রকাশক আলো, প্রবৃত্তি এবং মোহ স্বত উপস্থিত হইলেও যিনি দ্বেষ করেন না এবং ঐ সমস্তের অভাব হইলেও যিনি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না। যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া গুণ সমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, প্রত্যুত গুণ সকলই স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করেন এবং কিছুতেই বিচলিত হন না, সুতরাং যাঁহার সুখ দুঃখে সমভাব, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্যবোধ, এবং স্তুতি ও নিন্দায় তুল্য দৃষ্টি; যিনি মান ও অপমান, শত্রু পক্ষ ও মিত্র পক্ষকে সম জ্ঞান করেন, এবং যিনি সর্ব্ব আরম্ভ পরিত্যাগী তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

দেহী দেহ সমুদ্ভূত এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধি জনিত ক্লেশ—হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে।

যিনি একাগ্রচিত্তে ভক্তিযোগে আমার সেবা করেন, তিনি বর্ণিত গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপযুক্ত হন।

সাধন প্রণালীকে সাধারণতঃ জ্ঞান কাণ্ড, কর্ম্ম কাণ্ড ও ভক্তি কাণ্ড, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড প্রাগুক্ত জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের অন্তর্নিবিষ্ট। ভক্তি ও জ্ঞান এতদুভয়ই কর্ম্মের সাপেক্ষ, তাই কর্ম্ম কাণ্ডকে পরিত্যাগ করিলে সাধন প্রণালীকে জ্ঞান ও ভক্তি, এই দুই স্থূল প্রধানভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু মুক্তি এতদুভয়ের অবিভাজ্য সাধারণ সম্পত্তি। মুক্তাবস্থা ভক্তিমার্গের পক্ষে যেমন অবশ্যম্ভাবী, জ্ঞানমার্গের পক্ষেও ঠিক্ তদনুরূপ। উভয় পথাবলম্বী সাধকদিগকেই ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা সাধন পক্ষে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

আধুনিক অনেকানেক বৈষ্ণবগণ মুক্তিকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য মুক্তির অর্থে গ্রহণ করতঃ মুক্তির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "মুক্তি চাই না ভক্তি চাই, শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্য্য চাই।"

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ

যতদিন ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত কিরূপে সেই হৃদয়ে ভক্তি সুখের অভ্যুদয় হইবে?

ইহাতে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এইরূপ ভুক্তি মুক্তি শব্দের প্রয়োগ ও তৎপ্রতি কটাক্ষপাত দেখিয়াই কেহ কেহ মুক্তিকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য মুক্তি অর্থে গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কারণ এইরূপ স্থলে পিশাচী ভুক্তি মুক্তি অর্থে মায়াবিনী বাসনা বা ভোগতৃষ্ণা, যাহা অতিক্রম না করিলে প্রকৃত মুক্তিলাভ করা যায় না। তাই পূজ্যপাদ বৃন্দাবন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

আগে হয় মুক্তি তবে ভব-বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ভক্তি পথে ভগবানে ও ভক্তে পরস্পর উপাস্য উপাসকের ভাব বিদ্যমান থাকে; ভগবান বাসুদেব উপাস্য, ভক্ত সাধক উপাসক। শ্রীভগবানে ও জীবে আবহমান কাল হইতে পরস্পর পার্থক্য ভাব, দ্বৈতভাব চলিয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ব্যাপিয়া তাহা চলিতে থাকিবে। ভগবানের সেবা কার্য্য লাভ করাই ইহার পরিণতি, চরম উৎকর্ষ এবং পরম পুরুষার্থ।

অপর পক্ষে, জ্ঞান মার্গে উপাস্য উপাসকের ভাব রহিত; দ্বৈতভাব বিহীন, এবং ভগবৎ সেবারও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্," এক ভিন্ন দ্বিতীয় আর নাই, একই অদ্বিতীয়; এই জগৎ ও তদ্স্থিত জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় বস্তুরই সেই এক হইতে উদ্ভব, একে স্থিতি এবং পরিণামে সেই একেই বিলয় হইয়া থাকে। এই যখন জীবের পরিণাম, তখন জীব উপাসনা করিবে কাহার? যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সমস্ত সৃষ্টিই ব্রহ্ম স্বরূপ, তখন কে কাহার উপাস্য ও কে কাহার উপাসক? "সোঽহং" আমি সেই (I am That) অর্থাৎ আমি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, জীবের হৃদিস্থিত আত্মায় ও পরমাত্মায় মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই, উভয়ই এক। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই (Thou art That), অর্থাৎ তুমি এবং ব্রহ্মে একই পদার্থ, কোন ইতর বিশেষ নাই। ইহা উপলব্ধি কর। অদ্বৈতভাব ইহার বিশেষত্ব। জ্ঞানমার্গের সাধকগণ পরমাত্মার অনুগ্রহ নিগ্রহের পক্ষপাতী নহেন। কঠোর তপস্যা ও

সাধনা দ্বারা, স্বকীয় আয়াস দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইব, চেষ্টা উদ্‌যোগের ফল অনিবার্য্য ;—যাহা করিবনা, তাহার ফলও পাইতে পারিব না, এবং তদতিরিক্ত ফলও কেহ দিতে পারিবে না ; তবে যাহা করিব তাহার ফল লাভ ও অনিবার্য্য ; তাহা হইতে কেহ আমাকে বঞ্চিতও করিতে পারিবে না, সমস্তই আমার নিজ কৃত কর্ম্মের ফল, তখন অনুগ্রহ নিগ্রহে আইসে যায় কি ? আবার কে কাহাকে অনুগ্রহ করে, কেই বা কাহাকে নিগ্রহ করে ? একমাত্র অদ্বৈত ভাব ও তাহা উপলব্ধি করাই জ্ঞানমার্গের বিশেষত্ব ; তৎপর প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া পরিণামে নির্ব্বাণ অর্থাৎ কৈবল্য মুক্তি লাভ করাই ইহার চরম উৎকর্ষ ও পরম পুরুষার্থ। কিন্তু ভক্তিমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ অধিকতর ক্লেশকর ও কঠোর ; তাই জ্ঞানমার্গ আপামর সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক নহে ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অচল, অটল সাধকেরই ইহা অবলম্বনীয় ; এইরূপ সাধকের সংখ্যা অতি বিরল।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। দেহাভিমানীগণ অতি দুঃখে অক্ষরাত্মিকা গতি লাভ করে।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যাদিতে পড়িলাম বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ অর্থে চিরধ্বংশ (Annihilation); দেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের এককালীন বিলোপ ! কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকেনা ! বিষম কথা !!

বাস্তবিকও চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ বাসী হীনযান-পন্থী অনেক বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ অর্থে এককালীন্ ধ্বংশ এই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া জীবন সংগ্রামে শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইলেই লোম হর্ষণ আত্মহত্যারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ইহ জীবনের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সকল দেশে এইরূপে অসংখ্য নর নারী আত্মহত্যা দ্বারা প্রতিবৎসর জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। বাস্তবিক এখন দেখি, নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ চিরধ্বংশের বিপরীত ; নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্ম সাযুজ্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ চিরধ্বংশ বা Annihilation এর ঠিক্ বিপরীত। মহাযান-পন্থী বৌদ্ধগণ এবং অদ্বৈত বাদীগণও নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্ম সাযুজ্যই বুঝিয়া

থাকেন। নির্ব্বাণী বা কৈবল্য মুক্ত সাধকের জ্ঞান চৈতন্য প্রসারিত হইতে হইতে ব্রহ্ম চৈতন্যে গিয়া মিশিয়া এক হইলেও তাঁহাদের স্ব স্ব চৈতন্য কেন্দ্র বিদ্যমান থাকে।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরা রামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ ॥
কাম ক্রোধ বিমুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্ম নির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি ॥ গীতা।

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম এবং আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মে অবস্থিতি হইয়া ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হন।

যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট, সংশয় ছিন্ন ও চিত্ত সংযত হইয়াছে এবং যাঁহারা সর্ব্ব প্রাণীর হিত সাধনে রত সেই ঋষিগণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

কাম ক্রোধ বিমুক্ত, সংযত চিত্ত, আত্ম তত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের জীবিত ও মৃত এতদুভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ (মোক্ষ) বর্ত্তমান আছে।

যোগী ব্যক্তি ঐরূপ সতত সংযত চিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ লাভের উপায়ভূত মৎস্বারূপ্য স্বরূপ শান্তি লাভ করেন।

পুণ্য প্রেমের আধার, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এই নির্ব্বাণের মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন ;

কারণ ভাষায় এমন বাক্য নাই যদ্দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে ; কাজেই তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক জ্ঞান এই সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করাতে যত কিছু গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে।

নির্ব্বাণ মুক্ত সাধকের চৈতন্য শক্তি এতদূর প্রসারিত হয় যে তাহার অনুমান করা সামান্য বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য ; যেহেতু এই চৈতন্য বা জ্ঞান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক। এই জগতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রাণী, অপ্রাণী, দৃশ্য, অদৃশ্য যত কিছু জীব বা বস্তু

আছে, তৎ সমস্তই উক্ত মহাত্মাদের জ্ঞানের অন্তর্গত। সমস্ত বিষয়েরই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞান তাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয়ে উপজাত হয়, কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন; এই জন্যই আপামর সাধারণ তাহাদের সীমাবদ্ধ ধারণাশক্তি দ্বারা সেই অতিমহান্ চৈতন্য শক্তিকে অনুভব করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয় বলিয়াই নির্ব্বাণ তাহাদের নিকট অচৈতন্য বা চৈতন্যাভাব অর্থাৎ জ্ঞানাভাব বলিয়া অনুমিত হয়। কোন এক উপলখণ্ডকে আমরা সচরাচর নির্জীব জড় পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞান আছে, প্রস্তরের জ্ঞান নাই; আমাদের চলৎশক্তি আছে, প্রস্তরে তাহার অভাব; আমাদের আসঙ্গ লিপ্সা, সুখ দুঃখ বোধ আছে, ভালমন্দ বিচার করিবার, সু কু বাছিয়া লইবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু প্রস্তরে তাহাদের বিদ্যমানতা আমরা দেখিতে না পাইয়া স্বতই প্রস্তরখণ্ড হইতে আমাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। কিন্তু উল্লিখিত জ্ঞান চৈতন্য ও অন্যান্য শক্তি নিচয়ের তুলনায় আমাদের নিকট উপলখণ্ড যেরূপ নির্জ্জীব জড় পদার্থ মাত্র, নির্ব্বাণ মুক্ত মহাত্মাদের নিকট আমরাও ঠিক সেইরূপ জড়পদার্থবৎ অনুমিত হইয়া থাকি। তাঁহারা দেখিতে পান আমাদের জ্ঞান শক্তি অতি সামান্য; কূপ মণ্ডূকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ন্যায় তাহা নিতান্ত সীমাবদ্ধ, যেন আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়াই আছি; শক্তি সামর্থ্য যৎসামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আমরা মোহাচ্ছন্ন জীব! আমাদের অসারতার, ক্ষুদ্রতার ও অজ্ঞানতার বিষয় কিছুমাত্র অবগত না থাকিয়াই অসার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকি। বৃথাভিমানের তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর পদমর্য্যাদায় ভুলিয়া গিয়া অনিত্য ধনমদে মত্ত হইয়া বৃথাস্ফালন করিয়া থাকি, নিত্য ভুলিয়া অনিত্যে মজিয়া থাকি, অমৃত উপেক্ষা করিয়া অবিরত বিষয় বিষপানে দুর্ল্লভ মানব জীবনকে অপব্যয় করিতেছি; ধিক আমাদের অসারতাকে।

প্রকৃত ভক্ত সর্ব্বদাই নির্ব্বাণ মুক্তিকে উপেক্ষা করাতে এই অতি মহান্, অতি গরীয়ান্ নির্ব্বাণের এই অসীম সর্ব্বজ্ঞত্বের গুরুত্ব কত, এবং তাহার পরিমাণ কি, তাহার ছায়ামাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তসারবিহীন বৃথাভিমানী অজ্ঞ আমরাও নির্ব্বাণকে সদা সর্ব্বদা হেয় জ্ঞানে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা করিয়া থাকি, যেন আমরা তাহা লাভের অধিকারী হইয়াছি, কেহ যেন সেই পরমপদ আমাদের স্কন্ধে সজোরে চাপাইয়া দিবার জন্য

সাধাসাধি করিতেছেন! আঃ ছি!!! আগে ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা হও,—হইয়া বলিও, "আমি চিনি হতে চাই না মা, চিনি খে'তে ভাল বাসি;" নতুবা ছোট মুখে এইরূপ বড় কথা, এইরূপ আস্পর্দ্ধার কথা কি শোভা পায়?

প্রকৃত কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্বদাই নির্ব্বাণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। কেন করেন? তাঁহারা বলেন, "সত্য বটে নির্ব্বাণ পদ লাভ করা অতি সুকঠিন; কোটী কোটী জন্মের তপস্যার পরে তবে সাধকের ইহা লাভ হয়। মানিলাম ইহা অতি মহান্ অতি গরীয়ান্ ও দেব দুর্ল্লভ, কিন্তু তথাপি ইহা লাভ করায় সাধকের স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, তাহাতে পরার্থপরতা কোথায়? তিনি নিজে দুস্তর ও দুলঙ্ঘ্য ভব পারাবারের অপর পারে চলিয়া গেলেন, কিন্তু এই তমসাচ্ছন্ন ভবকূপের অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া সুদারুণ শোকতাপে ক্লিষ্ট জীব দুর্বিসহ যাতনায় অধীর হইয়া যে অনবরত মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে, তৎপ্রতি ত তিনি কর্ণপাতও করিলেন না, এই নিরুপায় নিরাশ্রয়দের উদ্ধারের জন্যত কিছু ভাবনাও করিলেন না! পশ্চাদ্‌ভাগে পড়িয়া যে তাহারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তৎপ্রতি একবারত দৃক্‌পাতও করিলেন না! তবে এই নির্ব্বাণ মুক্তিকে আমরা—স্বার্থপর, অবোধ পাপী তাপী জীব, স্বার্থপরতা বলিব না ত কি বলিব? বাস্তবিকও মূলতঃ কি ইহা স্বার্থপরতা নহে? তিনি কৈবল্য মুক্তি লাভ করিলেন, আমার তাতে কি? ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিয়া নির্ব্বাণী পূর্ণব্রহ্মে মিশিয়া গেলেন, তাহাতে পূর্ণত্বের কি কিছু বৃদ্ধি হইয়া গেল? না তিনি তাহাতে মিশিবার পূর্ব্বে পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণত্বের কিছু হ্রাসতা ছিল? তবে তাঁহার কৈবল্যমুক্তিতে শোকার্ত্ত নর নারীর, মোহান্ধ জীব জন্তুর কি লাভ হইল, তাহারা কি উপকার পাইল? তাই নির্ব্বাণ মুক্তিকে স্বার্থপরতা কহে।" এই জন্যেই প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্তগণ তাহা উপেক্ষা করেন; তাঁহারা তাহা লাভ করিতে বিমুখ হইয়া কৃষ্ণ সেবা লাভ করিবার জন্য এতদূর একাগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবানের সেবাই ভক্তির পরমার্থ! পূজ্যপাদ নরোত্তমঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "সখীর অনুজ্ঞা হয়ে, কৃষ্ণসেবা লব চেয়ে, দোঁহে ডাকিবেন সখী আয়।" যে কৃষ্ণসেবা লাভ করিবার আশয়ে ভক্তগণের হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া গভীর খেদোক্তি বহির্গত হয়, সেই দেবদুর্লভ কৃষ্ণসেবা বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে কি?

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূত স্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
গীতা।

যোগ সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ব ভূতকে আত্মাতে নিরীক্ষণ করেন।

যিনি প্রাণী মাত্রেতেই আমাকে (ভগবানকে) ও আমাতে প্রাণী মাত্রকেই দর্শন করেন আমি তাঁহার অদৃশ্য হইনা এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হননা (অর্থাৎ আমি তাঁহার প্রতি কৃপাবলোকন করি)।

যে যোগী আমার সহিত একত্বে থাকিয়া আমাকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) সর্ব্ব ভূতস্থিত বলিয়া ভজনা করেন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন।

হে অর্জ্জুন! যে যোগী স্বীয় সুখ দুঃখের ন্যায় সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ অনুভব করেন তিনিই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ যোগী। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারূপে ঘটে ঘটে অর্থাৎ সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, এই জীব সেবা ও জীবে দয়াই (Service to suffering Humanity) প্রকৃত কৃষ্ণ সেবা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্যস্ত আছেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, স্থাবর জঙ্গমাত্মক যত কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহাদের সমস্তেরই ক্রমোন্নতির (Evolution) দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভগবানের সৃষ্টি ক্রিয়া রূপ লীলার সহায়তা করাকেই প্রকৃত কৃষ্ণ সেবা কহে।

প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্তগণকে সর্ব্বদাই পর দুঃখে কাতর দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের দুঃখ বিমোচন করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভাবে বিভোর না হইলে কৃষ্ণপ্রেম

মিলেনা। সেই প্রিয়াজি রাধিকার প্রেম ভাব এক অসীম ও অনন্ত প্রেম সিন্ধু বিশেষ! একবার উথলিয়া উঠিলে মানুষের কথা কি? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি, বৃক্ষ, লতা ও স্থাবর জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্ত সেই প্রেম বন্যার তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া চলে! তাহার বেগ সাম্‌লাইতে পারে কার সাধ্য? সেই রাধা-ভাবের বারি বিন্দুমাত্র লাভ করিয়াই কৃষ্ণ ভক্তগণ জীবদুঃখ মোচন করিতে এতদূর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ রাধা প্রেমে বাঁধা; তিনি শ্রীরাধিকার নিকট চির ঋণে আবদ্ধ; তাহা আর পরিশোধ হয় না! তাই বিধুমুখী রাই দুর্জ্জয় মান ভরে অধোমুখী হইয়া একান্তে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মিষ্ট বাক্যে কতই সাধাসাধি করিতেছেন, তবুও এ সুদারুণ মান আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। সখীগণ মধ্যস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বনে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলে মানময়ী শ্রীমতী, সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখি! জীবের যাতনা সহ্য করিতে পারি না, যদি তিনি আমার ঋণ-দায় হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিলাষ করেন, তবে জীবের দুঃখ বিমোচনের উপায় করুন, তাহা হইলেই আমার ঋণ পরিশোধ হইয়াছে জ্ঞান করিব, নতুবা নহে। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বিনা আপত্তিতে তাহাতে সম্মত হইলেন।

শ্রীমতীর এই জীবদুঃখে কাতরতা ও দয়ার্দ্র চিত্ততার ভাবটী স্থায়ী ও নিত্য! এই প্রেম ঋণ এতই ভারি যে তদ্দ্বারা চিরকাল আবদ্ধ হইয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, যখন সমাজে ধর্ম্মের অধঃপতন এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই সেই ভক্তাধীন ভগবান তাঁহার পার্ষদগণ সহ ধরা ধামে অবতীর্ণ হইয়া পাপের দমন এবং পুণ্য প্রেমের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া জীবের দুঃখ মোচনরূপ রাধা-ঋণের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও পারিষদবর্গকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "জীবে দয়া ও নামে রুচিই" মানবের প্রকৃত পরমার্থ।

অবিদ্যার বিনাশ সাধন করিয়া জীবের মোহান্ধকার অপনয়ন করিলেই তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মেষিত হইয়া নিত্যানিত্য বস্তুবিচার বিবেকজ্ঞান জন্মে; এই জ্ঞানের উদয় হইলেই তুচ্ছ ও অনিত্য বিষয় বাসনা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যানন্দ লাভের প্রয়াসী হয়, তাহাতেই জীবের প্রকৃত দুঃখ মোচন

হয়। যিনি এইরূপ জীবদুঃখ মোচন করিতে সমর্থ ও সমুৎসুক, তিনিই জীবের যথার্থ বন্ধু এবং হিতৈষী ; তিনিই মহাত্মা, তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্ত এবং তিনিই ভগবানের সঙ্গে অভেদাত্ম।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা-মামেবানুত্তমাঙ্গতিম্ ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

প্রোক্ত চতুর্ব্বিধ উপাসকগণ মুক্তিলাভার্হ, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আমারই স্বরূপ, তিনি আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

বহু জন্ম সাধনার পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই চরাচরাত্মক জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই বাসুদেবের মূর্ত্তি, এইরূপ স্থির করিয়া আমাকে (বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই মহাত্মা বলে, কিন্তু তাঁহারা অতি দুর্লভ।

বিশ্ব প্রেমিক সেই মহাত্মাগণ বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির অতীত হওতঃ ব্রহ্ম সাযুজ্যলাভে অধিকারী হইয়াও কেবল মায়াচ্ছন্ন এবং অবিদ্যার বশীভূত অবোধ জীব সমূহের দুঃখ যন্ত্রণা দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া অপরিসীম অনুকম্পা পুরঃসর কথিত অতি মহান ব্রহ্ম নির্ব্বাণকেও উপেক্ষা করিয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় কেবল লীলাবশে এবং অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিতে অগ্রসর হন। সেই জীবদুঃখ কাতর, বিশ্ব প্রেমিক, অপারকরুণা নিদান মহানুভব মহাত্মাগণই প্রকৃত কৃষ্ণ সেবার একমাত্র মর্ম্ম গ্রাহী ও নির্ব্বাণকে উপেক্ষা করার সম্পূর্ণ অধিকারী।

তাই বলি ভাই, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার করুণাকণা লাভ করিয়া যদি কৃষ্ণসেবার অধিকারী হইতে অভিলাষ থাকে, তবে এস পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীজির পদানুসরণ করিয়া সেই জীবদুঃখ কাতর, করুণেক্ষণ মহাত্মাদিগকে প্রগাঢ় ভক্তি ভরে সকলে মিলিয়া প্রণাম করি ; অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে !

ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ চরতঃ পরিভূত কাল জালভিয়ঃ।
ভক্ত মকরান শীলিত মুক্তি নদীকান্নমস্তামি ॥

যে সকল ভক্তরূপ মকর নির্ব্বাণ মুক্তিরূপা নদীকে অনাদর পূর্ব্বক কালরূপ ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বিচরণ করেন তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ হরিঃ ওঁ।

শ্রীসুদর্শন দাস।

জ্ঞান ও ভক্তি।

জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এ সম্বন্ধে অনেকেই তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন ! কিন্তু "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" তর্ক দ্বারা কাহারও চিত্তে কোন বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না তবে তর্ক করিতে করিতে একদিন সত্য আবিস্কৃত হইতে পারে এ ভরসায় আমরা অদ্য এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

জ্ঞা ধাতু হইতে জ্ঞান শব্দের উৎপত্তি। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। জ্ঞানদ্বারা ভগবানের বিষয় কথঞ্চিত জানা যাইতে পারে কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না তিনি জ্ঞানাতীত !

যদি তাঁহার অমৃতময় লীলা সকল উপভোগ করিতে না পারি, যদি "আমি তোমার" বলিয়া তাহার চরণে লুণ্ঠিত হইতে না পারি, তবে সেরূপ নীরস জ্ঞান লইয়া ফল কি ? পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়াছে—প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায়,—আমি জানি জলদ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয় কিন্তু জলপান না করিয়া কেবল তাহার গুণ টুকু জানিয়াই কি পিপাসার শান্তি হয় ? পিপাসার জন্য যেমন জল পান আবশ্যক শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে তদ্রূপ ভক্তির আবশ্যক।

"জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপিজ্ঞাতস্য—
তদ সংস্থিতে।"

অর্থাৎ ভগবৎ বিষয় জ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহাকে ভালবাসা যায় না। ঈশ্বর বিদ্বেষীগণও শ্রীভগবানকে জানিয়া থাকেন তাই বলিয়া তাঁহারা কি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারেন ?

একটা চলিত কথাতে আছে,—

"সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী"

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট একখানি যোগশাস্ত্র। সেই গ্রন্থও মুক্তকণ্ঠে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতেছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ"

ইহাই গীতার সার শ্লোক। এই শ্লোকানুশীলনে শ্রীভগবান যে ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেম রস॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মিবার পূর্ব্বে সমগ্র দেশ জ্ঞান বাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাই শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে মরুভূমে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। যদি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানই বড় হইবে তবে শ্রীভগবানের মরুভূমে অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলনা, বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে শ্রীভগবান অবতার গ্রহণ করেন না।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীভগবান তাহার প্রমাণ কি? যুক্তি তর্কদ্বারা শ্রীভগবানের ভগবত্বা প্রমাণ করিয়া অন্যের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদন করা যায় না। ভগবদ্কৃপা হইলেই ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। একসময় গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

কৃপাবিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে॥
সেইত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।

চৈঃ চঃ

শাস্ত্র বলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" গীতা ৪, ৭।—৮।

অর্থাৎ ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিলে, অধর্ম্ম প্রবল হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

অতএব ধর্ম্ম সংস্থাপন সাধুদিগের রক্ষণ দুষ্কৃতির দমন এই তিনটি অবতারের লক্ষণ। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রে আমরা এই তিনটি গুণই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, তবে আর তাঁহাকে ভগবান বলিব না কেন?

সত্য যুগ হইতে শ্রীভগবানের ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ধ্যেয়সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণং—
সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরিটী হারী—
হিরন্ময়বপুঃ ধৃত শঙ্খ চক্র॥"

শ্রীভগবানের যত অবতার আছে তন্মধ্যে "হিরন্ময়বপু" আর কাহারও নাই একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গই "হিরন্ময়বপু" বিশিষ্ট। অতএব যদি শাস্ত্র যুক্তি মানিতে হয় তবে কোনক্রমেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বা উড়াইয়া দিতে পারা যায় না।

বিশেষতঃ প্রেমের পর্য্যায়ক্রমে আমরা শ্রীভগবানের অবতারত্ব বুঝিতে পারি। শ্রীভগবানের অংশাবতার গণের মধ্যে প্রেমও তদুপযুক্ত আংশিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আর কোনও অবতারে শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় প্রেমের পূর্ণ উৎস দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রেম সম্বন্ধে হিন্দুরা বলেন "যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।" খৃষ্টীয় মহাত্মা জন্ বলেন,—

"God is love... ..and god in him"

এমন পবিত্র রত্নের পূর্ণ অধিকার শ্রীভগবান ব্যতীত অন্যে সম্ভবেনা। কেবল মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ জগতে এই অমৃতময় প্রেমের বন্যা বহাইয়াছিলেন সুতরাং শ্রীভগবান ব্যতীত তাঁহাকে আর কিছু বলা যাইতে পারেনা।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বা প্রমাণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, প্রসঙ্গ ক্রমে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করা গেল। এখন আমরা গন্তব্য পথানুসরণ করি।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি। গী—৯—৩১।

অর্থ "হে পার্থ! অতিশয় দুরাত্মাও যদি ভক্তি সহ আমার আরাধনা করে তাহা হইলে সেও সত্বর ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া চির শান্তিলাভ করে।" ফলতঃ হরি-ভক্ত দুরাচার হইলেও তাঁহাকে কখনও বিনষ্ট হইতে হয় না।

ইহাতেও ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইতেছে। ভগবান পর্য্যায়ক্রমে জ্ঞানী ও কর্ম্মী এবং যোগীর শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া পরিশেষে ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছেন। যথা,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

গীতা—৬—৪৭—।

অর্থ—"যিনি আমাতে মন সমর্পণ করিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন যোগী অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠতম, অতএব হে অর্জ্জুন আমার ভক্ত হও।"

শ্রীভগবানের এই উক্তিও ভক্তিরই মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে।

জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি সুদুর্লভ "জ্ঞানতো দুর্লভাভক্তি" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥ চৈঃ চঃ

জ্ঞানবাদীগণ ব্রহ্ম বিষয় জ্ঞাত হন, যোগীগণ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলন লাভ করেন, ভক্তগণ শ্রীভগবানের অমৃত ময় লীলারসে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া তৎ সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের সাধনা নিস্কাম এমন কি ভক্তগণ মোক্ষপদ পর্য্যন্ত হেয় জ্ঞান করিয়া কেবল অহরহ ভগবচ্চরণে ডুবিয়া থাকেন। এই জন্যই সর্ব্ব-শাস্ত্রে ভক্তিরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে! মহাপ্রভু একস্থলে বলিয়াছেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥

চৈঃ চঃ

জ্ঞানবাদীগণ বলেন জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, জ্ঞান অনুষ্ঠান কর্ত্তার অধীন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন।

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা"

কিন্তু ভক্তি—"ন ক্রিয়া কৃত্যনপেক্ষণাজ্ জ্ঞানবৎ।",

শ্রুতি বলেন "আনন্দংব্রহ্ম।" জ্ঞানবাদীগণ আনন্দকে জ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন জ্ঞানই আনন্দময় একথা বলিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায়না কিন্তু ভক্তিদেবী নিজেই পরানন্দময়ী। যথা;—

"ওঁ শান্তি রূপাৎ পরমানন্দ রূপাচ্চ"

অর্থাৎ ভক্তি—শান্তি এবং পরমানন্দ স্বরূপ।

আমরা এতাবৎ যতদূর আলোচনা করিয়া দেখিলাম তাহাতে ভক্তিরই প্রাধান্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে ইহা নিশ্চয় যে, পরজ্ঞান ও পরা ভক্তি দুইটা অভিন্ন জিনিষ। পরজ্ঞান উদয় হইলেই পরাভক্তির উদয় হয়, যেমন সূর্য্যোদয় হইলেই আলোকের উদয় হয়। যে জ্ঞানে পরানন্দময়ী ভক্তি দেবীর উদয় না হয় আমাদের বিবেচনায় তাহা জ্ঞান নহে, ঘোর তমঃ মাত্র।

জ্ঞানবাদীগণ ভক্তিবাদীদিগকে দুর্ব্বল বলেন, নাস্তিকগণ ঈশ্বরবাদীকে দুর্ব্বল বলিয়া থাকেন। এ সমস্তই বিবাদের কথা। এরূপ অনর্থক বিবাদে কোন ফল নাই, লাভের মধ্যে কেবল অমূল্য মানব জীবনের বৃথা অপব্যবহার মাত্র। কেবল বিবাদ করিলেই বিবাদ মিটে না।

"অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,—
মানেনা বাহুর আক্রমণ;—
একটী আলোক শিখা সুমুখে ধরিলে,—
নীরবে করে সে পলায়ন"।

অন্ধকার দূর করিবার জন্য যেমন আলোকের আবশ্যক, বিবাদ মীমাংসার জন্য তদ্রূপ একজন মধ্যস্থের আবশ্যক—কিন্তু গভীর অধ্যাত্ম বিবাদের মীমাংসা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণের উপর নির্ভর করিয়া এ বিবাদ মীমাংসা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

যে প্রেমময়ের প্রেম স্রোতে জ্ঞানীর—জ্ঞানপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল, সমগ্র জীব "আমি তোমার" বলিয়া তচ্চরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গকে মধ্যস্থ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। দুর্গম অধ্যাত্ম পথ সুগম ও কোমল পুষ্পনিভ হইয়া পড়ে!

শ্রীগৌরাঙ্গ যে কেবল বৈষ্ণবেরই আরাধ্য ধন তাহা নহে তাঁহার ন্যায় সার্ব্বভৌমিক প্রেমিক আর নাই, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, একবার তচ্চরণে লুণ্ঠিত হইতে পারিলেই তাঁহার চিত্ত জুড়াইয়া যাইবে প্রাণে অমৃত সেক হইবে!!

আইস ভগিনীগণ, একবার সকলে সমস্বরে "ভক্তি দেবীর জয়" বলিয়া, ভক্তিভরে প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া দলাদলি ছাড়িয়া আত্মকৃতার্থতা লাভ করি!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

স্বপ্নে-দীক্ষা।

১১শ সংখ্যায় ৩৪১ পৃষ্ঠার পর হইতে।

পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে, বর্ত্তমান পৃথিবীটী সপ্ত ভাগে বিভক্ত বলিয়া বোধ হইল। ১ম ভারতবর্ষ, ২য় এসিয়া, ৩য় ইউরোপ, ৪র্থ আফ্রিকা, ৫ম উত্তর আমেরিকা, ৬ষ্ঠ দক্ষিণ আমেরিকা ও ৭ম মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। ভারতবর্ষকে প্রথম বলিলাম বটে কিন্তু মানব জাতির ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে ভারতবর্ষকে সপ্তম বিভাগ বলিয়া ধরিতে হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক গুহ্য রহস্য আছে উহাদের মধ্যে একটি প্রধান রহস্য এই যে, মানব ক্রমপরিণাম চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে তখন প্রথমেই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী থাকে না। পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম দ্বারা অপেক্ষাকৃত বিশোধিত চিত্ত হইয়া সর্ব্ব শেষে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে। ভারতের মাটি, ভারতের জল, ভারতের অগ্নি, ভারতের বায়ু, ভারতের আকাশ সত্ত্বগুণ প্রধান, সাত্ত্বিক জ্যোতি পূর্ণ; সেই জন্য মানব অপেক্ষাকৃত সত্ত্বপ্রধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতভূমি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় না এবং ভারতে জন্ম গ্রহণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিজত্ব লাভে অধিকারী হয় না। দ্বিজ কথাটির অর্থ যিনি দুইবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি মাতৃ গর্ভে একবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং দীক্ষা কালে

জগজ্জননীর গর্ভে আর একবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে অনেকে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ নামধারী আছেন বটে কিন্তু প্রকৃত দ্বিজ শব্দ বাচ্য পুরুষ বড়ই বিরল। যিনি দ্বিজ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। এই দ্বিজত্বই মানবের চরম লক্ষ্য। ভারতের ক্ষেত্রে জন্মিয়া তবে দ্বিজত্ব লাভের অধিকারী হওয়া যায়। ভারতের এইস্থান মাহাত্ম্যের কথা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। আমাদের দেহে রক্তকণা সকল শিরাপথে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল উপস্থিত হইলে উহাদের মধ্যে কতকগুলি ডিম্বরূপে পরিণত হইয়া ডিম্ব জরায়ু মধ্যে স্থান পায়। সেই সময় উক্ত ডিম্ব পুরুষ বীজ গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ, দেবী পৃথিবীর জরায়ুক্ষেত্র। মানব সকল এক একটি রক্তকণার ন্যায় পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরিয়া অণ্ডস্বরূপে পরিণত হইয়া যখন ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন, তখনই তিনি লিঙ্গরূপী মহাপুরুষগণের মুখ নিঃসৃত ব্রহ্মতেজ অর্থাৎ মন্ত্রবীজ গ্রহণ করিবার অধিকারী হয়েন। ভারতের সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী কেহ হইতে পারেন না। কিন্তু এইখানে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতমাতা তাঁহার কার্য্যসাধন জন্য তাঁহার কোন কোন সন্তানকে ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ জন্য পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা পরে বলিব।

পৃথিবীর সপ্তখণ্ডের মধ্যে এসিয়া খণ্ডের আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম যে ইহার অধিকাংশ স্থানই তমোগুণ প্রধান, কোন কোন স্থল তমঃযুক্ত রজগুণ প্রধান। সেইজন্য সেই সকল দেশবাসীরা সাধারণতঃ প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী। কিন্তু সম্মুখে একটি পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত; এই সময় যাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গে পদার্পণ করিতে সচেষ্ট হইবেন মহাপুরুষগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। উচ্চ পর্ব্বত নিঃসৃত নির্ঝরের ন্যায় মহাপুরুষগণের কৃপাবারি প্রবাহিত হইতেছে; যিনি উহা ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন তিনি হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখুন তাহা হইলেই ধরিতে পারিবেন। হৃদয় যখন জগতের মঙ্গল জন্য কাঁদে, স্বার্থভাব যখন হৃদয় হইতে অপসারিত হয় তখনই হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে বুঝিও। হৃদয়ের স্বার্থভাবই কতকগুলি আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ের দ্বারকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; এই স্বার্থভাবকে দূর করিতে পারিলেই ঐ সমস্ত আবর্জ্জনা সে নিজেই সঙ্গে লইয়া পলাইয়া যায়।

হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইলে মহাত্মাগণের কৃপাবারির ধারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে কিন্তু উহা ধরিয়া রাখিতে হইলে হৃদয়ে একটি গহ্বর কাটিতে হইবে। হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কার নামে একটি সুবৃহৎ বৃক্ষ আছে; উহাই হৃদয়ের সমস্ত ভূমি অধিকার করিয়া রাখিয়াছে; এই গাছটি সমূলে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই হৃদয়ভূমি গুরু কৃপাবারি ধারণের উপযুক্ত গহ্বরে পরিণত হইবে।

এসিয়ার মধ্যে একটি বহু প্রাচীন স্থান অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে সেই স্থানটি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ঐ স্থানটি মধ্য এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী গোবি মরুভূমি। বর্ত্তমান মন্বন্তরের প্রথম অবস্থা হইতেই উহা বর্ত্তমান আছে কিন্তু উহা এক্ষণে যেরূপ মরুভূমিতে পরিণত রহিয়াছে পূর্ব্বে উহা সেরূপ ছিল না। উহা একটি বহু ধন-জন পূর্ণ দেশ ছিল। আর্য্যজাতির বিস্তার ও উন্নতি প্রথমে এইস্থান হইতে আরম্ভ হয়। এইস্থান পূর্ব্বে পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার ছিল সেই সমস্ত ধন রত্ন এখনও ঐখানে যক্ষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আছে; উপযুক্ত সময় হইলে আবার সাধারণ মানবগণের হাতে পড়িবে।

ভূকম্পন আদি নৈসর্গিক বিপ্লব দ্বারা এই স্থানের ধন রত্ন হর্ম্ম্য আদি যে সমস্ত এখন প্রোথিত রহিয়াছে তাহা সমতল ক্ষেত্রের উপর উঠিবে; তখন মনুষ্য স্বল্পায়াসে ঐ স্থানে গমন করিতে পারিবে। এই স্থান যে রাজার অধীন থাকিবে সেই রাজা পৃথিবী মধ্যে সকল বিষয়ে প্রধান হইবেন। কল্কিদেব যে সম্বল নগরে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে সেই সম্বল নগর এই গোবি মরুভূমির মধ্যস্থ একটি ওয়েসীশ। বিষ্ণুযশা নামে একটি ব্রাহ্মণ বংশ এই স্থানে মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা এসিয়ার পশ্চিম খণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রায় ১৯০০ বৎসর গত হইয়াছে এসিয়ার এই পশ্চিম খণ্ডে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা এখনও ঐ খণ্ডের আকাশে জীবন্ত চিত্র স্বরূপ চিত্রিত রহিয়াছে। চিত্রটি মাহাত্মা যিশুর ক্রসে প্রাণ দান। পূর্ব্বে পশ্চিম এসিয়াখণ্ড বাসী ইহুদীরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল; ইহুদীদের কাবালা নামক গ্রন্থে ধর্ম্মের অতি গুঢ় রহস্য সকল নিহিত আছে কিন্তু কালক্রমে জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ইহুদী জাতিরা ভুলিয়া যায়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতস্থ এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে হৃদয়ের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ

করিতে হয়, এই মহান সত্যটি ভুলিয়া গিয়া, ইহুদীরা নামে মাত্র একেশ্বর বাদী হইয়া কেবল বাহ্যপূজা পরায়ণ হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের গোঁড়ামী উপস্থিত হয়। ইহাই জাতীয় ধর্ম্মের পতন অবস্থা। ধর্ম্মের এইরূপ পতন অবস্থায়, উহার অভ্যুত্থান জন্য কোন না কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইহুদীদের অধঃপতন সময়ে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান জন্য মহাত্মা যিশু কর্ম্ম ক্ষেত্রে দেখা দেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামী কিন্তু কি ভয়ানক অন্ধকারময়। এই অন্ধকারে ইহুদীদের হৃদয় আচ্ছন্ন থাকায় তাহারা যিশুকে ধর্ম্ম বিদ্বেষী বলিয়া বুঝিয়া তাঁহাকে কাঠের ক্রশে স্থাপিত করিয়া প্রেক মারিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। কি নিষ্ঠুরতা !!! সেই সময় অন্তর্জগৎ কম্পিত হইয়াছিল; দেবদেবীগণ হাহাকার করিয়াছিলেন; যিশু বুঝিলেন যে ইহুদীদের এই কর্ম্মের ফল তাহাদের পক্ষে বড়ই অশুভ; তাই দয়ার অবতার, ক্ষমার অবতার সেই জগৎপূজ্য মহাত্মা কাতরে হৃদয়ের ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন, পিতঃ ইহারা অজ্ঞান, ইহারা যে কি কর্ম্ম করিল জানে না, ইহাদিগকে ক্ষমা কর। পরের জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে মহাত্মা জগৎ পিতার কাছে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা যিশুর এই প্রার্থনাধ্বনি এখনও করুণস্বরে আকাশ কাঁপাইতেছে। এই ধ্বনি যিনি হৃদয়ে শুনিতে পান তিনিই প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মমতাবলম্বী। কিন্তু হায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কয় জন এখন মহাত্মা যিশুর এই ক্ষমা ও দয়া স্মরণ করিয়া তাঁহার পথানুসরণ করিয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামী প্রবেশ করিয়াছে। মহাত্মা যিশু এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণ তাই, কাল চক্রের এই সন্ধি স্থলে খ্রীষ্টিয়ান দেশ হইতে গুটিকত নর নারী বাছিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা মহাপুরুষগণের এই কার্য্যে যোগদান করিবেন তাঁহারা তাঁহাদের এই কর্ম্ম ফলে মহাপুরুষগণের কৃপার পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

পশ্চিম এসিয়াতে আর এক মহাপুরুষের শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি পবিত্রাত্মা মহম্মদ। সূর্য্য ও অগ্নি উপাসক পারসীরা যখন জরাথুস্ত্র কথিত জেন্দ-অবস্থার গূঢ় রহস্য ভুলিয়া কেবল বাহ্যপূজা পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল তখন এই মহাত্মা আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহু সাধনার পর একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হন; উহার নাম কোরান। উহার রচনা অতি সুন্দর এবং উহা এরূপভাবে

সংকলিত যে উক্ত গ্রন্থকে এক অভিনব ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র, বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র, কাবালা ও জরাথুস্ত্র প্রণীত গ্রন্থ হইতেই সংকলিত। আরব ও পারস্যবাসীরা মানবজাতির অপেক্ষাকৃত নিম্নতর প্রশাখা বলিয়া, উহারা সাধারণে কোরাণের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। সেই জন্য মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকেই পরধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া উঠে এবং আপনাদের মধ্যেও মতদ্বৈধ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। মহম্মদ, ঈশ্বরের মূল নাম (ইসম্ আজম্) কেবল তাঁহার দুইটি প্রিয় শিষ্যকে দিয়া গিয়াছিলেন এবং যোগের প্রকৃত রহস্য কেবল তাঁহাদিগকেই বলিয়া ছিলেন। মুসলমান সুফী মতাবলম্বীদের মধ্যে এই নাম ও এই যোগ প্রণালী গুরু পরম্পরা ক্রমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সুফী সম্প্রদায়ী মুসলমান কোরানের যেরূপ অর্থ বুঝেন, অন্য সম্প্রদায়ীরা কিন্তু সেইরূপ না বুঝিয়া কেবল বাহ্যিক উপাসনা রত হইয়া, আপন ধর্ম্মের সহিত হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বুঝিতে না পারিয়া, আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অভিমানী হইয়া অন্য ধর্ম্মের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। ইহাদের এই সমস্ত কর্ম্ম বীজ ফলোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছে। তাই মহাত্মা মহম্মদও এই যুগসন্ধি সময়ে আপনার ভক্তগণের শুভ কামনায়, অন্যান্য মহাত্মাদের সহিত যোগদান করিয়া, পৃথিবীতে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া অশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মুসলমানগণ এই সময় যদি আল্লার "ইসম্ আজম্" পাইবার জন্য হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করেন তবে মহম্মদ তাঁহাদিগকে সেই নাম নূতন শক্তি সহ মিলাইয়া প্রদান করিবেন; তখন মুসলমান বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দু ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের ভিত্তি এক; তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দুর কৈলাসেশ্বর ও মুসলমানের মক্কেশ্বর সেই এক প্রণব বাচ্য পুরুষ তখন তিনি আবার দেখিতে পাইবেন যে কোরাণ উল্লিখিত আলেফ্, লাম্ ও মিম্ আর হিন্দুর অকার, উকার এবং মকার উভয়ের তিন কথাই এক কোন প্রভেদ নাই।

ফকির মন্সুর সোহং ব্রহ্মবাদী ছিলেন এই জন্য মুসলমান তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিয়াছিল কিন্তু মুসলমান ইসম্ আজম্ এবং আল্লেফ্, লাম্, মিম্ পাইলে মন্সুরকে আর ধর্ম্মচ্যুত ভাবিবেন না, তখন তিনি মন্সুর প্রতি সেই অত্যাচাররূপ ভীষণ কর্ম্ম, অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ইসম্ আজম্ এবং

আলেফ্, লাম্, মিম্ পাইলে মুসলমান গোরক্ত দ্বারা আর ভারত ভূমি কলঙ্কিত করিবেন না; ভারতের মুসলমান সন্তান ও হিন্দু সন্তান মধ্যে আর প্রভেদ থাকিবে না। তখন ভারতমাতার আনন্দের আর সীমা থাকিবে না।

ক্রমশঃ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহাকুমার নিকট পুঁড়াগ্রামে আমার বাসস্থান। ঐ স্থান হইতে নৌকাপথে ইচ্ছামতি নদীর উপর দিয়া গোবরডাঙ্গায় আসিতে হয়। গোবরডাঙ্গার উত্তর পূর্ব্বদিকে বেড়ী রামনগর গ্রাম। ঐ রামনগর গ্রামে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে রামনগর গ্রাম আমি আর কখনও দেখি নাই। পল্লিগ্রামে সঙ্গতিপন্ন লোকে পাল্‌কী করিয়াই বিবাহ করিতে যান, আজকাল সঙ্গতি না থাকিলেও ভাল দেখায় না বলিয়া অনেকেই তাঁহাদের অণুকরণ করিতে বাধ্য হন। আমাদের বাড়ি হইতে বরাবর রামনগর যাইতে হইলে ইছামতি নদী পার হইয়া যাইতে হয়।

মাঘমাস শীতকাল, পৌঁছিতে পাছে লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় এজন্য আমরা ১০টার সময় বাড়ি হইতে রওনা হই। বরযাত্রেরা নৌকা করিয়া ইচ্ছামতি নদীর উপর দিয়া রওনা হইলেন। আমাদের পাল্‌কী যখন ইচ্ছামতির পরপারে পৌঁছিল (ঐ স্থানকে ভেট্‌কির ঘাট বলে) তখন বেলা প্রায় ৪টা। রামনগর ঐ স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। একজন অপরিচিত লোক ঐ ঘাটে আমাদের পথ প্রদর্শক স্বরূপ দাঁড়াইয়া ছিল। লোকটি ব্যস্ততা বশতঃই হউক অথবা বোকা বলিয়া আমাদের পথ দেখাইয়া দিবার পূর্ব্বেই গৃহস্থকে আমাদের আগমন সংবাদ দিবার জন্য শীঘ্রই চলিয়া গেল।

বরযাত্রেরা তখনও ঘাটে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; বিলম্ব দেখিয়া বলিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইবার পর একটি স্থান দেখিলাম—সে স্থানটি যেন আর কখন দেখিয়াছি এমত বোধ হইল। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু হইয়া আমি পাল্‌কি হইতে ঐস্থানে নামিলাম। আমার পিতাঠাকুর

মহাশয় পৃথক পাল্‌কীতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন—বেহারারা আমাদের পালকী নামাইবার পরই তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি আসিলে আমি তাঁহাকে সকলই বলিলাম। তিনি স্থির হইয়া শুনিলেন—এবং কহিলেন এই স্থানের অন্যান্য দিকে কিরূপ আছে মনে পড়ে ?—আমার স্পষ্ট মনে পড়িল যেন একটা জলশূন্য নিম্ন জমীর ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। এবং ঐস্থান হইতে বামদিক দিয়া আমরা যাইব। বামদিকে গ্রাম আছে এবং দক্ষিণদিকে পূর্ব্বের পথের ন্যায়—জলশূন্য নিম্ন জমী পতিত আছে। রামনগর গ্রামে যাইবার পথটী বড় গোলমেলে, বিশেষরূপ জানা না থাকিলে সহজে যাওয়া বড়ই দুর্ঘট ; এরূপ স্থলে আমিই পথ প্রদর্শক হইলাম। বেহারারা সেইজন্য স্পষ্টই বলিয়াছিল যে আপনি বোধ হয় এখানে আসিয়াছিলেন—কারণ তাহারা আমার নিদর্শন মত অগ্রসর হওয়ায়, আদৌ ঘুরিতে হয় নাই। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আরও বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন তুমি কখন এখানে আইস নাই। আমিও কখন এস্থান দেখি নাই। আমার মনে আরও সন্দেহ বাড়িয়া উঠিল—বড় ইচ্ছা হইয়াছিল যে ঐস্থান ভাল করিয়া দেখিব—কিন্তু পিতাঠাকুর মহাশয় তখন ও কিছু নয়, বলিয়া আমাকে এক প্রকার বুঝাইয়া দিলেন। আমরাও অগ্রসর হইলাম।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা বিবাহ বাড়ী পৌঁছিলাম। আমাকে সাদরে লইয়া সভামধ্যে বসাইল। সম্মুখস্থ উঠান এবং যতদূর দেখা যায় আমি দেখিলাম—আমার বেশ পরিচিত বলিয়া বোধ হইল ; এই বাড়ীর পূর্ব্বদিকে জলাশয় আছে, এ কথা তখন আমাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই। আমার উহা মনে পড়িল। পরদিন প্রাতে উহা প্রত্যক্ষ্য করিলাম। এই সময়ে যাহার সহিত বিবাহ হইবে তাহার কথা মনে পড়িল। যাহাদের নিকট আমার স্ত্রীর আকৃতি সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম সেই অবধি মনে একটি কাল্পনিক আকৃতি স্থির করিয়াছিলাম। শুভ দৃষ্টির সময় যাহা দেখিলাম তাহা এখনও মনে করিলে হৃদয় দুর দুর করে। এতদিন লজ্জা বশতঃ প্রকাশ করিতে পারি নাই। কাহার নিকট বলিব, কে কি বলিবে সতত ইহাই ভাবিতাম। সেই লজ্জাশীলা পতিপ্রাণা সতীকে পূর্ব্বজন্মে দারিদ্র্য-বশতঃ ও অন্য কারণে কত কষ্ট দিয়াছি সেই সমস্ত আমার মনে উদিত হইয়া একেবারে আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিল।

যখন দেখিলাম,—এখনও মনে করিলে কেবল দেখিতে ইচ্ছা করে,—দেখিলে চক্ষে জল আইসে—পূর্ব্ব কথা মনে হয়,—সেই অবধি আমার মনে বিষম খট্‌কা লাগিয়া আছে। বিবাহ রাত্রি লোকের সুখে যায়—আমার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। বোধ হয় সে রাত্রি আমার সহিত আলাপ করিয়া কেহ সুখী হন নাই। আমি বড় অন্যমনস্ক ছিলাম।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং সাংসারিক অন্যান্য কারণে আমার ভালরূপ লেখাপড়া হয় নাই। আমি শিক্ষা পাই নাই সেজন্য এ তথ্য বুঝিতে পারি নাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উত্তরাখণ্ডে।

১০ম সংখ্যার ৩২৪ পৃষ্ঠার পর হইতে

প্রধান মহাত্মার সঙ্কেতে প্রবর্ত্তক দ্বয় ভুমিতে তিনটী করিয়া তিনবার আঘাত করিলে সকলে জানু পাতিয়া বসিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী মহাপুরুষদ্বয় চিন্তামণির নিকটস্থ হইয়া, উভয়েই এক হস্ত তাঁহার স্কন্ধ দেশে ও অপর হস্ত প্রধান মহাত্মার স্কন্ধোপরি অর্পণ করিলেন। প্রধান মহাত্মা, একমাত্র সেই আশ্রমোদ্যানোৎপন্ন বীজ বিশেষের তৈল সমেত তৈলাধার হস্তে লইলেন। একমাত্র সেই তৈলই, গৃহীত ওজঃ পুষ্প আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম। প্রাচীন মহাত্মাগণ স্বস্ব দেহস্থ ব্রহ্মতেজ সেই তৈলে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি, স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বয় সেই তৈলে সিক্ত করিয়া চিন্তামণির ভ্রূযুগল মধ্যে সংলগ্ন করিয়া, তাঁহার মস্তকাভিমুখে করতলদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক, একাগ্রচিত্তে নিস্পন্দ হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

মহাত্মার হস্তদ্বয়, কপোল স্পর্শমাত্র চিন্তামণির বোধ হইল যেন, তাঁহার নিমীলিত চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইয়াছে, যেন কোন [illegible]জ্যোতিসম্পন্ন রাজ্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত এবং যেন বিশুদ্ধ ওজঃ পুঞ্জ সমন্বিত সচল দিবাকরসন্নিভ জীবকুল তাঁহার পুরোভাগে উপনীত। তাঁহাদিগের অধ্যক্ষ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি অদ্য আমাদিগের পবিত্র সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে, আধ্যাত্মিক চক্ষুরুন্মিলিত হওয়ায়, অন্তরায় নিচয় অতিক্রম করতঃ আমাদিগের

রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিলে—এখানকার প্রকৃতি উচ্চতর ও তীব্র শক্তি সম্পন্ন। এতাবৎ তুমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সাহায্যে বহির্জগতের শক্তির জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতেছ; এখন হইতে ক্রমবিকাশ স্ফুরণের সহিত তুমি অন্তর্জগতের শক্তি ও নিয়ম অবগত হইতে থাকিবে। তোমার সমধিক জ্ঞানের আবশ্যক হইলে, সেই শক্তি প্রভাবে তুমি ইচ্ছামত আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে। তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন—এক্ষণে গুরুতর কার্য্যভার তোমার স্কন্ধে অর্পিত হইল; সেই কার্য্যে তুমি জগতের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইবে এবং তোমার আপন কল্যাণও সাধিত হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।"

তৎপরে মহাপুরুষ হস্ত অপসারিত করিলেন, চিন্তামণির সম্মুখ হইতে সে দৃশ্যও অন্তর্হিত হইল। মহাপুরুষ কহিলেন—"তুমি পরব্রহ্মের পন্থা অবলম্বন করিয়াছ। বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কার্য্য কর, তিনি তোমার কার্য্যে সহায়তা ও তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন।

এই সময়ে প্রবর্ত্তকদ্বয় পুনরায় বারত্রয় ভূমিতে যষ্টি আঘাত করিলে, মহাত্মাগণ আসন গ্রহণ করিলেন। প্রবর্ত্তকদ্বয় তখন চিন্তামণিকে একবার গৃহটীর চতুর্ভিতে লইয়া বেড়াইলেন, দীক্ষার্থীগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তিনিও প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক প্রবর্ত্তকদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তথায় একখানি চেয়ারে বসিয়া তিনি দীক্ষাকালীন ঘটনা নিচয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অপর দীক্ষার্থীদিগের নিকট দীক্ষাগৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কেমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাঁহার মন নির্ম্মল ও বলশালী, এবং শরীরের লঘুত্ব অনুভূত হইয়াছিল; প্রথমে এই সকল তাঁহার মনে উদিত হইল।

যখন মহাত্মা তাঁহার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের গূঢ় নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন যেন সেই সত্য, স্বতঃই তাঁহার বুদ্ধিগম্য হইতে লাগিল, সেই দার্শনিক নীতি যেন তাঁহার হৃদয়ে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া গেল। তৎ সমুদয় দ্বারা তাঁহার আত্মার পরিপোষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেবল মানবের ভ্রাতৃভাব নহে, তিনি সমগ্র সৃষ্টি সম্বন্ধীয় ভ্রাতৃভাবের চূড়ান্ত ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। দৃশ্যমান জগতের ক্ষয়শীলত্ব, অদৃশ্য জগতের অক্ষয়ত্ব এবং নিত্য ও অনিত্যের প্রকৃতি সমস্তই সুন্দররূপ বুঝিতে পারিলেন। ক্রমশঃ।